উৎসর্গ

তারাশঙ্করের শেষ রচনা দুপায় বাংলার
সকল বাঙালীর হাতে তাঁর শেষ
অভিপ্রায় অনুসারে তুলে দেওয়া হল।

—প্রকাশক

একটি কালো মেয়ের কথা

(ওপার বাংলা)

'ক্যাটস-আই' বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। অবিকল বেড়ালের চোখের মত। সাদা-ক্ষেত্রের মধ্যে খয়েরী রঙের গোল ঘেরের মধ্যে মণি দুটো ঠিক কালো নয় ঈষৎ নীলচে। এবং বেড়ালের চোখ যেমন আলোয় নিষ্প্রভ হয়ে আসে ও অন্ধকার হলেই জলজলে হয়ে জলে ওঠে এর চোখ দুটোও ঠিক তেমনি, কড়া কথা হলেই প্রদীপ্ত হয়ে উঠছিল। পিঙ্গলাভ গোল তারা দুটোর মধ্যে মণি দুটো যেন আলোর ছটা পাওয়া কালো পাথরের মত মনে হচ্ছিল।

চেহারাতে লোকটা কিন্তু বেড়াল নয়।

খাড়া নাক, লম্বা ধরনের মুখ; হাড়ে মাসে পেশীতে পাকানো শরীর, প্রায় পৌনে ছ'ফুট লম্বা, বুকের ছাতিখানা এতখানি প্রশস্ত, গায়ের রঙ তামাটের চেয়েও কালো কিন্তু কানের পেটীর ফাঁকে ফাঁকে—গলা এবং চিবুকের ভাঁজের রেখায় এককালের ফর্সা রঙের চিহ্ন শেওলাধরা পুরনো বাড়িব থামের মাথার পঙ্খের-কাজের সাদা ফালির মত চোখে পড়ে।

মাথার চুলগুলো নোংরা, রুক্ষ,—তার রঙ ধূলায় ঢাকা পড়লেও কালোই বটে, তবে ডগাগুলি লালচে। এবং তা মেহিদীর রঙের অবশেষ নয়।

পূর্ববাংলায় পশ্চিম-পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর অত্যাচারে ভয়ার্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ মানুষের মধ্যে তাকে কোন রকমেই পূর্ব-পাকিস্তানী বলে মেনে নেওয়া যাচ্ছিল না।

পশ্চিম-পাকিস্তানী?

পাঞ্জাবী? সিন্ধি? বালুচ? অথবা গিলগিট অঞ্চলের লোক? দীর্ঘকাল বাস করছে পূর্ব-পাকিস্তানে—আজকের বাংলাদেশে? এমন লোক অনেক আছে আজ বাংলাদেশে। বেহার ইউ-পি অঞ্চল থেকে যেসব লোকেরা ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ব-পাকিস্তানে বাস করছে তাদেরও কেউ হতে পারে।

পূর্ববাংলা থেকে পালিয়ে-আসা লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে লোকটি সীমান্ত অতিক্রম করে এদেশে এসে ঢুকেছে। অনুমান করতে পারেনি তার চোখ দুটো এমন বেমানান ঠেকবে। কয়েকজন উৎসাহী বুদ্ধিমান তরুণ তাকে গুপ্তচর সন্দেহ করে ধরে এনে পুলিসের হাতে দিয়েছে।

সঙ্গে একটি রুগ্‌ণ কালো মেয়ে। জরে বেহুঁশ মেয়েটির চলবার শক্তিও ছিল না, ওই লোকটি তাকে একরকম বয়ে নিয়ে এসেছে। এই মেয়েটির জন্য এবং পুলিসের তৎপরতার জন্যই বলতে হবে—সে পাকিস্তানী গুপ্তচর সন্দেহে ধরা পড়েও নিষ্ঠুরতম নির্যাতনের হাত থেকে বেঁচে গেছে। দিন কয়েক হল গুপ্তচর সন্দেহে দু'তিনজনকে ধ'রে লোকেরাই তাদের

পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। বর্ডার এরিয়ায় পুলিস অত্যন্ত সক্রিয় এবং সচেতন ছিল। লোকটি একটি গাছতলায় পীড়িত মেয়েটিকে শুইয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করছিল। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বুদ্ধিমান অল্পবয়সী সমাজসেবী-কর্মী ওর ওই চোখ এবং আকার অবয়ব দেখে সন্দেহবশে ফিস্‌ফাস শুরু করতেই ওদের ভাগ্যক্রমে পুলিস এসে পড়েছিল। পুলিসের দৃষ্টিও মুহূর্তে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তারা ওদের জীপে তুলে নিয়ে এসেছে থানায়।

* * *

মনের সন্দেহ অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট এবং শক্ত কঠিন হয়ে উঠছিল।

মাথায় এতখানি লম্বা, রুক্ষ চুলের ডগার দিকটায় পিঙ্গলাভাস, এমনি ছুটো চোখ। প্রশ্ন করলেন অফিসার—তুমি তো পশ্চিম-পাকিস্তানী? নয়?

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটা তার উপর রেখে বললে—না। আমি পশ্চিম-পাকিস্তানী নই।

এবার প্রশ্ন করবার ভঙ্গিটিকে একটু তীক্ষ্ণ এবং রূঢ় করে তুলে অফিসার বললেন—তুমি বলছ তুমি পূর্ব-পাকিস্তানী?

সে বললে—না, তাও নই।

—তুমি পাকিস্তানীই নও?

—না সাহেব। তা কি বলতে পারি। আজ চব্বিশ বছর পাকিস্তানের রুটি নিমক খেয়েছি—ডাল ভাত খেয়েছি—আমি পাকিস্তানী নিশ্চয়ই। তবে আমি পূর্ব-পাকিস্তানী কি পশ্চিম-পাকিস্তানী নই; আমি পাকিস্তানী। পশ্চিম পাকিস্তানে অনেকদিন থেকেছি, উর্দু খুব ভালো জানি। পূর্ব-পাকিস্তানে দশ বছর রয়েছি। এখন এদেশের মানুষই হয়ে গিয়েছি।

একটু থেমে থেকে হেসে আবার বলছিল—ভাত ছাড়া রুটি আর রুচে না মুখে—মাছ ছাড়া ভাত খাওন যায় না; ই ঘাশের ভাষায় কথা কইলি পর কোন্ মামু কয় যে আমি এই ঘাশের ছাওয়াল না—

তার কথা শেষ হবার পূর্বেই পাশে সমবেত লোকদের মধ্য থেকে একজন উদ্ধত তরুণ ধৈর্য হারিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে তার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে রূঢ়স্বরে ধমক দিয়ে উঠল—Shut up you বদমাশ কাঁহাকা! চালাকি পেয়েছ? না?

সকলেই চমকে উঠেছিল। কেউ ঠিক প্রস্তুত ছিল না এর জন্তে। নইলে সকলেই মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ওই লোকটির উপর। সকলেরই মনে হয়েছিল লোকটা বাংলাদেশের ভাষাকে ভেঙিয়ে কথা বললে।

তরুণটি দ্বিতীয়বারও হাত তুলেছিল—কিন্তু লোকটি খপ ক'রে তার হাতখানা ধরে ফেলে বললে—কি চালাকি করলাম? মারলেন কেন আমাকে?

সঙ্গে সঙ্গে সূচীপতন-শব্দ শোনার মত নিস্তব্ধতা ঘরখানার মধ্যে থমথম ক'রে উঠল। পরমুহূর্তেই হয়তো একটা বিস্ফোরণের মত উচ্চনাদী একটা কিছু ঘটতে পারত কিন্তু থানা

অফিসারটি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দুজনের মাঝখানে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে প্রায় বাধা দিয়ে বললেন—Please, please, please.

আঘাতকারী তরুণটিকে বললেন—আপনি সরে আসুন। আপনারা বাইরে যান।

লোকটি চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই ছিল। তার সেই পিঙ্গল চক্ষুতারকা দুটি অস্থির দীপ্তিতে যেন ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

যে চড় মেরেছিল সে-ই হোক বা অন্য কেউ হোক এবার নিষ্ঠুর আক্রোশে এবং ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠল—He is a spy.

লোকটি প্রায় ক্ষিপ্তের মত ঝাঁকি দিয়ে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না; ততক্ষণে দুজন কনস্টেবল তার দুইপাশে সরে এসে তার দুই হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়েছে। লোকটা বুক ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল। প্রতিবাদ জানিয়ে বললে—No. No. No! I am not a spy—I can never be a spy—No. I hate it—I hate it.

—Search কর ওকে।

দুই হাত তুলে দাঁড়িয়েছিল সে—আর একজন তার পোশাক-পরিচ্ছদে হাত পুরে খুঁজে খুঁজে দেখছিল। গায়ে একটা ছেঁড়া শার্ট। বুকপকেটে একটা ডটপেন, একখানা ছোট নোট বই। নিচের পকেটে সস্তাদামের দু'প্যাকেট সিগারেট দেশলাই একটা লাইটার।

তল্লাসীর সময় লোকটি হাত তুলে প্রায় চঞ্চল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল এবং আপনমনেই কথা বলেই যাচ্ছিল—না, আমি স্পাই নই। বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর traitor spy বড় ঘৃণিত জীব। আমি স্পাই নই। আমি মুসলমান নই আমি হিন্দু নই, পাকিস্তানে আমার জন্ম নয়; ধর্মে আমি ক্রশ্চান। আমার জন্মস্থান কলকাতা। আমার বাবা ছিলেন Anglo-Indian—আমার মা ছিলেন বাঙালী ক্রশ্চান—মায়ের বাবা ছিল 'বিশ্বাস'। তালতলায় বাড়ি ছিল আমার মায়ের বাবার। ওই বাড়িতে আমি জন্মেছি। আমার বারো বছর বয়স পর্যন্ত আমি তালতলায় বড় হয়েছি। আমার বাবা ছিল রেলের Yard Officer—মা ছিল আমার P. G. Hospital-এ নার্স। এলিয়ট রোডে মিশন স্ট্রীটে ফ্রি ইস্কুল স্ট্রীটে মৌলালীতে খুঁজলে আমার চেনা লোকেদের নিশ্চয় পাওয়া যাবে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় my father wanted to go England or Australia or South Africa—but. কিন্তু হয়নি—হয়ে ওঠেনি। আমার বাবা adopted Pakistan, করাচীতে বাবা রেলইয়ার্ডে চাকরি পেয়েছিল; মা পেয়েছিল রেলওয়ে হসপিটালে চাকরি। বাবা আমাকে মিশন ইস্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বাবা চেয়েছিল আমি ভাল লেখাপড়া শিখে England চলে যাই। কিন্তু—

একটানা এতগুলি কথা লোকটি বলে গেল—এমনভাবে বলে গেল এবং তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন কিছু মানুষের মন এবং হৃদয়কে স্পর্শ করা কিছু ছিল, যার জন্য দশ-বারোজন সন্দিগ্ধচিত্ত সতর্ক তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ তাদের কপালে ভুরুতে কঠিন সংশয়ের ভুকুনরেখা নিয়েও

মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে শুনে গেল। অবিশ্বাসবশে বা অসহিষ্ণু হয়ে একটা প্রতিবাদও করলে না।

বরং একজন কেউ যেন নিরাশ হয়ে বললে—দূর দূর। যত সব বাজে কাণ্ড—

সঙ্গে সঙ্গেই একজন বাধা দিয়ে বললে—চুপ কর। শোন না কি বলছে।

'কিন্তু' বলে লোকটি দুই হাতের তালুই উল্টে দিয়ে বললে—মর্জি খোদার আর নসীবের ফের—কোথায় বা ইংল্যাণ্ড কোথায় অষ্ট্রেলিয়া কোথায় সাউথ আফ্রিকা, আমি সেই পাকিস্তানেই রয়ে গেলাম। মা হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেল, বাবা আবার বিয়ে করলে শুকনো চেহারার নিষ্ঠুর মেজাজের এক আধবুড়ী খাস মেমসাহেবকে and I was left alone, a forsaken child. সারি দুনিয়ামে মেরা কোই নেহি থা। অবশ্য child তখন আর আমি নই। বয়সে পনের পার হচ্ছি—দুনিয়ার একটা আলাদা টান মনকে টানতে শুরু করেছে। জিন্দগীর অনেক মন্দ জিনিস গোপনে গোপনে জেনেছি। রাত্রে মিশন থেকে বেরিয়ে পালাতে গিয়ে ধরাও পড়েছি দু-চারবার। গানের গলা ছিল—সিনেমার গান শিখেছি। উর্দু গান ভাল লাগছে। গজল গাই। এসব ফাদারদের অজানা ছিল না। এর উপর বাবা হঠাৎ চলে গেল England—আমার খরচের জন্যে এক পয়সাও দিয়ে গেল না। তবুও মাসচারেক ফাদাররা কিছু বলেনি। পাঁচমাসের সময় আমি মিশনের electric জিনিসপত্র চুরি ক'রে ধরা পড়লাম।

পড়াশোনায় ভাল ছিলাম না। ঝোঁক ছিল গানে আর ইলেকট্রিসিটির কাজে। খুটখুটে ছেলে যাকে বলে এক ধরনের, যারা নিজেরাই খুটখাট করতে করতে কাজ শিখে ফেলে। আমি সে পালা শেষ করে মিশনে যে মিস্ত্রী ইলেকট্রিকের কাজ করত তার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে করতে তার assistant হয়ে গিছলাম প্রায়। কাজকর্মও ভালই শিখে ফেলেছিলাম। বাবা চলে গেলে মিশন টাকার তাগাদা না করলেও আমার নিজের অভাব হয়ে পড়েছিল। সিগারেট খাই—সিগারেটের পয়সা জোটে না; সিনেমা এলে যেতে পারি না। একখানা সাবান চাই—জোটে না। অগত্যা ইলেকট্রিক বাল্ব খুলে প্লাগ খুলে সুইচ খুলে নিয়ে বাজারে বিক্রী করতাম। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলাম একদিন। আমার সীটটার নীচে আমার সুটকেস খুলে দেখলে ফাদারেরা। সেই তল্লাসীতে ওরা পেলে খানকতক উর্দু সিনেমা সাপ্তাহিক—যার মধ্যে সিনেমা-স্টারদের তসবীর আছে। আরও আছে উলঙ্গ মেয়ের ছবি। আর সেই ছবির উপরে উর্দু গানের লাইন লেখা। যার মানে খুব খারাপ; লেখা আমারই—না বলবার উপায় ছিল না। ওইসব খারাপ লাইনগুলো লিখে উর্দুতে সই করেছিলাম 'আওয়ারা' বলে। রাজকাপুরের 'আওয়ারা' ছবিটার গল্প শুনে খুব ভাল লাগত। কিন্তু তার পরেও লিখেছিলাম—আওয়ারা 'ডেভিড'। উর্দু খারাপ গানের লাইনগুলো আমার নিজের তৈরী। উর্দুতে গজল বানাবার ঝোঁক আমার তখন খুব।

এরপর মিশনের রেকটর আমাকে বললেন—তোমার জিনিস সব গুছিয়ে নাও। এবং মিশনের যে ফটকটা বড় রাস্তার উপর সেই ফটকটা খুলে দিয়ে বললেন—Try your luck now. আমরা তোমাকে আর রাখতে পারব না। আমি লজ্জিত যে English

language, English culture তোমার ভাল লাগল না।

আমি ভয় পাইনি, বেরিয়ে এসেছিলাম। ঠিক করেছিলাম electric মিস্ত্রীর কাজ ক'রেই খাব। তার সঙ্গে গান আছে। গাইয়ে হিসেবে নাম করতে পারলে কথাই নেই। কোনক্রমে যদি দু'চারখানা গান রেকর্ড করতে পারি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

অফিসার বললেন—দাঁড়াও।

এবার সে অফিসারের দিকে তাকালে। অফিসার টেপ রেকর্ডার থেকে ফুরিয়ে-যাওয়া টেপের রীলের চাকাটা খুলে নতুন টেপ পরানো চাকী পরিয়ে নিচ্ছিলেন। লোকটি এতক্ষণে এ সম্পর্কে সচেতন হল। অফিসার যে কখন টেপ রেকর্ডারের মাইক্রোফোনটা টেবিলের উপর রেখেছিলেন সে সম্পর্কে সে কিছুই জানতে পারেনি। একটু হেসে সে শুধু বললে—ওঃ, you have not believed me!

আরও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে টেবিলের কোণটা ধ'রে বললে—I am not a spy—আমি স্পাই নই। Spying আমার বিচারে গুণার সামিল—পাপ। It is a sin.

অফিসারটি বললেন—আমরা তো তোমাকে ইতিমধ্যে কোন শাস্তি দিইনি।

সে বললে—কি বললেন?

অফিসার বললেন—তোমাকে তো spy ব'লে ধরে নিয়ে এর মধ্যেই কোন সাজাও তো দিইনি। Have we put you to any torture?

সে বললে—না—তা বলতে পারব না।

অফিসারটি বললেন—কিন্তু আমাদের কতকগুলো কর্তব্য আছে—কতকগুলো আইন আছে, নিয়ম আছে।

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলে সে। অস্ফুট স্বরেই একরকম বলেও ফেললে—হ্যাঁ তা আছে।

অফিসার বললেন—বস ওই টুলটার উপর।

পাশের খালি চেয়ারগুলোর দিকে তা'কিয়ে দেখে নিয়ে সে টুলটার উপরেই বসল। অফিসার বললেন—বল, তারপর বল।

একটা সিগারেট খাব?

নিশ্চয়। ওই তো তোমারই সিগারেট রয়েছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে সে আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। বললে—সামান্য কখানা যন্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়েছিলাম খোলা করাচীর পথে। ভয় আমি পাইনি। ভয় পাবার মত মনের গড়ন আমার নয়। My father was never kind to me. My mother—She was a queer sort of woman. কথায় কথায় তার ছিল কান্না। হাসপাতাল থেকে এসে রোগীর জন্যে কাঁদত। আমার বাবা বেশী মদ খেলে মা কাঁদত; বাবা কড়া কথা বললে কাঁদত। You see—এক-একটা দুঃখের ছবি দেখে এল

তিন-চারদিন ধরে কাঁদত, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত। আমার জন্যে কান্না তো লেগেই ছিল। আমি বম্বে যাচ্ছি—তার জন্যে তো কাঁদতই, আবার আমি রাগ করলেও সে কাঁদত। She was very strange, আমি তার হদিস পাইনি কখনও and I did not like her. আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিলে।

অফিসার বললেন—তুমি শক্ত মনের গড়নের লোক। এখন তোমার কথা বলে চল।

—হ্যাঁ—বলছি। পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম সাহস ক'রে, তাতে ঠকলাম না। Screwdriver, tester, কতকগুলো পাত রেঞ্চ নিয়ে Electro mechano বলে একটা দোকানের সামনে বসে থাকতাম। জনকয়েক মিস্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। আমি কাজ জানি—কাজ ভাল ক'রে যত্ন ক'রে করি—তা ছাড়াও আমার জীবনের আর একটা মূলধন ছিল। আমি ভাল গজল গাইতাম। তাছাড়া নিজে উর্দু গজল তৈরী করতে পারতাম। সেগুলো কিছুটা ভালগার ছিল বলে মিস্ত্রী class-এর লোকেরা পছন্দ করত। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও। ওদের সঙ্গে আমি মিশে গেলাম। চেহারাতে West Pakistani লোকের সঙ্গে মিল ছিল। গায়ের রঙ চোখের চেহারা চুলের রঙ প্রায় একরকম—তাছাড়াও লম্বায় আমি ওদেশের মানুষের সমান ছিলাম। আরও ছিল—মেজাজের গড়ন, সম্পূর্ণ না হলেও, কতকগুলো জায়গায় অনেকটা একরকমই ছিল। আবার গরমিল ছিল এই মেজাজেই। মধ্যে মধ্যে আমার মায়ের এই ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মন কেমন ক'রে আমার মনে ছড়িয়ে পড়ত।

অফিসার বললেন—এত বাড়িয়ে বলো না। Facts বল—

সে বললে—Mr. Officer—তাই বলতে আমি চেষ্টা করছি। নাহলে সে সময়কার ঘটনা বলতে গেলে সে আর ফুরুবে না। আমি বলতে চাচ্ছি—অল্পদিনের মধ্যেই আমি ওদেশের মানুষদের একজন হয়ে গিছলাম। ওদের ভাষা বলতাম ওদের মত। ওদের গান গাইতাম ওদের মত। আমার খানকয় গান রেকর্ড হয়েছিল। কিন্তু bad luck, আমার গান লোকে পছন্দ করেনি। ওই গান গাইবার জন্যে একটা নামও নিয়েছিলাম আমি। কারণ একজন Anglo-Indianএর উর্দু গান পছন্দ না করতে পারে। এক বুড়োর কাছে থাকতাম। তার মরা ছেলের নাম ছিল মনসুর। নামটা সেই আমাকে দিয়েছিল।

—I see—কি নাম সেটা?

—মনসুর।

—পাকিস্তানে রেকর্ড করেছিল H. M. V.?

—হ্যাঁ। খোঁজ ক'রে দেখতে পারেন।

—তারপর বল।

—গানে কিছু হয়নি কিন্তু electricএর কাজে আমার পথ খুলে গিছল। দু'বছরের মধ্যে electric engineering সম্বন্ধে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বই কিনে পড়ে শুনে পরীক্ষা দিয়ে একটা ডিগ্রীও যোগাড় ক'রে নিয়েছিলাম। কাজ তখন চারিদিকে। পাকিস্তান নতুন স্বাধীন দেশ।

ছনিয়ার তার খাতির অনেক। কারণে আজব জিন্না সাহেবের নামে সারা ছনিয়া ঝুঁকি ঝুঁকে মাথা নোয়ায়। England America থেকে শুরু করে সব দেশই তাকে টাকা যোগাচ্ছে—গম যোগাচ্ছে—কলকারখানার সরঞ্জাম যোগাচ্ছে—লড়াইয়ের সরঞ্জাম যোগাচ্ছে। গরীব দেশ একটা, তাকে নতুন করে গ'ড়ে তুলতে হবে। নয়া জমানা—নয়া জিন্দগী—নয়া মুল্ক। পাকিস্তান। বড় বড় শহর কিছুটা ভেঙেচুরে—কিছুটা পুরনো শহরের পাশে নতুন ক'রে আরও বড় modern শহর তৈরী হচ্ছে। দশবিশতলা দোকান। বড় বড় এরোড্রোম। বছরে বছরে নতুন কিস্‌মের হাওয়াই জাহাজ এসে নামছে এরোড্রোমে। কলকারখানা বসছে। পাটের কল—লোহার কারখানা—আরও শও রকমের হাজার কারখানা তৈরী হচ্ছে। মালিক সব খান সাহেবেরা, নবাবজাদা—পীরজাদা—জায়গীরদারেরা। রেডিয়োতে গান হচ্ছে, ক্লাবঘরে নাচ হচ্ছে। বড় বড় কনফারেন্স হচ্ছে। আবার নবাবজাদা পীরজাদাদের বাড়িতে বাইরা নাচছে। জলসা-জলুসের কামাই নেই। লাহোর থেকে করাচী পর্যন্ত প্রকাণ্ড চওড়া সড়ক তৈরী হয়েছে। সেই সড়কে সকালে শহরের কাজ সেরে আমীরেরা ঝকঝকে মোটরে চড়ে নাচগান মহফিলের ইন্তেজার নিয়ে চলেছে ওদের বাড়িতে, সন্ধ্যেবেলা মহফিল হবে। কারখানা opening হচ্ছে—বড় বড় রিসেপশন দেওয়া হচ্ছে, সেখানে আলো জ্বালাতে হচ্ছে, মাইক চালাতে হচ্ছে। আমি সারা পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরে বেড়াচ্ছি ইলেকট্রিক মিস্ত্রী হয়ে—করাচী থেকে লাহোর। সারা পাকিস্তানে ইলেকট্রিসিটি ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ন'বছর কাজ করলাম একটা বড় ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারস ফার্মে। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। পুরো ন'বছর কাজ করলাম। আমার নিজের ধর্ম ভুললাম—ইংরেজী ভাষা ভুললাম—নাম পর্যন্ত ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম নয়—বদলে গেল—বদলে ফেললাম নিজেই।

ছিলাম ডেভিড আর্মস্ট্রং, হয়ে গেলাম মনসুর আলি, কোম্পানীর খাতায় আমার ওই নামই লেখা হয়ে গেল—আমিও ওই নাম সই করতাম আরবী হরফে। মাইনের খাতায় ওই নাম সই দিয়েছি। উর্দুতে রিপোর্ট পর্যন্ত দিয়েছি কোম্পানীকে। I wanted to be a West Pakistani. আট বছর সেই চেষ্টা করেছিলাম। তারপর হঠাৎ 'পিঁড়ী বদল গয়া'—সব বদলে গেল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এলাম পূর্ব-পাকিস্তানে। এখানে এসে আমার আবার একবার সব বদলালো। I may say I was reborn. Yes it was rebirth. আমি পূর্ব-পাকিস্তানে এসে একেবারে এদেশের মানুষ হয়ে গেলাম।

অফিসারটি বাধা দিয়ে বললেন—মিস্টার আর্মস্ট্রং—না মনসুর—কি বলব তোমাকে?

—যা আপনার ইচ্ছে হয়। Whichever you like. আমি আর্মস্ট্রং'ও বটে, মনসুরও বটে।

—ভাল—তুমি ওদেশে ওদেশের মানুষ হয়ে গিয়েছিলে—আবার এদেশের মানুষ কি ক'রে হলে? What do you mean by it?

হেসে মনসুর বললে—মানে আমি ঠিক জানি না। আমি ঘটনার কথা বলছি।

A fact. একদিন one morning I felt that I was a বাংগালী East Pakistani. বাংলার জলে রোদে বাতাসে আমার রঙ পুড়ে তামাটে হতে শুরু করলে ডাল ভাত মাছ লঙ্কা বড় ভাল লাগল—বাংলা বুলি শিখে গেলাম -ভাটিয়ালি গান শিখলাম—বাঁশের বাঁশী আর দোতারা বাজাতে শিখলাম—আয়নায় নিজের চেহারা দেখে শেখ আমিনুর রহমানের সঙ্গে এমন মিল দেখতে পেলাম যে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। মনে হল আমরা দুজনে চাচাতো ভাই। জাফরউল্লা খাঁ আমার উপর খুব 'রঙ' হয়ে গিয়ে বললে—ইয়ে তুম ক্যা কর রহে হো? ইয়ে ক্যা তুমহারা বেচাল? আমি—

—হুঁ। হুঁ। Stop, stop please. ইনস্‌পেকটার বাধা দিলেন।

লোকটি মুখ তুলে তাকালে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—Yes sir!

—Who is this Jafarulla Khan?

—I beg your pardon. I did not tell you about Jafarulla. I forgot to tell his name.

—হ্যাঁ। কে? জাফরুল্লা খাঁ?

জাফরউল্লা খাঁ লাহোরের এক দেউলে-পড়া খানদানী ঘরের ছেলে। রইস আদমী—বহুৎ বড়া দিল—দেনা করে বাই-বাড়িতে মুঠো ভ'রে টাকা উড়িয়ে দেয়। মদ খায় শিকার করে—ক্রিকেট খেলতে বাইরের দল এলে করাচী যায়, আবার লাহোরে আসে—আবার রাওয়ালপিণ্ডি যায়। আমার সঙ্গে দোস্তি হয়েছিল—যাকে বলে by chance, সেই by chance; যে কোম্পানীতে আমি চাকরি করতাম সেই কোম্পানীর সে ছিল অফিসার। লাহোর পিণ্ডির পথের ধারে electric lineএর কাজ হচ্ছে, সেখানে একটা তাঁবু খাটিয়ে মালপত্র নিয়ে আমি chargeএ রয়েছি, একদিন বেশ খানিকটা রাত্রে আমি বসে সিগারেট খাচ্ছি আর গজল গাইছি—জাফর সাহেবের কার এসে থামল। আমি ভাবিনি—আমাদের কোম্পানীর কেউ এসেছে, আমি গান গেয়েই গিয়েছিলাম, জাফর সাহেবের সেই গান ভাল লেগেছিল। And he took a fancy on me. সেরাত্রে আমার ওখানেই সে হল্ট করেছিল। সারারাত্রি গানবাজনা খানাপিনাতে কেটে গিয়েছিল। সকালে উঠে যাবার সময় বলেছিল—কোনদিন আমার গরীবখানায় তোমাকে পেলে খুশী হব। সেই দোস্তি আমাদের আরও জমে উঠল পূর্ব-পাকিস্তানে এসে। ১৯৬০ সালে—তখন জেনারেল আয়ুব খান সারা পাকিস্তানে জঙ্গীশাহী কায়েম করেছেন, সমস্ত Indian border জুড়ে মজবুত মিলিটারি ঘাঁটি তৈরী হচ্ছে। পাকিস্তান-কাশ্মীর বর্ডারে জোর কাজ চলছে, সেই সময় পূর্ব-পাকিস্তান জুড়ে হিন্দুস্থান বর্ডারে ঘাঁটি তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেল। জাফরউল্লা মতলব করলে সে নিজের কোম্পানী ক'রে ঠিকার কাম নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে আসবে। আমাকে বললে—মনসুর তুমিও চল। যাবে?

—পূর্ব-পাকিস্তান?

—হ্যাঁ। বহুৎ আরামের দেশ—বহুৎ মজা লুটবার দেশ।

—আরাবের দেশ? সে তো জংলা দেশ। শুনেছি নদী নদী আর নদী। আর সাপ বাঘ বিচ্ছু—নদীতে নাকি গণ্ডায় গণ্ডায় কুমীর হাঙর কিলবিল্ করছে। তার উপর হাজারো বেমারীর দেশ। গরীবের দেশ—

—হবে অনেক। তকদীর বদলে যাবে, নসীব খুলে যাবে। চল না। বাঘ সাপের ভয় করো না—সে সব শহরে থাকে না, আর নদীতে আমরা লঞ্চে ঘুরব স্টীমারে ঘুরব। আমরা শহরে থাকব। প্রেসিডেন্ট হুকুম করেছেন শহরগুলো ঢেলে সাজো। আর গরীবের দেশ বলো না। পয়সা ওদেশে আছে। এই তো, আমার জানা সৈয়দ ইয়াকুব আলি খাঁ—মির্জা নাদের হোসেন—ওখানে গিয়ে ব্যবসা করে লাখো লাখো টাকা রোজগার করে ফিরে এসেছে। মস্ত বড় বিজনেস চলছে। খালি হাতে পায়ে গিয়ে বছর যেতে না যেতে you can earn more than enough. ওখানকার সরকারে বড় বড় অফিসার সবই এখানকার আদমী। এখান থেকে যারা যায় they get their ready help.

একটু থামল লোকটি। সম্ভবতঃ সেকালের সেই দিনটি স্মরণের আকর্ষণে অতীত থেকে উঠে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল, সে তারই দিকে তাকিয়ে দেখছিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকবার টান দিয়ে নিয়ে সেই কথাই সে বললে—বললে—আমার সেদিন সেই মুহূর্তে কলকাতার কথা মনে পড়েছিল—তালতলার গলিগুলো—করপোরেশন স্ট্রীট—ওখানকার আমাদের অ্যাংলোপাড়া রিপন স্ট্রীট—এলিয়ট রোড—মনে পড়ে গিছল। আমরা অ্যাংলোরা বাঙালী-বাবুদের ভাল চোখে দেখতাম না। আমাদের enemy মনে করতাম।

জাফরউল্লা বলেই চলেছিল ওখানকার কথা। প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ গোটা দেশটাকে বহুত মজবুত মুঠিতে ধরেছেন—ওদেশের লীডারদের জবরদস্তি দাবিয়ে রেখেছেন। একদিকে দোস্তি করেছেন চীনাদের সঙ্গে অন্যদিকে দোস্তি আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে; চীনারা ওদেশে দলে দলে আসছে—শহরে শহরে ছড়িয়ে পড়ছে—বিজনেস খুলছে। ওদের সঙ্গে পাকিস্তানের দুশমন হিন্দুস্তানের আধা লড়াই লেগেছে। এখন একটা বখ্‌তকার সময়। বহুত মিলিটারি কনট্রাক্ট পাওয়া যাবে। আমার জানা লোক আছে সেক্রেটারিয়েটে। আমি যাব। তুমি চল আমার সঙ্গে। Working Partner হিসেবে চল।

জাফরউল্লা একা নয়; পশ্চিম-পাকিস্তানের fortune-hunter যারা তারা দলে দলে আসছিল East Pakistan.

আমি জাফরউল্লার সঙ্গে আসিনি। আমি মাসছয়েক পরে এলাম। East Pakistan Rifles-এর জন্যে নতুন নতুন military truck lorry wireless van আসছিল—চারিদিকে রব—কখন হিন্দুস্তানের সঙ্গে লড়াই বাধে তা কেউ বলতে পারে না। হয়তো ওবেলায় বাধবে—এ বললেও কেউ চমকে উঠবে না; আমি এলাম ওই wirless vanগুলোর সঙ্গে। এখানে এসে পৌঁছে দিয়ে চালু ক'রে দিয়ে ছুটি। লোভনীয় ছিল টাকার অঙ্ক।

করাচী থেকে প্লেনে এসেছিলাম চিটাগং। ওখানে আমেরিকান জাহাজ এসেছিল—জাহাজ-বোঝাই যুদ্ধের সরঞ্জাম। সেখান থেকে আবার ভাগ হয়ে এলাম ঢাকা [illegible]

যশোর, রাজসাহী, রঙপুর, কুমিল্লা—আরও অনেক জায়গায়—আমি এই কয়েকটা জায়গায় ঘুরেছিলাম। এবং কেটে গেল প্রায় আরও আট মাস। এই আট মাসের মধ্যে কখন যে আমি এই পূর্ববাংলার মানুষ হয়ে গেছি তা আমি বুঝতে পারিনি। I could not feel even. I did not know that I was changing. আজও বলতে পারব না how it happened—how it became possible!

একটু থেমে একটু ভেবে নিয়ে সে বলেছিল—The language—ওদেশের ভাষার কথা শুধু বলতে পারি,—পূর্ববাংলার ভাষার সঙ্গে কলকাতায় শেখা আমার মাটির ভাষার সঙ্গে এর খুব তফাৎ ছিল না। আমার মা বাংলা বলত তালতলার বাড়িতে; কেউ দরজায় কড়া নাড়লে জানালায় মুখ রেখে জিজ্ঞাসা করত—কাকে চান? কি বলছেন, বলুন। মনে পড়ে গেল। চাটগাঁয়ে নামার একদিন পর East Pakistan Rifles-এর ডাক্তারের কোয়ার্টারে গিছলাম, জ্বর হয়েছিল; কোয়ার্টারের বন্ধ দরজায় কড়া নাড়তেই পাশে জানালা খুলে দেখা দিয়েছিল একটি মেয়ের মুখ। ডাক্তার সাহেবের মা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কারে চান?

মুহূর্তে কি ক'রে যে সেই ছেলেবেলায় মায়ের কথা বলা মনে পড়ে গিছল বলতে পারব না—তবে আমি স্থানকাল হারিয়ে প্রায় বোবা এবং অন্ধ হয়ে গিছলাম। ভদ্রমহিলা আবার প্রশ্ন করেছিলেন—কি কইছেন? কন?

চট্টগ্রামে বেশীদিন থাকিনি। চলে এসেছিলাম ঢাকাতে। ঢাকা শহরের বড় রাস্তায় বেরিয়ে যেন অবাক্ হয়ে গেলাম। পথের মানুষের কলরবের মধ্যে থেকে যেন সেই কলকাতার ভাষার ধ্বনি শুনতে পেলাম। মনে হল—এদের ভাষা আমি সব বুঝি। ঢাকা রেডিয়োর প্রোগ্রামের মধ্যে ওই যে rural programme সে যে কি ভাল লাগল কি বলব। একটি মেয়ে একটি পুরুষ ঝগড়া করত শুনে আমার দিল মশগুল হয়ে যেত। বড় রাস্তায় গ্রামোফোন রেডিয়োর দোকানে রেকর্ড বাজত; আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতাম। সুরের সঙ্গে গলা মেলাতাম। উর্দু গজলের আমি খুব ভক্ত। বলতে গেলে উর্দু গজলের টানেই উর্দু ভাষাটাকে আমি শিখেছিলাম। এখানে এসে ভাটিয়ালী শুনে সেই নেশা ধরে গেল। গান জানি, গলা আছে—সুর শিখতে দেরি লাগল না। ভাষা শিখতেও না। 'কোথায় যাবে' আর 'কনে যাবা' 'কইরা মইরা' আর 'ক'রে ম'রের তফাৎ কতটুকু? এ তফাৎ ভয়াট করে নিতেই বা কতক্ষণ লাগে? তবে লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথা কইলে বুঝতে ধাঁধায় পড়তাম—কষ্ট হত; কিন্তু গানের ভাষা শিখতে কোন কষ্ট হল না। ভাটিয়ালী সুরে নেশা আছে—তার গানেও আছে।

প্রথম গান শিখেছিলাম একজন মুশকিল-আসান ফকীরের কাছে। পূর্ব-পাকিস্তানে পৌঁছুবার দু'মাসের মাথায়। বড় একটা সাইক্লোন হয়ে গেল। পূর্ব-পাকিস্তানে ঝড় হয়। জল ঝড় বানের সঙ্গে ওদেশের আসমান-জমীনের কেমন একটা সম্পর্ক আছে। ঝড় এসে সব তছনছ করে দিয়ে যায়। সেবারও দিয়ে গেল। ঘরবাড়ি উড়ল, গাছপালা ভাঙল, ইঁদারা

পড়ল, মানুষজনও কম মরল না। সেই সঙ্গে উপড়ে পড়ল ইলেকট্রিক তারের পোস্ট, টেলিগ্রাফের টেলিফোনের তার ছিঁড়ল—বন্যায় গ্রামঅঞ্চল ডুবে রইল ক'দিন ধরে। এর জন্যেই আমি লোকদেরও ডাক পড়েছিল। আমি আর্মির লোক নই—ওদের ঠিকের কাজ করছিলাম, আমাকেও ওরা পাঠিয়েছিল। একদিন একটা নদীর ঘাটের উপর ইলেকট্রিক পোস্ট পুঁতে লাইন মেরামত করছি, একজন মুশকিল-আসান ফকীর ঘাটের উপর একটা গাছতলায় পাতা পান বিড়ি মুড়ি তেলেভাজার দোকানে এসে, মুশকিল-আসান কর পীর। পীর গাজী। বলে গান আরম্ভ করলে। লোকটার গলা ভারী ভাল। আর গানটাও খুব ভাল লাগল।

মুশকিল-আসান করেন দয়াল গাজী পীর—
এ কোন্ সর্বনাশা তুফান আইল—ভাঙ্গল সুখের নীড়—
ও দয়াল গাজী পীর—
আসমান জমীন জুড়্যে তুফান গর্জায়—
কে করল গুনা আল্লা—কার জান যায়—
ক্যাতেতে পচিল ধান—গাভীর বাঁটে শুকায় ক্ষীর—
দয়াল গাজী পীর—

ভারী ভাল লেগেছিল—আমি কাজ ফেলে দিয়ে তার কাছে এসে তার সঙ্গে আলাপ ক'রে বলেছিলাম—গানটা শেখাবে আমাকে? আমার রং তখনও এমন কালো হয়নি—তখনও আমি বাংলা ঠিক বাঙালীর মত উচ্চারণ করতে পারি না, কলকাতায় শেখা বাংলা এবং বাংলা বলা কলকাতার জিভ ঠিক আর বজায় ছিল না। পশ্চিম-পাকিস্তানী উর্দুর টানটোনগুলো এমনই আমার দুরস্ত হয়ে গিয়েছিল যে বাংলা কথা বলতে গেলেই ধরা পড়ত—লোকটা উর্দু-বলা মুল্লুকের লোক।

ফকীর তাই বোধহয় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এবং বলেছিল—আপনি আমাগো ভাশের বাংলা বুলির গান শিখব্যান?

বলেছিলাম—হ্যাঁ।

—বাংলা বুলি তো আপনি বেশ কইতি পারেন দেহি!

—হ্যাঁ তা পারি। এখন তুমি গানটা শিখাও।

সেই আমার বাংলা গান শেখার হাতেখড়ি। দিনকয়েক পরেই গানের সুরটা মনে রইল—গানটা ভুলে গেলাম। ওই ক'টা লাইন মনে থেকে গেছে। দ্বিতীয় গান শিখেছিলাম স্টীমারের ডেকে। ওই মিলিটারি হুকুমেই যাচ্ছিলাম খুলনা থেকে বরিশাল; ডেকের উপর একদল ছোকরা—হালআমলের বাঙালী ছেলে—মানে গোঁফদাড়ি কামানো—মিষ্টি-মিষ্টি চেহারা; তারা সব ডেকের উপর আসর পেতে হারমোনিয়ম বাঁশের বাঁশী নিয়ে খুব জমিয়ে গাইছে। আমিও তাদের একপাশে ব'সে গেলাম। ভারী মিঠা লাগল গানখানা। মনে হল—এই নদীরই কোন ঘাটে কোন মাঝা যেন গানখানা গাইছে—সেই গান শিখে এই

ছোকরা গাইছে গানখানা। গানখানা আমার মনে আছে—

আমি কান্দি কান্দি হইলাম অন্ধ, ও সোনা বন্ধু রে—
ওরে তোমার লাগিয়া বন্ধু তোমার লাগিয়া
দিন ফুরাইয়া আইসে রাত্রি—ও রাত্রি ফুরায় জাগিয়া জাগিয়া—
সোনা বন্ধু রে তোমার লাগিয়া—
আমার কান্নার জলে আষাঢ়িয়া নদী ভরি ছুকূল ছাপায়—
ম্যাঘে ঢাকা আকাশের পারা মোর মনো ছুস্‌কু ক'রে
হায় হায় রে—করে হায় হায়—
পরান বান্ধিতে চাহি বান্ধা নাহি যায় গো—
পড়িছে ভাঙিয়া হায় গো পড়িছে ভাঙিয়া—
সোনা বন্ধু রে তোমার লাগিয়া।

আমি ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছিলাম উর্দু গজল গেয়ে। মির্জা গালিবের গজল গেয়েছিলাম। ওদের গাইয়ে ছেলেটি গালিবের গজলটা লিখে নিয়েছিল—আমি লিখে নিয়েছিলাম সোনা বন্ধুর গানখানা। লিখেছিলাম আরবী হরফে—ওরা দেখে বলেছিল—বাংলাভাষা এমন বলতে পারেন—বেশ বলেন মোটামুটি, কিন্তু লিখতে পড়তে শেখেন না কেন?

ওই যাত্রায় স্টীমার থেকে নেমেই বরিশালে ছুখানা বই কিনেছিলাম। বর্ণপরিচয় আর হস্তলিপি শিক্ষা। ডট পেন ফাউণ্টেন পেন ছিল। একসারসাইজ বুক কিনেছিলাম কয়েকখানাই। এবং সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা আটাশ বছর বয়সে অ আ ই ঈ মক্স করতে আরম্ভ করেছিলাম।

কিছুদিন পর আমার চাকরি গেল।

চাকরি অবশ্য পাকা চাকরি আমার ছিল না। কাজ ভাল জানতাম বলে কণ্ট্রাক্ট বেসিসে কাজ পেয়েছিলাম। সেটা চলে গেল। কারণটা তুচ্ছ। ওখানে পার্টস কিনে এ্যাসেম্বল্ করে আমি ট্রানসিস্টার রেডিয়ো তৈরী করে দিয়েছিলাম পলটনের লোকদেরই ছু'চারজনকে। আমার নিজের ব্যবহারের জন্যে একটা ছোট ট্রানসিস্টার তৈরী করেছিলাম—সেটা স্বচ্ছন্দে পকেটের মধ্যে রাখা যায়। একজন ক্যাপটেন সেটা দেখে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে E. P. R. ব্যারাক থেকে তাড়িয়ে দিলে।

আমি প্রথমটা ভেবেছিলাম চলে যাব এসব দেশ ছেড়ে। মানে East Pakistan West Pakistan India ছেড়ে চলে যাব England South Africa Australia কি যেখানে হোক। কিন্তু গেলাম না। দেশটা বড় আপন আপন মনে হয়েছিল। শান্তশিষ্ট রোগা মাথায় খাটো মানুষগুলি; দেখতে বেশ একটু কালোই; কিন্তু তবু কি সুন্দর। কচিপাতার ঝলমলে খাটো খাটো গাছের মত। যারা লেখাপড়া শিখছে তারা ইস্পাতের ছুরির মত ধারালো ঝকঝকে শানালো। সাধারণ মানুষেরা আরও আশ্চর্য। মাঝিমাল্লা চাষীভূষি কামার-কুমোর

—এরা ওই গাছের মত। তলার ছায়া মেলে থাকে—ভালে ফুল ধরায়। যুদ্ধে ময়দানে ওদের বিক্রম দেখা যায়। ওরা সে কি লড়াই-ই করে। ওদের বেশী ভাল লেগেছিল। ঢাকা রেডিয়োর পল্লীগ্রামের আসর না শুনে আমার দিন যেত না। আমি ওদের মধ্যেই থেকে গেলাম। ওই রেডিয়ো ট্রানসিস্টার তৈরী ক'রে বিক্রী করবার কাজ নিয়ে থেকে গেলাম। পশ্চিম-পাকিস্তানে আমার কেউ ছিল না—এখানেও কেউ ছিল না আমার; পাকিস্তানে ছিলাম ৪৭ থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত পনের বছর। এখানে তখন মাত্র বছর দুই হয়েছিল, তবু এক উর্দু গজল ছাড়া অন্য কিছু হারালো বলে কোন আপসোস আমার হয়নি। আর হিসেবেও আমি ঠকিনি। আমার রেডিয়ো ট্রানসিস্টার ভালই বিক্রী হল। আমার টাকা কিছু ছিল—তাই দিয়ে ঢাকাতে একটা ছোট দোকান খুললাম। রেডিয়ো-ট্রানসিস্টার—তার সঙ্গে গ্রামোফোন আর রেকর্ডের দোকান; তার সঙ্গে মাইক্রোফোন ভাড়ার ব্যবস্থা। মিটিং-এ কালচারাল ফাংশন-এ মাইক ভাড়া দিতাম। দিতাম সস্তায়। কাজী নজরুলের রবীন্দ্রনাথের গান শুনে শুনে ইচ্ছে হল এই গানও শিখব। তার সুবিধেও হয়ে গেল—একটি বাঙালী হিন্দু মেয়েকে ভালবেসে ফেললাম। একটি ফাংশনে মেয়েটি নজরুলের গান গেয়েছিল—আমি মাইক নিয়ে গিছলাম। খুব ভালো কিছু নয়—তবে গান মেয়েটি মোটামুটি ভাল গেয়েছিল—কিন্তু সেজন্যে নয়, অন্য কারণে মেয়েটিকে ভাল লাগল। মনে হল বড় চেনা চেহারা। কচিপাতার মত তার গায়ের রঙ—চোখ দুটি বড় বড়—আর একরাশ চুল। ক'দিন পর আমার দোকানের সামনে দেখলাম সে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। একখানা গজলের রেকর্ড বাজাচ্ছিলাম। তাকে আদর ক'রে ডেকে দোকানে বসিয়ে গান শোনালাম। সে কয়েকখানা বাংলা রেকর্ড শুনতে চাইলে। আমার কাছে ছিল না। বললাম, কাল আসবেন—শোনাবো। এনে রাখব। সেদিন ওকে দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল ওর চেহারার সঙ্গে আমার মায়ের বাপের বাড়ির আমার মামার বাড়ির মেয়েদের যেন আশ্চর্য মিল। আমার ভাল লাগাটা বেশ গাঢ় হয়ে উঠল।

মাসকয়েক পর আমরা বিয়ে করলাম।

ছায়া—মেয়েটির নাম ছায়া; একটা দাঙ্গার সময় বাপ মরে গিয়ে মিশনারীদের আশ্রয়ে কোনমতে ইস্কুলের পড়া শেষ করে একটা প্রাইমারি ইস্কুলে চাকরি করত, প্রাইভেট পড়াত—গানে বাতিক ছিল, বিনা ফিতে ফাংশনে গাইত। I loved her and she loved me. আমি বাংলা জানতাম—She corrected my mistakes. আমাকে বাংলা গান শেখালে। উর্দু গজলে আমার দখল ছিল—নজরুল ইসলাম সাহেবের গান শুনলেই তুলতে পারতাম। ছায়া আমাকে রবীন্দ্রনাথের গান শিখিয়েছিল। একটা গানের দল করেছিল ছায়া। নাম দিয়েছিল 'ঝঙ্কার'। ফাংশনে গাইতে যেতাম। আমি আমার গলা মেশাতাম তাদের সঙ্গে। কোরাসে আমার ভারী গলার effect খুব ভাল আসে।

অনেক কথা কিন্তু সে থাক।

ছায়া আমাকে বাংলা গান শেখালে—বাংলা শেখালে—বাংলাকে ভালবাসালে।

কলকাতা আমার জন্মস্থান। সেটা গড়ে গেছে ইংরেজরা—কিন্তু বাংলাদেশের কলকাতা ঠিকই আছে। পূর্ব-পাকিস্তানও সেই বাংলাদেশ। এপার আর ওপার।

কথাগুলি ছায়া বলত আমাকে। আমাকে শেখাতো।

সেই Anglo-Indian sentiment যে কেমন করে কয়লা দিয়ে ঘষেমেজে পরিষ্কার করা তকতকে পরিচ্ছন্ন একখানি স্লেটে হয়ে গেল তা আমি বলতে পারব না। তবে গেল।

—Wait! অফিসার বললেন—ওয়েট। একটু থামুন আপনি।

—আজ্ঞে?

—একটু থামুন।

—থামব?

—হ্যাঁ।

—বলুন?

—যান—দেখুন—মেয়েটি কি চাচ্ছে।

প্রায় চমকে উঠে লোকটি ঘুরে দাঁড়াল।

ওপাশের ঘরখানা অফিসারের সামনের দিকে; মাঝখানের দরজাটা দিয়ে আধখানারও বেশী খানিকটা দেখা যায়। লোকটির সঙ্গে ছিল একটি আশ্চর্য কালো মেয়ে। মেয়েটি অসুস্থ—জ্বরে প্রায় বেহুঁশ। থানায় ওদের আনার পর, ওই ঘরটায় আড়াল দেখে, একখানা চাদর গোছের কিছু পেতে তার উপর ওকে শুইয়ে দিয়েছিল লোকটি। মেয়েটি অসুস্থতার মধ্যে বোধ করি এপাশ ওপাশ করতে গিয়ে গড়িয়ে প্রায় দরজার সামনে এসে পড়েছে।

উল্টে এসে সে মেঝের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে—দুপাশে দুখানা হাত পড়ে রয়েছে আধভাঁজ অবস্থায়। মাথার রুখু চুলগুলি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে রয়েছে মুখের চারিপাশে, পরনের কাপড়খানা খুলে গেছে—পরনের সায়া এবং ব্লাউজটা কোনরকমে তাকে আবরিত করে রেখেছে। তাও ব্লাউজটা তার ছেঁড়া এবং ব্লাউজটার ছেঁড়া অংশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে মেয়েটির স্তন; পূর্ণযুবতী জননীর ঈষৎনমিত একটি নিটোল স্তন। এবং স্তনবৃন্তমুখে সেই মুহূর্তে কয়েক ফোঁটা দুধ আপনা থেকে বেরিয়ে এসে ফোঁটা বেঁধে টলটল করছে। ছেঁড়া ব্লাউজটা চটচট করছে, দুধে ভিজেছে এবং শুকিয়েছে। বুকের অনাবৃত অংশটাতে ঝরেপড়া দুধ এবং ধুলো মিশে জমে রয়েছে।

মেয়েটির বয়স কত তা আন্দাজ করা কঠিন। ছোটখাটো আকার আয়তনের একজাতের মেয়ে আছে; হাল্কা গড়ন—ধারালো গড়নের নাক—পাতলা ঘোর কালো ঠোঁট—ছোট ছোট চোখ—ঘন ভুরু ঘন চুল—হাত-পায়ের তলা পর্যন্ত কালো। চুলের নিচে মাথার চামড়া—সেও কালো।

বাংলাদেশে সে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ দুই বঙ্গেই এমন কালো মানুষ আছে। মেয়েটা বেহুঁশের মত পড়ে রয়েছে, নাহলে কথা বলত যদি তা হলে দেখা যেতো দাঁতগুলি খুব সুগঠিত এবং মাড়ির রংও কালো। লালচে নয়। কিন্তু এরা বিরল। এবং অল্পসংখ্যক

যাই আছে—আরা ছোট ছোট জাত বলে যারা পরিচিত তাদের মধ্যেই আছে। মেয়েটা তাদেরই একজন।

লোকটি ব্যস্ত হয়ে ওঘরে গিয়ে মেয়েটির মাথার গোড়ায় গিয়ে মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে কপালে হাত বুলিয়ে চুলগুলিকে বিস্তস্ত করে দিয়ে ডাকলে—নাজমা। নাজমা। এরে নাজমা।

মেয়েটির কপালের চামড়া এবং ভুরু নড়ে উঠল উত্তরে—বারেকের জন্তে চোখ চাইবারও চেষ্টা করলে।

লোকটি বললে—তেষ্টা পাইছে? পানি খাবি? পানি?

মেয়েটি চোখ মেলে এবার বললে—হঃ। পানি।

ওদেরই একটা বদনা ছিল ওঘরে মেয়েটির মাথার শিয়রে। সেই বদনাটা টেনে নিয়ে লোকটি ওর মুখের গোড়ায় নলটি ধ'রে বললে—নেঃ, খা। পানি। নাজমা।

আস্তে আস্তে জল ঢেলে দিল মেয়েটির মুখে, বৈশাখের মাটির তৃষ্ণা মেয়েটির বুকে—ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে তার তৃপ্তি হল না। অধীর হয়ে হঠাৎ উঠে বসে ওর হাত থেকে বদনাটা নিজের হাতে নিয়ে বদনার নলটা মুখের কাছে ধরলে। খানিকটা জল তার মুখে গলায় পড়ে গেল। তারপরই ফুরিয়ে গেল জল. বদনাটা ঠক ক'রে নামিয়ে দিয়ে মেয়েটা আবার উপুড় হয়ে মেঝের উপর শুয়ে পড়ে ডুকরে উঠল—আমারে ক্যান নিয়া আইলা রে—আমারে ক্যান নিয়া আইলা আপনে? আঃ আঃ—আমার চাঁদ মাটির তলায় রইছে—আমার বুকের দুধ ফাইটা ফাইটা বারাইচে—আঃ—আঃ।

—নাজমা। নাজমা। এমন কইরা কাঁদে না নাজমা। ইটা থানা। আমরা ইপার বাংলা হিন্দুস্তানে আইসা গেছি। আমরা ফিরা যামু। আবার ফিরা যামু আমাগো ভাশে। তর চাঁদ আবার আইব তর কোলে—। নাজমা।

মেয়েটি একবার ঈশ্বরকে ডেকে উঠল—তার আল্লাতায়লাকে—এক ধরনের প্রাণফাটানো অনুযোগ আছে, সেটা শিখতে হয় না—শেখানোও যায় না—একেবারে শিখেই মানুষ জন্মায়; প্রাণফাটানো দুঃখ যখন মানুষের বুকে বাজে তখন সে অনুযোগ বেরিয়ে আসে আপনা থেকেই। তার সুর আলাদা, তার স্বর আলাদা—তার সব আলাদা। সেই বুকফাটানো অনুযোগ বেরিয়ে এল মেয়েটির মুখ থেকে। সে ছাদের দিকে মুখ তুলে দুটো হাত মেলে ধরে বলে উঠল—হায় আল্লা—হায় খোদা—তুমি একটা বিচার করলা না আল্লা। হায় আল্লা—।

লোকটি তার মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে চুলগুলি সরিয়ে বিস্তস্ত করে দিলে। তারপর তাকে মৃদু আকর্ষণ ক'রে ওই ময়লা চাদর পাতা বিছানার উপর তাকে শুইয়ে দিয়ে বললে—এমন কইরো না নাজমা। এমন কইরা কারে ডাকো? তারে ডাইকা কি অইব? চুপ দাও। শোও। ঘুমাইয়া যাও। ঘুমাইলি পর ভাল অইব।

মেয়েটির দেহে মনে ক্লান্তির আর শেষ ছিল না। লোকটির কথায় উপুড় হয়ে শুয়ে

পড়ল হাতের উপর মাথা রেখে। লোকটি একটা কাপড়ের পুঁটলি মাথার নিচে বালিশের মত ক'রে গুঁজে দিয়ে বললে—ওটার উপর মাথা রাখ।

—ইনস্‌পেক্টর বললেন—ওটা বের করুন। ওটা কি?

—ভিক্ষের ঝুলি।

—ভিক্ষের ঝুলি? কার?

—হ্যাঁ। ওটা নাজমার।

—নাজমার ভিক্ষের ঝুলি?

—হ্যাঁ। নাজমা ভিক্ষে করত। ভিক্ষেই ছিল ওর পেশা।

ইনস্‌পেক্টর একটু বিস্মিত হয়েই তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। লোকটি ভিক্ষের ঝুলিটা ওর মাথার তলা থেকে বের ক'রে নিয়ে দেখালে। সেটা সত্যিই আমাদের বাংলাদেশের ভিক্ষের ঝুলি।

লোকটি মেয়েটিকে জল দেবার জন্ত এঘরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ইনস্‌পেক্টর টেপরেকর্ডারের মাইক্রোফোন রিসিভারটা হাতে করে এঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রতিটি কথা তাঁকে ধরতে হবে।

লোকটি বললে—এর মধ্যি সের কয় চাল আছে। একটা ঠোঙায় একপোটাক নুন আছে, খানিকটা গুড় আছে। আর ইটা ওটা—

—বের করুন।

লোকটি বের ক'রে রাখতে লাগল। তিনটে ঠোঙা—একটাতে নুন, একটাতে গুড়, একটাতে মুঠো-দুই চিনি—কয়েকটা আলু—কয়েকটা কাঁচালঙ্কা—একটা ছোট ন্যাকড়ার পুঁটলিতে বাঁধা কিছু মুড়ি কিছু চিড়া। এছাড়া প্লাস্টিকের তৈরী কয়েকটা খেলনা ছিল। একটা পুতুল একটা বাঁশী একটা ঝুমঝুমি আর একটা-দুটো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া খেলনার কতকগুলো টুকরো ছিল তার মধ্যে। ছোট ছেলের গায়ের দুটো রঙীন জামাও ছিল সযত্নে পাটকরা। একখানা শাড়ি একটা সায়া—এবং এই কাপড় সায়ার ভাঁজের মধ্যে একখানা বই।

ইনস্‌পেক্টর বললেন—বই? কি বই ওটা?

মনসুর বললে—একখানা ইংরিজী বই। A Treasury of Modern Asian Stories.

—আপনার?

—হ্যাঁ। পরক্ষণেই বললে—না—আমার ঠিক নয়। এখন আমার। এটা জাফরউল্লার ওখানে পেয়েছিলাম—জাফরউল্লা আমাকে পড়তে দিয়েছিল। সঙ্গে চলে এসেছে—ফেলে দেবার কথাও মনে হয়নি।

—দেখি ওখানা?

বইখানা দিয়ে ইন্সপেক্টর মলাট উল্টে একবার দেখে নিয়ে ইউনিফর্মের বেল্টের তলায় পুরে বললেন—Then this girl is not your wife—যার কথা আপনি বলছিলেন?'

লোকটি বললে না। আমার স্ত্রী ছায়া মারা গেছে সে আজ অনেকদিন হল। আড়াই বছর হবে।

—এ কে? দেখে তো আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে ব'লে মনে হয় না?

—না। নাজমা ওর বাপের সঙ্গে গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতো। ভিখিরীর মেয়ে। এই বোলাটা ওরই। আপনি ধরেছেন ঠিক। ও আমার কেউ নয়।

—আপনার কেউ নয়?

—না। তবে আমি ওকে চিনি অনেকদিন থেকে। ঢাকা শহরের পথে ভিক্ষে করত বাপের সঙ্গে। বাপ ছিল প্রায় অন্ধ; একটা চোখে একটু একটু দেখতে পেতো। জন্ম-গাইয়ে ছিল। গলাটা মোটা থাকলেও বড় ভাল গলা ছিল। দোতারা বাজিয়ে গান করত। মেয়েটি তখন খুব ছোট—বারো-তেরো বছরের মত বয়স তখন, দেখাতো আট-দশ বছরের মেয়ের মত। পরনে একটা সায়া গায়ে একটা চিলেঢালা ব্লাউজ পরে বাবার গলার সঙ্গে গলা মেশাতো। গানে আমার নেশার কথা তো বলেছি, সেই নেশার টানেই আলাপ করেছিলাম খানিকটা যেচে। বাপের নাম ছিল রহিম। শক্তসমর্থ বড়সড় চেহারার মানুষ। মিষ্টি দরাজ গলা। মেয়েটাকে ওর মেয়ে বলে মনেই হত না। চেহারাতে কোন মিল ছিল না। পরে শুনেছিলাম—মেয়েটার মা ছিল পূর্ববাংলার বেদের মেয়ে; যারা নৌকোয় নৌকোয় ঘোরে—সাপ ধরে—ওষুধ বিক্রী করে। রহিম যৌবনকালে কেড়ে নিয়েছিল বেদেদের একটা মেয়েকে। মেয়েটি রহিমকে ভালোবেসেছিল। নাজমা তার পেটের মেয়ে।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান।

—বলুন?

—She is in no way related to you then? তা হ'লে হঠাৎ পথে দেখা হয়েছে—এবং আপনি ওকে চিনতেন—ও ঢাকার পথে ভিক্ষে করত, এই তো? আপনি তো ওকে এই রুগ্ণ অবস্থায় প্রায় কাঁধে বয়ে নিয়ে এসেছেন—হেঁটেছেন তো অনেকটা!

—হ্যাঁ তাই। But there was a relation—ছিল না বললে ভুল হবে। ঢাকাতে আমার বাড়িতে নিচেরতলায় একটা চালায় ওরা থাকত। আমার একটা affection ছিল। ওর ওই আশ্চর্য কালো রঙ আমার খুব ভাল লাগত বলে আমি বলতাম—তোর মত সুন্দর কালো মেয়ে আমি দেখিনি। ভিখিরীর মেয়ে, বারো-তেরো বছরেই অনেক কিছু বুঝত। আমার কথা শুনে সে লজ্জা পেত, মুচকে মুচকে হাসত, যার সাধারণ ভাবে লজ্জা পাওয়ার থেকেও বেশী কিছু মানে আছে। আমি কিন্তু এর মধ্যে খারাপ মানে খুঁজে বের করতে চাইতাম না। এত সূক্ষ্ম ন্যায়-অন্যায় বিচার করে যারা আমি তো ঠিক তাদের মত মানুষ নই। মোট কথা আমার মনের মধ্যে একটি রমণীয় কোণে ওকে বসতে দেবার একটি আসন গড়া হয়ে গিয়েছিল, মেয়েটা সেটা বুঝত। এবং সেই কারণেই মুচকে মুচকে হাসত।'

সে একবার খুব বর্ষা,—একটা সাইক্লোন জাকের দুর্যোগ, সেই দুর্যোগে এসে আমার দোকানের বারান্দার এক কোণে জড়সড় হয়ে বসেছিল—আমি বলেছিলাম—রহিম, নাজমাকে নিয়ে ভেতরে গিয়ে বস।

রহিম বলেছিল—সাহেব—রুটি কি ভাত কি খাবার কিছু থাকলে নাজমাকে দাও। ওর বহুত ভুখ লেগে থাকবে। কিছু খায়নি।

সেই ওরা ঢুকেছিল। নাজমা নিজে একটা কাজ করত—বাড়ির উঠোনটা বাইরের দরজাটা ভোরবেলা উঠেই ঝাঁট দিত।

অত্যন্ত সহজ ঘটনা। উপরে উঁচুতে জল ঢাললে নিচের দিকে গড়িয়ে যাওয়ার মত ঘটনা। আমার দোস্তটোস্ত যারা তারাও কোন দোষ দেখেনি। তারা বলত—জোটালে ভাল!

শুধু দোস্তরা কেন—আমার সঙ্গে ছায়ার আলাপ হল; আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসলাম and we married together—ছায়া আমার বাসায় এল, আমরা বাসার মধ্যে সংসার গড়ে তুললাম। মেয়েটা ছায়ার বরাত খাটত, কথা শুনত, গল্প শুনত। ছায়াকে গান শোনাতো। ছায়া বোধ হয় ওকে আমার থেকেও বেশী ভালবেসেছিল।

ছায়াকে বিয়ে ক'রে সংসার গড়তে চেয়েছিলাম বললাম; যে বাড়িটায় আমার দোকান ছিল সেই বাড়িটা ছিল ছোট একটা বাড়ি আর পুরনো আমলের বাড়ি, তবে বড় রাস্তার ওপর, সেই বাড়িটা কিনে মেরামত-টেরামত করিয়ে নাম দিয়েছিলাম—The Nest—বাংলাতেও নাম দেওয়া হয়েছিল—'বাসা'। তখন ৬৪ সাল চলছে।

সারা পূর্ববাংলায় বাংলাভাষা বাংলাভাষা বাংলাভাষা ধ্বনিতে আকাশবাতাস ছেয়ে গেছে। তাই বাংলাভাষায় নাম না দিয়ে ছায়ার তৃপ্তি হয়নি। তাই নাম দেওয়া হয়েছিল 'বাসা'।

একজন পাকিস্তানী অফিসার একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—ইংরিজী নাম রয়েছে, বাংলা নাম রয়েছে, উর্দু নাম কই?

অফিসারটির সঙ্গে আমার দোস্তি ছিল। তাঁকে আমি একটা ছোট্ট ট্রানসিস্টার তৈরি করে দিছলাম। নানান্ বিষয়ে তিনি আমাকে সাহায্যও করতেন। তিনি নিজে থেকে একটা উর্দু ট্যাবলেট তৈরী করিয়ে আমায় দিয়ে গিছলেন। নিজেই নাম দিয়েছিলেন 'গরীবখানা'।

তিনি আমাকে সাবধানও করে দিয়েছিলেন—বলেছিলেন—তুমি বেছে বেছে একটা বাঙালী হিন্দু মেয়েকে কেন বিয়ে করলে? তুমি খৃশ্চান মেয়ে বিয়ে করতে পারতে? বাংলাভাষা আর আওয়ামী লীগ করা একটা মেয়ে পছন্দ করলে শেষে?

থাক। যে কথা বলছিলাম তাই বলি।

এই আমাদের নতুন বাড়িতেও ছায়া নাজমাকে আর রহিমকে ডেকে থাকতে দিয়েছিল আমাদের নিচের তলায়।

রহিম স্বভাবে একটু নোংরা ছিল, তামাক খেতো, মাথায় লম্বা চুলে জবজবে ক'রে তেল দিত, তামাকের গুলে ঘর নোংরা হত ; তামাকের একটা গন্ধও উঠত—দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মাথা রাখলে দেওয়ালে দাগ হত, নাজমা এতখানি নোংরা ছিল না। কিন্তু পুরো একালের মত পরিচ্ছন্ন সে হত না। হলে ওদের গান গেয়ে ভিক্ষের ব্যবসায়ে ক্ষতিই করত ; কিন্তু তাতেও ছায়া অসন্তুষ্ট হয়নি ওদের উপর।

নাজমার বয়স বাড়ল—নাজমা বড় হল। তার মুখের হাসি চোখের চাউনির রকম বদলালো—আমরা ভাবছিলাম—এবার ওদের বলব—ওরা অন্য কোথাও জায়গা দেখে নিক। নয়তো মেয়েটার বিয়েটিয়ে দিয়ে ওকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে রহিম থাকে তো থাক। হঠাৎ একদিন না বলতেই সেই ব্যবস্থা করলে নাজমা। নাজমা একদিন একটা ছেলের সঙ্গে পালালো। রহিমকে এই অবস্থায় আর চলে যাওয়ার কথা বলতে পারলাম না।

কিছুদিন পর ছায়া নিজেই মারা গেল। পাতানো ঘর সাজানো সংসার ফেলে সে চলে গেল।

চুপ ক'রে গেল মনসুর আলি—কিংবা ডেভিড আর্মস্ট্রং। ঠোঁট দুটো থরথর ক'রে কাঁপতে শুরু করল। চোখের কোলে-কোলে জল ভ'রে উঠল।

রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে আরও একটুক্ষণ সময় নিয়ে সংবরণ করে নিলে নিজেকে মনসুর। তারপর বললে—সেদিন রাত্রে, মানে ছায়াকে কবর দিয়ে এসে বাড়িতে যখন ফিরে এলাম তখন ওই রহিম ছাড়া আমার পাশে কেউ ছিল না। ওই প্রায়-অন্ধ রোগা দুর্বল লোকটি যে আমাকে কি সান্ত্বনা দিয়েছিল সে আর কি ক'রে বলব। সে বলা যায় না।

ওঃ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে মনসুর আলি।

* * * *

মেয়েটি এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মধ্যে মধ্যে একটা ক'রে কাঁপা-কাঁপা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছিল। মনসুর তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—জানি না মেয়েটা বাঁচবে কিনা। অর যে কি লাঞ্ছনাটা না হইছে! অঃ, চোখে না দেখলে কারুর বিশ্বাস হবার কথা নয়। আমিই বিশ্বাস করতাম না। অঃ, তারির মধ্যেও কালনাগিনীর মত দংশে শোধ নিয়েছে। একটা ছেলে, ছ'মাসের ছেলে, ওই মায়ের মত কুচকুচে কালো—আর কি সে হাসত। খলখল করে হাসত—

ইনস্‌পেক্টর বললেন—চলুন ওঘরে চলুন। মেয়েটি ঘুমুক।

এঘরে এসে ইনস্‌পেক্টর চেয়ারে ব'সে লোকটিকে বললেন—মেয়েটি আপনার কেউ না তা হ'লে?

—হ্যাঁ। ও আমার, বিচার করে দেখতে গেলে—কেউ না। আপনাকে তো বলেছি—ওর বাপের সঙ্গে ও আমার বাড়ির নিচেরতলায় একটা ফালতু জায়গায় থাকত ; একটু-আধটু কাজকর্ম করত ; আর ওর বাবার হাত ধরে পথে পথে ভিক্ষে করত। মেয়েটার গলা ছিল ভারী মিষ্টি।

—সে-সব বলেছেন আপনি এর আগে।

—Yes sir—I have already said that—.

—আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন।

—Thank you. চেয়ারখানা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে চেয়ারে বসে বললে—এখান থেকে ওকে দেখতে পাব। আজ ক'দিন প্রবল জ্বরে ভুগছে। ছোটখাটো রোগা কাঠামোর চেহারা তাই ওকে কাঁধে ঝুলিয়ে আনা সম্ভবপর হয়েছে।

ইনস্‌পেক্টর বললেন—আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করছি। ভাববেন না আপনি। আপনি যতক্ষণ আমাদের হেপাজতে রয়েছেন ততক্ষণ আমরা ব্যবস্থা করব।

—আমাকে কি arrest করেছেন spy বলে? কিন্তু spy আমি নই। ওই শব্দটাকেই আমি ঘৃণা করি। I hate the word, I despise the idea.

—আপনাকে arrest আমরা ঠিক করিনি। তবে সন্দেহ আমাদের রয়েছে: This black beggar girl and you—দুজনে এমন একটা বিসদৃশ pair or match—যাই বলুন। মোটকথা নিঃসন্দেহ না হয়ে আমি আপনাদের ছেড়ে দেব না।

—I can swear by the name of God—ভগবানের নামে শপথ ক'রে বলতে পারি—বাইবেল হাতে নিয়ে I can swear—এ ছাড়া আমি কি ক'রে বিশ্বাস করাব—

—Don't be excited—ওতে তো কাজ হবে না।—আপনি বসুন—আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি উত্তর দিন। তাতে কাজ সহজ হবে। এ আপনি বলেই যাচ্ছেন—narrating your story—কিছুটা বিশ্বাস হচ্ছে—সহজ সরল, মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে এটা Arabian nights-এর ঘটনা হ'লে ভাল হত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লোকটি বললে—আরব্য উপন্যাসের ঘটনার মত ঘটনা কোন্‌টা মনে হল আপনার—জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—That you are an Anglo-Indian. আপনার নাম ডেভিড আর্মস্ট্রং—আপনি মনস্থর আলি হয়ে গেছেন—

লোকটি বললে—আমার একটা passport আছে—আমার পকেট থেকে ওটাই নিয়ে দেখুন। ওতেই আমার ছবি আছে—আমার নাম আছে। অবশ্য দশ বছর আগের পাসপোর্ট, আমি গিয়েছিলাম 'কায়রো'। তখন আমি পশ্চিম-পাকিস্তানে সব থেকে বড় ইলেকট্রিক কোম্পানীতে কাজ করি; নবাবজাদা জাফরউল্লা খাঁর নাম করেছি, you remember—

ইনস্‌পেক্টর পকেট থেকে সিগারেট বের ক'রে মুখে পুরে প্যাকেটটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। এবং দেশলাই জেলে ওর সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন –Yes I remember him—নবাবজাদা জাফরউল্লা খাঁ। খুব বড় দিল, খেয়ালী মেজাজ—

মুখের ধোঁয়া ছেড়ে লোকটি বললে—ওরা একটা স্বতন্ত্র জাত। শয়তানের জাত।

They belong to no religion, they belong to no particular nation. They are a class of Princes Kings Nawabs Sultans Rajas—

ইনস্‌পেক্টর বললেন—ওসব কথা থাক। আপনি passport-এর কথা বলছিলেন।

—হ্যাঁ। Company-র একটা বড় consignment আসছিল electric goods-এর একখানা জাহাজে England থেকে; সুয়েজ ক্যানেলের ঝগড়ায় জাহাজখানা আটকেছিল আরবেরা। অনেক লেখালেখি ক'রে মাল অন্য জাহাজে আনবার ব্যবস্থা হয়েছিল, company sent জাফরউল্লা and me. সেই সময়ের পাসপোর্ট—দেখুন দুটো নামই আছে। সেদিন চেহারা আমার ছিল West Pakistani-এর মত,—ইউরোপীয়ান বললেও I could easily pass.—আজ আমার রঙটা পুড়ে গেছে,—তামার চেয়েও less bright—তবুও চেষ্টা করলেই আমাকে খুঁজে পাবেন।

—তা পাচ্ছি। ইনস্‌পেক্টর পাসপোর্টখানাই দেখছিলেন। ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে ওই কথা ব'লে বললেন—কিন্তু এমন বিচ্ছিরী পোড়া রঙ কি ক'রে হল আপনার? পূর্ববাংলার জলবাতাসে?

সিগারেটে টান দিয়ে সে ঘাড় নাড়লে, কথা বললে না। ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

—তা হ'লে?

—বছর কয়েক আমি ফকীর সন্ন্যাসীর মত কেবল পথে ঘুরেছি। ছায়া মারা গেল। ছায়া আমার কাছে যে কি ছিল তা আপনাকে বোঝাতে পারব না—আপনিও বুঝতে পারবেন না। দু-বছরের মধ্যে এই মেয়ে দুটি আমাকে আশ্চর্য রকমের বাঙালী ক'রে ছেড়ে দিয়েছিল। এই মেয়েটি politics-এর সঙ্গে জড়ানো ছিল।

—You also became a member of the Awami League?

—গোপন করব না। প্রয়োজনও নেই। আওয়ামী লীগ কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ নয়। মৌলানা ভাসানী সাহেবের চীনাপন্থী আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছায়ার যোগ ছিল। ছায়া বেঁচে থাকলে আমি নিশ্চয় ভাসানী সাহেবের দলে যোগ দিতাম। কিন্তু ছায়া মারা গেল। আমি সে প্রচণ্ড আঘাত খেলাম জীবনে। সেই আঘাতে সব, যেন সারা দুনিয়াটাই রঙ-চটা টিনের খেলনার মত হয়ে গেল। রঙ-চটা স্প্রীং-কাটা খেলনার মোটরের মত মূল্যহীন অচল হয়ে গেল। আমি দোকান তুলে দিয়ে বাড়িটা একজনকে ভাড়া দিয়ে সারা পূর্বপাকিস্তান ঘুরে বেড়াতে লাগলাম পায়ে হেঁটে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে সে বললে—জানেন আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বিষয় ছাড়া কখনও ঝগড়া হয়নি। সেটা হল কে আগে মরবে? ও বলত আমি,—আমি বলতাম—নেভার, আমি। ঝগড়ায় মীমাংসা হত না—কেউ কারুর কাছে হার মানতাম না তবে তার থেকেই যে কথা উঠত সেটাতে আমাদের দুজনেই একমত ছিলাম। ছায়াও বলত, আমি ওরই কাছে শিখে বলতাম—'বনবাসী সন্ন্যাসী হইব'।

H, M, V,-র রেকর্ডে শিশির ভাদুড়ীর সীতা নাটক আছে। আমাদের

collection-এ সেটা ছিল। ছায়া রেকর্ডের খুব ভাল কলেকশন করেছিল। স্থবিধে হয়েছিল—আমার gramophone, gramophone record-এর দোকান ছিল। সেই সীতা নাটকে ছিল কথাটা 'প্রিয়ার প্রেমের লাগি বনবাসী সন্ন্যাসী হইব'। আমরা দুজনেই মরবার কথা নিয়ে ঝগড়া ক'রে বলতাম—'বনবাসী সন্ন্যাসী হইব'। সেইটে আশ্চর্য ভাবে সত্য হল আমার অদৃষ্টে। ছায়া মারা গেল। একটা আশ্চর্য মিষ্টি এবং সুন্দর সুখস্বপ্নে আমরা যখন বিভোর হয়ে—স্বপ্নটা সত্য হবে বাস্তবে প্রত্যাশায় নানান্ আয়োজন করছি তখনই হঠাৎ সব স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে ছায়া চলে গেল। হাসপাতালের বারান্দায় সেফ ডেলিভারির খবর আসবে বলে প্রতীক্ষা করছি—ডাক্তার বলেছেন, সব নর্ম্যাল কোন আশঙ্কা নেই। আমি উৎকণ্ঠাবশে সিগারেট খাচ্ছি। সিগারেটের পর সিগারেট—সিগারেটের পর সিগারেট গোটা রাত্রি কেটে গেল। ভোরবেলা খবর পেলাম—ছেলে-মা দুজনেই মৃত। কাউকে বাঁচানো যায়নি।

পৃথিবী বিবর্ণ হয়ে গেল—আমার সাজানো ঘর-দোর—আমার কাম-কারবার সব হয়ে গেল ফুটো টিনের পাত্রের মত। জীবনের সঞ্চয় সব গলে পড়ে গেল মাটিতে। তোমার প্রেমের লাগি বনবাসী সন্ন্যাসী হইব কথা তখন ঠিক মনে পড়েনি—কিন্তু সত্যিসত্যিই সব পাট তুলে দিয়ে প্রায় সন্ন্যাসী ফকীরই হয়ে গেলাম।

সব বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল,—কিছু ভাল লাগছিল না—আমি এখানকার কারবারটা তুলে দিয়ে প্রথমটা চলে গেলাম লাহোর। লাহোর থেকে ইসলামাবাদ, সেখান থেকে করাচী। কিন্তু ভাল লাগল না, ফের ফিরে এলাম ঢাকা। ঢাকার কারবার তুলে দিছলাম, মালপত্র বেচে দিছলাম জলের দরে—কিন্তু বাড়িটা বেচিনি। বাড়িটা ছিল; ভাড়া দিয়ে গিয়েছিলাম,—নিচেরতলার একটা দিক ভাড়া দিইনি, খালি রেখেছিলাম। ওখানটায় রহিম থাকত একপাশে বারান্দার এক কোণে। ঘরটা ট্রানসিস্টারের, তা থেকেও I earned lot. টাকা ছিল—ষোল বছর বয়স থেকে আমি উপার্জন করেছি, একলা মানুষ; এবং আমি অমিতব্যয়ী ছিলাম না। এবং চাকরির সময় মাইনে আমি ভালই পেতাম। তারপর যে ব্যবসা করেছিলাম—রেডিয়ো-ট্রানসিস্টারের, তা থেকেও I earned a lot. টাকা ছিল—তাছাড়া ইলেকট্রিসিটির যুগে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর একটা টেস্টার পেলেই যে-কোন শহরবাজারে বসে দিনে আট-দশ টাকা রোজগার আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। আমি উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগলাম। বাসা ভেঙে যাওয়া পাখি যেমন এ-ডাল ও-ডাল এ-গাছ ও-গাছ করে বেড়ায় তাই করে বেড়াতে লাগলাম।

কতবার ভেবেছি চলে যাই অন্য দেশে। কাজ জানি—যে-কোন দেশের ভাল মেকানিকের সমান কাজ করতে পারি—; আমার আবার ভাবনা কি? কিন্তু পারিনি। এই পুবপাকিস্তানের ভিতরেই ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। শিলেট গিয়ে কতবার ডাউকী নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে ওপারের খাসিয়া জয়ন্তী চেরাপুঞ্জী হিলসের রুক্ষচাল অঞ্চলগুলির দিকে তাকিয়ে

থেকেছি। ওদিকের পাহাড়ের অপরূপ রূপসী মেয়েদের কথা ভেবেছি—ভেবেছি ওপারে চলে যাই কিন্তু যাইনি। যেতে পারিনি। চিটাগং কক্সবাজারে থেকেছি, বরিশাল অঞ্চলে ঘুরেছি,—ঘোরার নেশাতে পেয়েছিল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল নৌকোয় ক'রে ঘুরব দেশটা। ঘুরেছিলাম। নৌকোয় ক'রে পদ্মা মেঘনা পার হয়েছি। তুফানের ঝাপটা খেয়েছি; নৌকোর কাঠ আঁকড়ে ধরে বসে থেকেছি। বরিশাল যাবার পথে স্টীমারে বসে নদীর আঁকাবাঁকা চেহারা দেখেছি; জল আর মাটির মাখামাখি দেখেছি। সুন্দরবনে একবার শিকারীদের সঙ্গে গিয়ে বাঘ-বাঘিনী দুইকে দেখেছিলাম—তাদের সে কামড়াকামড়ি ঝাপটাঝাপটি দেখেছিলাম, জোয়ারের ফুলে ওঠা জল আর মাটির ওই মাখামাখি খেলা যেন তাই মনে হয়েছিল। এরই মধ্যে এই দেশটাকে এমন করে ভালবেসে ফেললাম যে এই আমার সব থেকে ভালো দেশ, এর থেকে ভালো দেশ আর নেই। আর এই দেশই আমার দেশ। মনে হত বরিশালের মত উর্বর মাটির অঞ্চলে খানিকটা জমি নেব—একটা বাংলো করব। ইলেকট্রিসিটি পাই ভাল, না পাই একটা জেনারেটার তৈরী ক'রে বসাব। তা থেকে আলো জ্বালাব। ছোট ট্রাকটর কিনে চাষ করব। তার সঙ্গে পোলট্রি করব।

আর শুনতাম গান।

এদেশের আশ্চর্য মিষ্টি ভাটিয়ালী গান। একালের composer আছে একদল, তারা নিজেরা গান লিখে সুর দিয়ে গায়, সে গান নয়। পুরনো কালের গান। খাঁটি নৌকোর মাঝিরা গায়। আর গাঁওগাঁওলার গাইয়েরা দোতারা বাজিয়ে গেয়ে ভিখ মাগে।

এসব গান ছায়া আমাকে গেয়ে শোনাতো। এই গানটা ছিল তার প্রতিদিনকার গান। বিছানায় শুয়ে সে আমার হাত ধরে গুনগুন ক'রে গাইত—

আজি হ'তে তোমায় বন্ধু ছাইড়া নাহি দিব—
নয়ানের কাজল কইরা নয়ানে থুইব।
বসন কইরা অঙ্গে পরব মালা কইরা গলে—
সিন্দূরে মিশাইয়া তোমায় পরিব সিঁথানে।
দুই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হইব
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব—

রোজ শুনতাম। নৌকোর মাঝিরা নৌকো ঘাটে লাগিয়ে গান গায় যারা তাদের ডেকে আনত—আমি শুনতাম। লিখে নিতাম। এ৲খানা গান কলেকশনের খাতা করেছিলাম। মৌলানা ভাসানী সাহেব সেখানা নিয়ে বলেছিলেন—এখানা ছাপাবেন তিনি।

ইনস্পেক্টর বাধা দিলেন—দাঁড়ান।

—Yes.

—You knew Moulana Bhasani ?

—Yes Sir. I know him—he knows me—

—মৌলানা সাহেবকে কেমন ক'রে জানলেন ?

—বলেছি গোড়াতেই যে, আমার স্ত্রী ছাড়া মৌলানা সাহেবের দলের সভ্য মানে party-member না হ'লেও খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল। ওদের দলের কালচারাল কাংশানে ওকে না হলেই চলত না।

—আপনি ?

—What do you mean sir ?

—ওদের দলের সঙ্গে আপনি কতটা জড়িত ?

—সম্পর্ক সামান্যই—তবু মৌলানা সাহেবকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। আশ্চর্য মানুষ।

—সামান্য মানে কতটুকু ?

—সামান্য মানে সামান্যই। তিনি আমাকে জানেন, স্নেহ করেন—আমি শ্রদ্ধা করি। দলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। সভ্য বা সমর্থক কোনটাই নই।

—তা হ'লে কোন্ দলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ?

—কোন দলের সঙ্গেই না।

—তা হ'লেও কোন্ দলের রাজনীতি আপনার ভাল লাগে ?

একটু ভেবে নিয়ে লোকটি বললে—তাই বা কি ক'রে বলি ? মৌলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবর দুজনের মতকেই আমার ভাল লাগে।

—ভোট কাকে দিয়েছেন এবার election-এ ?

—ভোট আমার দেওয়া হয়নি। নাম ভোটার লিস্টে ছিল না।

ইনস্‌পেক্টর চুপ করে গেলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। লোকটি বলেই চলল—বলেছি তো ঢাকাতে বাড়িটা আমার আছে—একখানা ঘরও রেখেছি কিন্তু আসলে আমি ঘুরেই বেড়িয়েছি। একবার নৌকোয় নৌকোয় ঘুরেছি, একবার ট্রেনে-বাসে ঘুরেছি, একবার পায়ে হেঁটে ঘুরেছি। সব চেয়ে ভাল লেগেছিল—নৌকোয় নৌকোয় ঘুরতে। নদীনালা খালবিল, নারকেল-সুপুরির গাছের মাথাগুলি, খালের ঘাটে ঘাটে বউ-ঝিদের জটলা—

—আচ্ছা—; কথার মাঝখানে ওকে থামিয়ে দিয়ে অফিসার বললেন—আচ্ছা একটা কথার জবাব দিন তো।

—বলুন—

—You are not a Purba Pakistani. You are neither a Musalman nor a Hindu. You do not belong to any political party. You voted for none. You are an Anglo-Indian—তা হ'লে আপনি পাকিস্তান ছেড়ে পালিয়ে আসছেন কেন ? একটু ভেবে উত্তর দেবেন। Just think. আপনাকে কোন কারণেই ওদের মারবার কথা নয়।

লোকটি স্থিরদৃষ্টিতে অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অফিসারটিকেই মূর্তিমন্ত প্রশ্নের মত সামনে রেখে তার উত্তর খুঁজতে লাগল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে

ওই ঘরের দিকে তাকালে।

সেই আশ্চর্য কালো মেয়েটি শেকড়ছেঁড়া লতার মত ম্লান হয়ে গিয়ে যেন লুটিয়ে পড়ে আছে।

অফিসার বললেন—For that girl ?

—না—ঢাকা থেকে যখন আমি বের হই ওদেশ থেকে পালাব ব'লে তখন ও ছিল না আমার সঙ্গে।

—ঢাকা থেকে কবে বেরিয়েছেন ?

—২৬শে তারিখ শেষ রাত্রে।

—২৬শে শেষ রাত্রে ?

—২৬শে শেষ রাত্রে। চব্বিশ ঘণ্টা সশস্ত্র সৈনিকদের অটোমেটিক রাইফেল লাইট মেশিনগান চালিয়ে নিরস্ত্র মানুষদের হত্যা করা দেখে—সদর রাস্তার উপর চুলের মুঠোয় ধ'রে বেয়োনেট গায়ে ঠেকিয়ে naked half-naked young এমন কি women aged about forty-fifty—এদের টেনে এনে রেপ করেছে। একটা অন্ধকার ঘরে ভাঙা জিনিসপত্রের মধ্যে বসে থেকে একটা ফাঁক দিয়ে চোখে দেখেছি। তারপর আর পারিনি। আমার চোখের সামনে রহিম, ওই কালো মেয়েটির বাপ,—সে প্রায় অন্ধ, আমার বাড়ির বারান্দাতেই থাকত, সে চোখে তো বিশেষ কিছু দেখেনি, শুধু রাইফেল মেশিনগানের গুলির শব্দ, মর্টারের শব্দ, মানুষের কান্না চীৎকার শুনে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। ২৫শে রাত্রি থেকে ২৬শে শেষরাত্রি পর্যন্ত তিনজন মানুষ আমরা।

অফিসারটি মুখ তুলে তাকালেন—বাধা দিয়ে বললেন—one minute—.

লোকটিও মুখ ফেরালে অফিসারের দিকে।

অফিসার বললেন—তিনজন মানুষ কে কে ?

লোকটি বললে—আমি, মিস্টার সেন আর রহিম—মানে ওই নাজমা মেয়েটির বাপ। আপনাকে নিশ্চয় বলেছি, এগার-বারো বছরের কি চৌদ্দ-পনের বছরের নাজমার হাত ধ'রে রহিম ভিক্ষে করত। গান গাইত। ওর কাছে আমি অনেক গান শিখেছি—ওদের অনেক গান আমার টেপ করা আছে। আমার স্ত্রী ছায়া ওদের আমার থেকেও বেশী ভালবাসত। সেই ওদের বাপ-বেটীকে বাড়ির নিচের তলায় থাকতে দিছল।

—হ্যাঁ। মেয়েটি বললেন পালিয়ে গিছল—

—হ্যাঁ। একটি সাইকেলের চাকাওয়ালা গাড়িতে বনিহারী জিনিস ফিরি ক'রে বেড়ায় এমন একটি ছেলের সঙ্গে। পথে দেখা হত ওদের, বাপ অন্ধ ছিল—সে মেয়ের বিয়ে দিতে ঠিক রাজী ছিল না। So she left her father and went with him ; রহিম কোথায় যাবে, এখানেই থেকে গিছল। আমার বাড়ির উপরতলায় নতুন ভাড়া এসেছিল দিগন্ত কাগজের আপিস। ছোট একটা চৌরাস্তাও বটে। ওখানে হাত পেতে ব'সে থাকত। শেষ দিকটায় আপিং খেতে ধরেছিল। আপিংয়ের ঝোঁকে ঝিমোত, আর মাঝে মাঝে গান

গাইত।

আমি তোমার নাম লইয়া কাঁদি
দয়াল গুরু হে—।
এ ভব দরিয়া পার করতি কেবা আছে আর
চারিদিক দিগন্তে গুরু আন্ধারের আন্ধি।—

ওই একটা গান গাইত বেশী। দিগন্ত-ওয়ালারা ওকে কিছু বাংলাদেশের গান শিখিয়েছিল—তাও গাইত। ২৫শে রাত্রে আমি যখন মিটিং শুনে ফিরে এলাম তখনও সে বাড়ির মধ্যে বসে ওই গানটা গাইছিল। আমি ডাকলাম—সে দরজা খুলে দিলে। এর পর এল মিস্টার সেন।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—মিস্টার সেন কে?

আর্মস্ট্রং তার দিকে তাকালে। অফিসার প্রশ্নটিকে বিশদ করে ধরলেন—কি নাম তাঁর? তিনি আপনার সঙ্গে জুটলেন—মানে—এমন একটা দিনে এতটা রাত্রে?

Mr. Sen বাঙালী, কিন্তু East Pakistani নন—Indian. তবে ওঁদের বাড়ি পার্টিশনের আগে ওদেশেই ছিল। একটা আশ্চর্য টান দেশের উপর।

—পুরো নামটি কি?

—Mr. Sen—Mr. K. Sen, বোধহয় কনক সেন। Mr. Sen একজন Journalist. পাকিস্তান থেকে খবর সংগ্রহ করতে গোপনে মধ্যে মধ্যে আসতেন। আবার সত্যাগ্রহ চলার প্রথম দিকে এসে ঢাকার বাইরে দেশময় ঘুরছিলেন। তারপর President ইয়াহিয়া খাঁ শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতে ঢাকা আসতেই ফিরে এসেছিলেন। আমার বাড়িতে কাগজের আপিস ছিল, ওই কাগজের লোকদের সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল। যেসব বাঙালী মুসলমান লেখকেরা East Pakistan-এ বাংলাদেশ নয়া জমানা গড়বার স্বপ্ন দেখতো দিগন্ত কাগজখানা ছিল তাদের। Young men of East Pakistan; তাদের নতুন স্বপ্ন—নতুন বিশ্বাস—নতুন মন। গোঁফ-দাড়ি কামায়—মোল্লা-মৌলানাদের নাগালের বাইরে এরা উর্দু বলে না,—হিন্দু কি কৃশ্চান এ নিয়ে ক্ষেপে ওঠে না। বলতে পারেন এই আওয়ামী লীগওয়ালাদের দল কেউ লেখে কেউ ছবি আঁকে কেউ কলেজে পড়ায় কেউ ইস্কুলে—কলেজে ইস্কুলে পড়া ছেলের দলও আছে এদের মধ্যে। গাইয়ের দল আছে, ড্রামাপার্টি আছে; এরা সব আশ্চর্য মানুষ। ওদের সঙ্গে ওই জন্যেই আমার আলাপ হয়েছিল। ছায়াও ওদেব জানতো চিনতো। ওদের হাতে বাড়িটাও ভাড়ায় ছেড়ে দিয়েছিলাম এই কারণে। দিগন্ত আপিসে এদের আড্ডা বসত।

Mr. Sen-এর সঙ্গে এদের খুব একটা ভাল understanding ছিল; গভীর intimacy—; Mr. Sen East Pakistan-এ এলেই এখানে আড্ডা দিতে আসতেন। শরীরে শক্তপোক্ত দুঃসাহসী মানুষ; an adventurer বলতে পারেন—dare-devil youngman; এদেশে মানে East Pakistan-এ যখনই কিছু ঘটেছে তখনই ঠিক এসে গেছেন এদেশে। এদেশের ভাষা বলতে পারেন গাঁওগাঁওলার চাষীভুষির মত। হিন্দু-মুসলমান চেহারা দেখে

চেনা যায় না। কোরানের বয়েৎ জানেন। তবু কিছুকে করেন না। সরাসর গলায় হা-হা ক'রে হাসেন। Extreme leftism যারা করে তারা আজকাল এক ধরনের দাড়িগোঁফ রাখে, সেইরকম দাড়িগোঁফ রাখেন। He is a political man, এটা নিশ্চিত—কিন্তু সেটা যে সঠিক কি তা বলতে পারব না। দিগন্তের এরা আওয়ামী লীগের লোক; এদের সঙ্গে গভীর intimacy থাকলেও—এদের সঙ্গে এক ছিলেন না। সেই প্রথমবারই শুনেছিলাম—দিগন্তের editor নুর-উল-হুসেন ওর দলের একটি ছেলেকে বলেছিলেন—তুমি Senএর সঙ্গে খুব বেশী দোস্তি করতে যেয়ো না মেহেদী,—তুমি ছেলেমানুষ। Sen পাকা লোক। Sen আমাদের বন্ধু বটে কিন্তু পার্টির লোক নয়। তা ছাড়া ভিন্নদেশী। এই হলেন মিস্টার সেন—মিস্টার কে মানে কনক সেন। ওঁকে দেখে ভাল লেগেছিল আমার—

অফিসারটি বাধা দিয়ে বললেন—থাক—চিনেছি—কনক সেনকে আমরা চিনি। ওঁর সঙ্গে আপনার আলাপ কত দিনের?

লোকটি বললে—ছায়ার মৃত্যুর পর দিগন্তের জন্যে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে আমি সারা পুববাংলাটা ঘুরতে বেরিয়েছিলাম—প্রথমবার ট্রেনে-বাসে ঘুরেছিলাম, সেবার ফিরে ঢাকায় এসে মাস-দুই ছিলাম—সেই সময় একদিন টেপরেকর্ডার বাজাচ্ছিলাম। রেকর্ড ক'রে এনেছিলাম গ্রাম থেকে—ভদ্রলোক দিগন্ত আপিস থেকে শুনতে পেয়ে আমার নিচের তলার ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে বলেছিলেন—খুব চমৎকার গান তো। একেবারে গ্রামের গন্ধ মাখানো। একটু শুনব। আপত্তি করবেন না তো?

ঘণ্টাখানেক গান শুনে চলে গিছলেন। I liked him. Pleasing manners. আর ছিল একটা magnetic attraction. আমার নিজের তৈরী করা ছোট্ট পকেট transistor দেখে ছেলেমানুষের মত ধরেছিল—এটা আমাকে বিক্রী করুন। ছাড়েননি, ভালো দাম দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন। সেইবারই ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাভাষা নিয়ে যে সব অনুষ্ঠান হয়—সে সময় একবার দেখা হয়েছিল। তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। কথাবার্তা হয়নি। তারপর এবার এই দেখা। ২৫শে মার্চ রাত্রিবেলা—।

আমি একটু জল খাব। A glass of water please।

* * *

২৫শে মার্চ রাত্রিবেলা। কত রাত্রি তখন তা ঠিক খেয়াল ছিল না আমার; আমার হুঁশ ছিল না। এবং ঘড়িও নেই আমার। একজন নৌকোর মাঝিকে ঘড়িটা দিয়ে দিয়েছি। আর কিনিনি। আমার ঠিক দরকারও ছিল না। আমি তখন ঘড়ির চলার তালে ছন্দে যে দিনরাত্রি এবং দুনিয়া চলে তার বাইরে বাস করতে চেষ্টা করছিলাম।

২৫শে বিকেল বেলা থেকেই সারা ঢাকা শহর একেবারে আগুন দেওয়া বোমবাজীর মত পলতেতে জলতে জলতে বোমটার দিকে এগুচ্ছে। শোনা গেছে চট্টগ্রাম নাকি জলছে। এখানে প্রেসিডেন্ট খান সাহেবের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ সাহেবের কথা হচ্ছে। চব্বিশ দিন ধ'রে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছে। আশ্চর্য সে আন্দোলন। একটা দুর্দান্ত প্রচণ্ড বলশালী

জন্তু যেন পঙ্গু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে। সারা অঙ্গের কোন একটা স্নায়ুতেও কোনও স্পন্দন নেই—চোখ দুটো মেলে চেয়ে আছে—দেখছে কি দেখছে না তাও বলা যায় না। শুধু শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে এই পর্যন্ত। বাইবেলে সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা আছে। আমার কাছে এ সত্যাগ্রহ তেমনি একটা miracle মনে হয়েছিল।

এর জন্যেই আটকা পড়ে গেছলাম। নৌকোতে নৌকোতে সারা দেশটা ঘুরে ঢাকায় এসেছিলাম West Pakistan যাব ব'লে। টাকাপয়সা কম হয়ে গিছল—বাড়িভাড়ার টাকা আদায় করে লাহোর ইসলামাবাদ করাচী যাব—আমার সংগ্রহ করা টেপ থেকে একটা সিরিজ রেকর্ড বের করাবার ইচ্ছে ছিল এবং যে কোন সুযোগে ইয়োরোপ গিয়ে এগুলো হাজির করারও idea ছিল। কিন্তু এসেই পড়লাম যে ঢাকায় সে ঢাকা আমি কখনও দেখিনি। ঢাকায় সে এক আশ্চর্য চেহারা।

নৌকোর পোস্টারে পোস্টারে ঢাকা শহর যেন নৌকো-ছাপ ছাপানো কাপড়ের তৈরী হাওয়াই শার্ট পরেছে। মেয়েছেলে হয় যদি ঢাকা শহর তা হ'লে ওই নৌকোর ছাপ ছাপানো শাড়ি পরে দুলুনে যাবার জন্ত তৈরী হয়ে বসে আছে। আর দম বন্ধ করে রয়েছে।

পাকিস্তান সরকার অচল হয়ে গেছে। ঢাকা ঘুরছে না। ব্যবসা বন্ধ, বাণিজ্য বন্ধ; —সব থেকে আশ্চর্য লাগল—হাইকোর্টের জজ প্রেসিডেন্টের হুকুম মানেনি। সারা পাকিস্তানের মানুষের জীবন চলছে কিন্তু সরকার অচল হয়ে গেছে।

অফিসারটি বলেন—দেখুন ওসব আমরা এবং সবাই-ই জানি—আপনার কথা বলুন। আমার প্রশ্ন হল—আপনি হিন্দু নন—আওয়ামী লীগপন্থী মুসলমান নন—you do not belong to any political party—আপনি পালিয়ে এলেন কেন? আপনি Christian—আপনি Anglo-Indian—আপনার উপর Pakistan-এর শত্রুতা থাকার কথা নয়—

—Yes Mr. Officer—পাকিস্তানের আক্রোশ আমার উপর থাকার কথা নয়, বোধহয় ছিলও না। ছায়াকে যখন বিয়ে করি তখন একবার পুলিসের নজর আমার উপর পড়েছিল। কিন্তু ছায়া মারা যাবার পর সেটা তারা উঠিয়ে নিয়েছিল। You are right; and—এবং আমারও কোন political inclination ছিল না। কিন্তু এবার ঢাকায় এসে যা দেখলাম যা শুনলাম তা আশ্চর্য! আমারও যেন নেশা ধরে গেল।

একটু হেসে ডেভিড আর্মস্ট্রং বললে—দেখুন একটা কথা বলিনি, বলার প্রয়োজনও মনে করিনি এবং বলবার মত occasion আসেনি। সেটা হল এই যে, আমি বাউণ্ডুলের মত ঘুরেছি তিনবার East Pakistan-এর মধ্যে—আমি মদ একটু বেশী-বেশী খেতে অভ্যস্ত হয়েছি। আমি Anglo Indian—আপনি জানেন—মদ আমরা বাড়িতেই খেতে শিখি। মদ আমাদের খাদ্য-পানীয়ের শামিল। ঢাকায় এবার এসে এবং ঢাকার নতুন নতুন চেহারা রকমসকম দেখে এমন মেতে যেতাম যে মদ কিনে রাখতে ভুল হত, সভাসমিতিতে গিয়ে বক্তৃতা শুনতাম—মদের নেশা ছেড়ে যেত, উঠে এসে খাবার সময় হত না, খেতাম না। সভা থেকে এসে মদ খেতাম আর মনে মনে বক্তৃতার কথাগুলো আওড়াতাম। কারুর বক্তৃতা বেশী

তাল হলে সেদিন আবার বেশী করে মদ খেতাম।

News-এর সময় হ'লেই রেডিয়ো খুলে বসতাম—হাতে গেলাস থাকত।

২৫শে মার্চ রাত্রি তখন কত। দশটা কি এগারটা। বিকেলবেলা খেলা ডিনটে থেকে মিটিং শুনেছি। পুরানা পল্টনে মিটিং ছিল শ্রমিক ফেডারেশনের—তারপর সরকারী কর্মচারীদের মিটিং। মিটিং-এর পর মিটিং শুনে পথে পথে বেড়িয়েছি—সন্ধ্যেতে ফিরে এসে মদ খেয়েছি আর ভেবেছি দেশ স্বাধীন হচ্ছে। ইয়াহিয়া খাঁ শেখ মুজিবর রহমানের কাছে হার মেনে সিটবাট ক'রে ফিরে যাচ্ছে।

রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে পুবপাকিস্তানীরা ধ্বনি দিচ্ছে—বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। বাংলাভাষা জিন্দাবাদ। তাদের হাতে বাংলাদেশের নয়া ঝাণ্ডা। জুলফিকার আলি ভুট্টো ঘাড় হেঁট করে ফিরে যাচ্ছে।

কানে বাজছে শেখ মুজিবর রহমানের সেই আশ্চর্য কণ্ঠ—"ঘরে ঘরে তোমরা দুর্গ গড়ে তোল। যা পাও হাতের কাছে তাই নিয়ে যুদ্ধ কর। আমাদের সংগ্রাম চলছে—চলবে। আমাদের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—আমাদের এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

মদ খেয়ে আমি এই বক্তৃতা সেদিন চীৎকার ক'রে বলছিলাম ঘরের মধ্যে। ২৫শে মার্চ রাত্রি তখন অনেক। Mr. Officer, আমি যে কখন সেদিন বাংলাদেশের একজন মানুষ হয়ে গেছি তা আমি নিজে বুঝতে পারিনি।

শুধু আমি কেন—ওই কানা রহিম—ভিক্ষে ক'রে খায়—ও লোকটার কাছে democratic right-এর কোন দাম ছিল না; East Pakistan, West Pakistan-এর ঝগড়া নিয়ে ওর মাথাব্যথা ছিল না; আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, জামায়েতউলেমা নিয়ে বাছাবাছি করেনি; সেও দেখলাম ঠিক আমার মত ওই সব মানুষদের দলের মানুষ হয়ে গেছে—যারা জয়বাংলা বলে চীৎকার করছে, বঙ্গবন্ধু মুজিবর জিন্দাবাদ বলে চেঁচাচ্ছে।

Mr. Officer, আমার চোখের সামনে সারা বাংলাদেশের ছবিটা ভাসছিল—আমি তো তিন-তিনবার ঘুরেছি এই দেশটার বুক মাড়িয়ে, সেই দেখা ছবিটা যেন নতুন হয়ে ভেসে উঠল আমার মনে। এরা নিষ্ঠুর রকমের গরীব। পরনে লুঙি—খালি গা খালি পা—গায়ের শ্যামলা রঙ পুড়ে কালো হয়ে গেছে, বুকের পাঁজরা বেরিয়ে আছে, চোখের কোলে কালি পড়েছে; ছিটেবেড়ার ঘর, টিনের চাল, বছরে বছরে সাইক্লোন এসে উড়িয়ে নিয়ে যায়, চাপা পড়ে ওরা মরে, নদীর বন্যায় গ্রাম ডোবে—মানুষ ভোবে, গরু-বাছুর ভেসে যায়; এদের বাঘে খায়, সাপে কাটে; এরা ধান ফলায়, পাট ফলায়—

—থাক না। অফিসার বললেন—ও কথাগুলো বাদ দিন; তবে I take it যে সেদিন বক্তৃতা শুনে ইয়োশনালি লক্ষ লক্ষ লোকের শামিল হয়ে গেছিলেন।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। দিগন্ত আপিসে তালাচাবি বন্ধ ক'রে ওরা সকলে চলে গেছে। সবাই ওরা ব্যস্ত ছিল। গোটা ঢাকা শহরটাই তাই। মুজিবর রহমান একরকম যুদ্ধই declare ক'রে দিয়েছেন। লোকে প্রত্যাশা করছে President খান সাহেব কথার দাম রাখবেন,

মুসলমান হয়ে মুসলমানের সঙ্গে বেরাদারির মান রাখবেন। দুনিয়ার কাছে জবাবদিহি করতে হবে তো।—

ইনস্‌পেক্টর বললেন—এসব আমরা জানি। Nobody denies all these facts, আপনাদের কি হল—কি করলেন তাই বলুন।

—গোটা ঢাকা শহর থমথম করছিল। শহরটা নটা বাজতে বাজতে যেন কেমন একটা চেহারা নিলে। দোকানপাট বন্ধ, বাড়িঘর বন্ধ। একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। মনের মধ্যে যত উত্তেজনা তত যেন ভয়ও তার সঙ্গে রয়েছে। ওই বাড়িখানাতে নিচের তলার উঠোনের এক কোণে সেই শুদোম ঘরটার মধ্যে বসে কিছু করবার নেই বলে শুধু মদই খেলাম।

রাত্রিটাকে অস্বাভাবিক রকমের নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে কোন দূরান্তর থেকে অনেক মানুষের চীৎকারের আওয়াজ ভেসে আসছিল।

রহিম মধ্যে মধ্যে তাড়িটাড়ি খায় কালেকস্মিনে—সে সেদিন আমার কাছে মদ চেয়ে খেয়েছিল—বলেছিল—শরাব খানিকটা দিবেন সাহেব, কলিজার ভিতরটা ক্যামন য্যানো ফং ফং করত্যাছে, জোর পাইত্যাছি না।

আমার ছোট্ট রেডিয়োটা খুলে শুনছিলাম রেডিয়োর খবর। মধ্যে মধ্যে কলকাতার খবর, মধ্যে মধ্যে ঢাকার। তখনও আশা—President-এর কোন ঘোষণার খবর বোধহয় এই বুঝি announced হল। এরই মধ্যে কড়া নড়ল বাইরের দরজার। দিগন্ত আপিসের নিচেরতলা উপরতলা দুতলায় কেউ-একজন ঘুরে কড়া নেড়ে তালাচাবি দেখে নেমে এসে নিচের তলায় উঠানের মুখে যে দরজাটা সেই দরজাটায় ধাক্কা দিলে।

কে রয়েছেন? কেউ আছেন? শুনছেন?

আমরা উত্তর দেব কি দেব না ভাবছি—রহিমের রেঁায়া-ওঠা কুকুরটা চীৎকার করতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় উঠোনের ঘেরা পাঁচিলটার মাথার উপরে উঠে ঝপ ক'রে লাফিয়ে পড়লেন মিস্টার সেন।

আমিও আশ্চর্য হয়ে বললাম—আপনি মিস্টার সেন।

উনি বললেন—হ্যাঁ। দিগন্তের এরা কেউ নেই?

বললাম—না তো,—ওরা সেই বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি।

—শহরের রাস্তায় মোড়ে মোড়ে মিলিটারি পোস্টিং হয়েছে দেখছি। গভর্নমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে মিলিটারি পাহারা বসে গেছে। ট্রাক ট্রাক ট্রুপ্‌স্ যাচ্ছে। মিলিটারি জীপ ঘুরছে। ব্যাপারটা ঠিক ভাল মনে হচ্ছে না।

—ভাল মনে হচ্ছে না? মানে, কি বলছেন আপনি?

আমার কথা শেষ হয়নি তখনও, একখানি ভারী ট্রাকজাতীয় গাড়ি আশপাশের বাড়িগুলোর দরজা-জানালা নড়িয়ে দিয়ে খুব জোরে চলে গেল।

সেন ছুটে গিয়ে দরজাটার মুখে গিয়ে দাঁড়াল। ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে

কিন্তু বোধহয় দেখতে পেলে না। ভাবনার মধ্যে চুপ ক'রে দরজার ছিটকোয় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবছিল।

বাইরে আর একখানা গাড়ি চলে গেল প্রচণ্ড শব্দ ক'রে।

সেন এবার দরজাটা খুললে। মুখ বের ক'রে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলে। আবার গেল একখানা গাড়ি। আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল জীপগাড়ি যাচ্ছে। হুইসিল বাজতে লাগল। এখানে ওখানে সেখানে। যেন একটা ইশারা, একটা নির্দেশ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সেন দরজাতে দাঁড়িয়েই বললে—এ কি হল?

উত্তর এল একটা বোমা ফাটার আওয়াজে। তারই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ট্-ট্-ট্ শব্দে মেশিনগানের আওয়াজ বেজে উঠল। তার সঙ্গে রাইফেল।

হঠাৎ সেন ছুটে পালিয়ে এল—দরজাটা বন্ধ করবার সময় বোধহয় ছিল না,—দরজাটা খোলা রেখেই পালিয়ে এল। ওদিকে বাইরে এসে থামল একটা ট্রাক।

ফট ফট ফট শব্দে গুলি ছুটে গেল চারিদিকে। সেন আমাকে বললে—পালিয়ে আসুন!

—পিছনের ওই গলিপথ ছাড়া আর পথ কোথায়?

পিছনে খুব সরু একটা গলিরাস্তা। আগে এপথে ঝাড়ুদাররা ময়লা পরিষ্কার করবার জন্য যাতায়াত করত এখন সুয়েয়েজ হয়েছে—তার পাইপ পাতা হয়েছে। মানুষজন বড় চলে না। সেই পথেই সেন রহিমকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে খিড়কির বহুকাল বন্ধ দরজাটা ভেঙে বেরিয়ে গেল। আমি তার পিছনে।

ওদিকে বাড়ির বাইরের দিগন্ত আপিসের বন্ধ দরজায় লাথির পর লাথি পড়ছে। দরজা ভাঙছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই দরজা ভেঙে পড়ার শব্দ হল। তারপরই ভারী জুতোর শব্দ। বাড়ির ভিতরটা ঘুরে দেখলে। গলিটাতেও টর্চ ফেললে। আমরা লুকিয়েছিলাম গলিটার একটা বাঁকে।

ওরা দিগন্ত আপিসের কাগজে ফার্নিচারে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন দিয়ে চলে গেল।

আমরা বসে রইলাম গলিতে।

চারিদিকে তখন শুধু গুলি গুলি আর গুলি। মেশিনগান রাইফেল চারিদিকে যেমন ইচ্ছে ছুঁড়েই যাচ্ছে, ছুঁড়েই যাচ্ছে এদিকে ওদিকে—কোথায় উপরে একটু আলো দেখা যাচ্ছে কোন জানালায় সেদিকে গুলি ছুটছে।

চীৎকার চীৎকার চীৎকার। মানুষ কাতরাচ্ছে কাঁদছে, আল্লা আল্লা আল্লা!

কোন্ দিকে কেমন ক'রে যে সেই নরকের অন্ধকার দিয়ে গড়া রাত্রিটা পার হয়ে যাচ্ছিল তা বলতে পারি না। বোবা হয়ে গিছলাম—নড়বার শক্তি ছিল না। চিন্তা করবার শক্তি নেই। সেনের দিকে আমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি—সেন তাকিয়ে আছেন আমার দিকে—চোখে পলক পড়ে না—চোখের তারায় একটা প্রশ্ন- এক প্রশ্ন—এ কি!

রহিম অজ্ঞান হয়ে গেছে- একটু একটু গোঁ গোঁ শব্দ বের হচ্ছে মুখ দিয়ে। সেন হঠাৎ বললেন—লোকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে মুখ চেপে ধরবেন। সদর রাস্তা থেকে শোনা গেলে ওরা খুঁজে এসে ঢুকবে।

কুকুরটা একপাশে পড়ে থরথর ক'রে কাঁপছে।

ওদিকে গুলি সমানে চলছে।

হুইসিলের শব্দ উঠছে।

ট্রাক আসছে যাচ্ছে। বিরাম নেই। মানুষ কাঁদছে কাতরাচ্ছে।

—বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও!

—ছেড়ে দাও, ছোড় দো, ছোড় দো!

—দোহাই আল্লাকো কসম খোদাকা—

তারপরই চলে গুলি। টুঁ টুঁ টুঁ টুঁ টুঁ।—লাইট মেশিনগান—স্টেনগান। সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়।

এরপর একবার যেন থামল। মানে গুলি থামল। হেঁটে চলাফেরা আরম্ভ হল। ওদিকে আমার বাড়ির সামনেটা দিগন্ত আপিসটা পুড়ছে। আগুনের আঁচ লাগছে। তবে নিভে আসছে।

সেন নিজের হাতঘড়িটা দেখলেন—রেডিয়াম দেওয়া আছে কাঁটায়। বললেন - তিনটে পার হয়ে গেছে।

ভয়ে এতক্ষণ পঙ্গুর মত ছিলাম। এখন ভয়টা কাটছিল। এখানে এইভাবে—হে ঈশ্বর—কতক্ষণ থাকা যায়। অসহনীয় মনে হচ্ছিল। লোকগুলো অনবরত চলাফেরা করছে। ভারী বুটের শব্দ উঠছে। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। সেন বারণ করলেন।—না। যাবেন না।

কিন্তু আমি কাওয়ার্ড নই। আমার মধ্যে অসহিষ্ণু সাহসিকতা জেগে উঠেছে। না—বেপরোয়া ভাব নয়। অসহিষ্ণু সাহসিকতা। তখন কাছে জল নেই, মদ নেই, সিগারেট পর্যন্ত ফুরিয়ে গেছে। রহিমের জ্ঞান ফিরেছে - খুনখুন ক'রে কাঁদছে। সেনের কথা আমি শুনলাম না -এগিয়ে গেলাম হামাগুড়ি দিয়ে, শেষটা শুয়ে শুয়ে। গলির মুখে ছায়াচ্ছন্ন দিকটায় গা ঘেঁষে শুয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম রাস্তায় আলো জ্বলছে না, রাত্রি অন্ধকার, তার মধ্যে অনেকগুলো টর্চের আলো ঘুরছে। আমার চোখেও তখন অনেকক্ষণ অন্ধকারে থেকে অন্ধকারের মধ্যেও দেখার একটা ক্ষমতা এসেছে।

দেখলাম—চৌমাথার মোড়টায় অসংখ্য মানুষ মরে পড়ে আছে। খান সাহেবের জওয়ানেরা সেই লাশগুলো টেনে টেনে ট্রাকে তুলছে। পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে আসছে—মৃতদেহ বলে এতটুকু সম্মান নেই; মধ্যে মধ্যে কোন লাশ যদি কিছুতে আটকে যাচ্ছে তা হলে টাননেওয়ালা ঘুরে গিয়ে প্রথমেই মরা লোকটার মুখে লাথি মেরে—তারপর যাতে বা যেখানে আটকেছে সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখছিলাম।

ট্রাকটা চলে গেল লাশ-বোঝাই হয়ে। কিছু লাশ তখনও কিন্তু পড়ে রইল।

আমার পায়ের উপর ইশারা জানিয়ে সেন বললেন—পিছিয়ে আসুন। আর না। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। কখন হয়তো নজরে পড়ে যাবেন।

পিছিয়ে এসেছিলাম।

* * *

২৬শে সকাল হল। কাক কোকিল মোরগ পশুপাখি যেমন ডাকবার তেমনি ডাকল।

সেন আমার মনকে সজাগ করবার জন্যে সেদিন কথাটা বলেছিলেন—Mr. Officer, আমি পঙ্গুর মত হয়ে গিছলাম।

আমি coward নই। বলেছি তো একবার, বাঘশিকারীর সঙ্গে বনে মাচার উপর সারারাত্রি একলা বসেছিলাম। বাঘটা আমি মারিনি কিন্তু বাঘটা লাফ মেরেছিল আমারই মাচার সামনে। She was a tigress—জাফরউল্লা খাঁ সাহেব তার বাচ্চাটাকে মেরেছিল একটু আগে; বাঘিনীটা কিছুক্ষণ পর এল বাচ্চা খুঁজতে,—she was furious—

অফিসারটি বললেন—নিজের কথায় আসুন। নিরর্থক বাজে কথা বাড়িয়ে লাভ কি?

লোকটি বললে—Excuse me please. আমি ভুলে যাচ্ছি; নিজেকে ঠিক control করতে পারছি না। তবে নিরর্থক বাজে কথাও নয় Mr. Officer.—নাহলে আজ মুহূর্তে এইখানে spy বলে সন্দেহভাজন হয়ে কৈফিয়ত দিতাম না আমি, আমি কোন ক্রীশ্চান মিশনে গিয়ে অনায়াসে নিরাপদ আশ্রয় পেতে পারতাম। হয়তো এই ঘটনার পর চলে যেতে পারতাম ইউরোপ বা আমেরিকা বা Australia. তা আমি যাইনি। আমি coward নই—আমি traitor-ও নই। যে বাবা আমাকে নিঃসহায় নিঃসম্বল ফেলে রেখে চলে গেছে তার great grandfather-এর দেশে, তার প্রতি আমার কোন ভালবাসা ছিল না—নাই-ও। কিন্তু my mother—আমার মা ছিল এদেশের মেয়ে।

—আপনি কি মনে আঘাত পেয়েছেন Mr.—

—I am Mr. Armstrong—David Armstrong.

—আঘাত পেয়ে থাকলে আমাকে মাপ করবেন। কিন্তু যদি সেই সঙ্গে বলি যে কিছু কিছু এমন অপ্রিয় কর্তব্য আছে যা পালন করতে গেলে sentiment-কে বাঁচানো যায় না। বলুন তারপর—

—সেন ভদ্রলোকটি আপনাকে সকাল হচ্ছে মনে পড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন ফিরে আসতে।

মিস্টার আর্মস্ট্রং বললে—কাক-কোকিল ডাকছিল—মোরগ ডাকছিল—দুটো-একটা কুকুরও ডাকছিল—কিন্তু সে ঠিক কুকুর যেমন ভাবে ডাকে তেমন ভাবে ডাকা নয়; কুকুরেরা কাঁদে জানেন—তেমনি ভাবে যেন কেঁদে ককিয়ে উঠছিল ভয়ে। তারই মধ্যে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে একটা দুটো রাইফেলের শব্দ।

সেনের কথায় সম্বিৎ ফিরেছিল আমার। পিছিয়ে গলির মধ্যে এসে যে একটা বাঁকের মোড় ছিল সেইখানে ফিরে এসেছিলাম।

সেন বলেছিলেন—গলিতে নয় আর। বাড়ির ভিতরে চলুন। দেখেশুনে লুকোবার মত জায়গা একটা করে নেব।

* * *

ওদিকে সামনের দিকে দিগন্ত কাগজটার আপিসে লাগানো আগুন তখন নিভে এসেছে।

কলে জল পড়ছিল, শব্দ উঠছিল।

জল পড়ার শব্দ শুনে মনে হয়েছিল গলা পর্যন্ত তৃষ্ণায় যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে।

কলে হাত পেতে জল খেয়ে নিয়েছিলাম। পিছনে এসেছিল রহিম।—পানি—পানি—

সেন এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ওয়াটার বটল, মদের বোতল নিয়ে। বলেছিলেন—জল ভরে নিয়ে কল বন্ধ ক'রে দেব। জল পড়ার শব্দ শুনলে মনে হবে বাড়িতে লোক আছে।

দরজা বন্ধ করতে দেননি সেন। বলেছিলেন—না—তাহলে সন্দেহ হতে পারে কেউ আছে ভেতরে। থাক খোলাই থাক।

আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম ওই ঘরটার মধ্যে। খুব যত্ন ক'রে আড়াল তৈরী করেছিলাম। রহিমকে নিয়েছিলাম ঘরের মধ্যে। আমাকেই সে জড়িয়ে ধরেছিল। রহিমের কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেও পারিনি—সেটা গিয়ে ঢুকে বসেছিল পাইখানার মধ্যে।

সেনের কাছে খাবার ছিল। আমার ঘরে ছিল খানকয়েক বিস্কুট, খানিকটা চিনি, দুখানা গতকালের বাসী রুটি। তাও ছেঁড়া। খেয়ে পড়েছিল যা তাই। সেনের কাছে ছিল দুখানা পাঁউরুটি, কিছু বিস্কুট। আর ছিল কয়েকটা লজেন্স। সেন লজেন্স খান। সব সময় কাছে রাখেন।

সকাল হয়ে এল, ঘর অন্ধকার, বন্ধ বাইরের জানালাটার কয়েকটা জোড় আর ফাটাফুটো দিয়ে আলোর রেখা দেখা দিল।

আস্তে আস্তে গিয়ে একটা ফুটোয় চোখ রাখলাম।

খুব ছোট নয়, মাঝারি একটা চৌমাথার উপর ছিল আমার বাড়িটা। চৌমাথাটায় একটা লম্বা ফালি দেখা যাচ্ছিল।

হে ঈশ্বর!

ধুলোতে আর রক্তে পিচের রাস্তার উপর কালো একটা স্তর পড়েছে—থকথক্ করছে। লাশ পড়ে আছে তখনও। পনের-বিশজনের মৃতদেহ তো বেহই। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। নানা ভঙ্গিতে মরে সেই ভঙ্গিতেই পড়ে আছে। কেউ মুখ থুবড়ে ঘাড় গুঁজে পড়েছে। কারুর মাথাটা পড়েছে ড্রেনের মধ্যে, পা দুটো উপর দিকে উঠে আছে। কাপড়চোপড়গুলো তখনও লাল টকটক্ করছে। তারই উপর পড়েছে সূর্যের আলো।

হঠাৎ আবার হুইসিল বেজে উঠল দূরে, সঙ্গে সঙ্গে চৌমাথা থেকেও বাজল। ওই জানালার ফুটো দিয়ে দেখা যাচ্ছিল না কোথায় দাঁড়িয়ে আছে যারা হুইসিল বাজিয়ে উত্তর দিচ্ছে।

দূরে মিলিটারি ট্রাকের সাড়া জাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার টু টু টু টু। ফট-ফট-ফট-ফট। দুম্-দুম্-দুম্। শব্দ বেজে উঠল। মেশিনগান রাইফেল চলছে—গ্রেনেড ছুঁড়ছে।

সেন বললেন—আবার আরম্ভ হল। সরে আসুন।

মিথ্যে বলেননি সেন। উপরতলার পোড়া দিগন্ত আপিসের দেওয়ালে বুলেট এসে বিঁধছে। ঝর ঝর ক'রে পলেস্তারা খসছে। দুমদাম শব্দে চাঙর খসছে। একটা বুলেট এসে আমরা যে একতলা অংশটায় ছিলাম তারই ছাদের আলসেতে বিঁধল।

রহিম বু-বু শব্দ ক'রে উঠল ভয় পেয়ে।

হাহা হিহি শব্দে কারা হাসছে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে বাজছে মোটরের শব্দ। খান সাহেবের সৈনিকপুরুষেরা হাসছে।

আমি সরে এলাম।

রহিম বললে—সাহেব।

উত্তর দিলাম—চেল্লাস না রহিম। শুনছিস না বন্দুকের শব্দ? কান্না?

অপরাধীর মত রহিম বললে—হায় আল্লা—

আমি বললাম—কি বলছিস রহিম। আস্তে বল্। তোকে আমি বকছি না। রাগ করিনি। বলছি আস্তে বল্। শুনতে পাবে বাইরে থেকে।

—আজ কি আর ফজর অইব না সাহেব?

—সে কি? ফজর তো হয়ে গেছে রহিম।

—হয়ে গিছে তো ইসব থামতেছে না কেন?

—কাক-কোকিল ডাকছে মোরগ ডাকছে শুনতে পাচ্ছিস নে?

—তা হ'লি ওরা অখনও এমন কইরা কি করত্যাছে?

—মানুষ মারছে রহিম—যারে পাচ্ছে তারেই গুলি করছে।

কেঁদে উঠল রহিম। সে কান্না বিচিত্র কান্না। থুনথুন শব্দে চাপা কান্না তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। সেন তার মুখ চাপা দিয়ে বললেন—চুপ!

আবার চলতে লাগল গুলি, গ্রেনেড আর মানুষের চীৎকার।

আ-আ-আ। আ-আ। কথা নাই শুধু চীৎকার রব।

আমার বুকে গাঁথা হয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে দু'একটা কথা—বাপ্ রে—হায় আল্লা—হে ভগবান—ওরে মা রে! গেলাম। বাঁচাও! ও!

এমন একটা পৈশাচিক দিন কেউ কখনও কোনকালে দেখেনি—এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

সেন হঠাৎ বললেন—আশপাশের বাড়িগুলো ভেঙে ভেঙে ঢুকে দেখছে। দেখছে নয় গুলি করছে। মারছে। লুঠ করছে। হে ভগবান—

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সেন বলে উঠলেন—হে ভগবান—

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল?

—বাড়ি থেকে টেনে টেনে মেয়েদের বের করে আনছে। বুকের কাপড় টেনে ছিঁড়ে দিচ্ছে। আঃ—উলঙ্গ ক'রে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে—

আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম—সরুন তো, দেখি কাদের বাড়ির সর্বনাশ করলে।

আমার প্রতিবেশীর মধ্যে তিনটে বাড়ি ছিল হিন্দুর। ওদের মেয়েদেরও মোটামুটি চিনি আমি। ছায়ার সঙ্গে ওদের পরিচয় ছিল। জানালার একটা ছিদ্রতে চোখ লাগিয়ে শিউরে উঠলাম। সে এক নিষ্ঠুর আতঙ্ক—অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্করত্ব; সে একটা নারকীয় পৈশাচিকতা।

মনে হল একদল প্রেত প্রেত-তাণ্ডব শুরু করেছে—নরকের অন্ধকারের উপর দিনের আলো পড়ে নরকে কি ঘটে তাই দেখাচ্ছে।

আঠারো-কুড়ি কি বাইশ-তেইশজন মেয়ে,—উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ হয়ে কুঁকড়ে কোনমতে নিজেদের দেহটাকে নিজের দেহ দিয়ে ঢাকতে চাচ্ছে। কয়েকটা মেয়ে ছিঁড়ে কেড়ে নেওয়া কাপড়টার একটা দিক তখনও দু'হাতে বুকের উপর চেপে ধরে আছে। সব থেকে বীভৎস একটা পিশাচ একটা মেয়েকে রাস্তার উপরই ফেলে তার কাপড়চোপড় ছিঁড়ছে মেয়েটি চেঁচাচ্ছে, পিশাচটা তার মুখে চাপড় মারছে। আর একটা পিশাচ একটা পূর্ণ উলঙ্গ মেয়েকে লাথি মেরে রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ক'টি মেয়ে—তারাও সম্পূর্ণ উলঙ্গ—মাথার চুলগুলো বিশৃঙ্খল বিস্রস্ত,—তারা যথাসম্ভব কুঁজো হয়ে নিজেকে ঢেকে হাত জোড় করে ভিক্ষা করছে। একটি মেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করেছে। শুনতে পাচ্ছিলাম তারা মিনতি করছিল—তোমাদের পায়ে ধরি বাঁচাও—ছেড়ে দাও—আল্লার দোহাই—

ওদিক থেকে ছুটে এলো দুটো পিশাচ—তারা এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি আমার মাথার চুল দু'হাতে টেনে ধরে কোন জন্তুর মত একটা বোবা চীৎকার করে উঠতে চেয়েছিলাম।

আমার পিঠে হাত রেখেছিলেন মিস্টার সেন।

আমি তাঁর দিকে তাকাতে সেন বলেছিলেন—সরে আসুন—ভুলে যান আপনি বেঁচে আছেন,—চোখ বন্ধ করে কানে আঙুল দিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকুন।

আমি বলেছিলাম—না, আমি বেরিয়ে গিয়ে সামনে যাকে পাব তাকে মেরে ফেলব। তারপর ওরা আমাকে মেরে ফেলুক।

সেন বলেছিলেন—না।

—কিন্তু আমি যে পাগল হয়ে যাব—

—সে কি আমিই যাব না?

হঠাৎ আমার পালাবার কথা মনে হয়েছিল।—চলুন—তা হ'লে পালিয়ে যাই—

—পালিয়ে?

—হ্যাঁ। এখানে থাকলেও তো মরতে হবে।

দুজনেই দুজনের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলাম—কিন্তু পালাবারও কোন পথ সামনে কল্পনা করতে পারলাম না। একটা ভয় একটা অসহায় দুর্বলতার মধ্যে যেন ডুবে যাচ্ছিলাম।

এরই মধ্যে হঠাৎ বাইরে উঠোনে জুতোর শব্দ উঠল। চার-পাঁচজন মানুষের জুতোর শব্দ।

খটখট শব্দে দাপিয়ে বেড়ালো খানিকক্ষণ। আমরা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে বসে রইলাম। সেন রহিমের মুখ চেপে ধরলেন। রহিম প্রায় অন্ধ। একটা চোখ একেবারে নেই। একটা চোখে অল্প অল্প দেখে; সেই একটা চোখের সে-দৃষ্টি আমি ভুলতে পারব না। সেন ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ এনে বলেছিলেন—চু—প—

স্থির হয়েই পড়েছিল রহিম, নড়েনি।

হঠাৎ আমাদের ঘরটার দরজার কাছে এসে একজন একটা ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠল—আয় বাপ্—উ—কা?

—সাঁপ—

—নেহি—

রহিম রোঁয়া-ওঠা কুকুরটার ওই রোঁয়া-ওঠা রোগ সারাবার জন্য সাপের খোলস একটা কুড়িয়ে এনেছিল কাল বিকেলে। সেটা রাখা ছিল পাঁচিলের উপর ঝুলিয়ে, কখন যে সেটা উঠোনে আমরা যে ঘরে লুকিয়েছিলাম—তার সামনে এসে পড়েছিল কেউই তা জানতাম না। মানে আমরা কেউ খেয়াল করিনি, এদেশে যারা থাকে তারা সাপকে ওদের মত গ্রাহ্য করে না—ভয় করে না। আমরা হয়তো দেখেও দেখিনি। হয়তো পাঁচিলের উপর থেকে আমারই গায়ে ঠেকে খসে পড়েছে—আমি গ্রাহ্য করিনি।

তবে সাপের খোলসটা বেশ বড় রকমের ছিল।

আমরা ঘরের ভিতর থেকেই শুনতে পেলাম—তিন-চারজনে প্রায় সমস্বরে বলে উঠল—আরে বাপ্—

—এ—ত—না বড়া—।

—কাঁহা হ্যায় উ?

—কে জানে?

বলতে বলতেই ঘরের মুখটায় এসে দাঁড়াল এবং বলল—বিলকুল আঁধিয়ারা—

একটা পা চৌকাঠের এপারে পড়ল। কে একজন বললে—নেহি জী—

সঙ্গে সঙ্গে টর্চ পড়ল ভিতরে। ঘুরল তিন দেওয়ালে। একজন বললে—টুটাফুটা

চিজবিজ—

একজন বললে—বরবাদ হো গয়া সব—

আর একজন বললে—ই তো আখবর কা আপিস হ্যায়। উ তো জালা দিয়া হুয়া—উ লোক ভাগ গিয়া হোগা—

—কাঁহা যায়েগা? রাস্তাকে পর খতম হো গয়া হোগা।

—একজন বললে—আরে দূর কোই অওরৎ মিলি নহি—

—চলো—চলো—

আবার একবার চারিদিকে আলো ফেললে। আমরা কতকগুলো ভাঙা লোহার আসবাবের তলায় পড়েছিলাম মৃতের মত।

ওরা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ আমরা কেউই কথা বলিনি। মনে হচ্ছিল বুঝি অনন্তকাল ধরে এইভাবে বোবার মত কালার মত কানার মত পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত পড়ে আছি।

হঠাৎ একসময় আবার গুলির শব্দ, আর তারও থেকে বেশী উঠেছিল মেয়েদের গলার আর্তনাদ।

They were shrieking—it was terrible. কোন কথা নেই, শুধু চীৎকার এর আগেও তারা করছিল, when the brutes were—. I have told what happened. তখন ভেবেছিলাম এই শেষ, এরপর আর নেই।

কিন্তু না। এরপর আরও ছিল। আমরা ধারণা করতে পারিনি। এবার ওরা গুলি ক'রে এবং বেয়নেটিং ক'রে they killed those women.

রহিম জিজ্ঞাসা করেছিল—সাহেব, কি অইত্যাছে সাহেব? সাহেব?

সেন তার মুখে একটা থাপ্পড় মেরে বলে উঠেছিলেন—তোকে আমি মেরে ফেলব রহিম—তুই চুপ কর্।

এরপর সারাটা দিন আমরা নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলাম। মধ্যে মধ্যে ঢুলেছি—তন্দ্রা এসেছে, আবার গুলির শব্দে মর্টার কামানের শব্দে চমকে সে তন্দ্রা ভেঙে গেছে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। কথা বলতে পারিনি। কথা খুঁজে পাইনি। সারাদিনের মধ্যে খানিকটা রুটি আর চিনি ছাড়া আর কিছু খাইনি। কষ্ট খাবারের জন্যে হয়নি। কষ্ট হয়েছিল drinks-এর জন্যে। একটু মদ হ'লে হয়তো জোর পেতাম, মদের থেকেও বেশী কষ্ট হয়েছিল সিগারেট-বিড়ির জন্যে। রহিমটা আপিং খায়—খানিকটা আপিং ওর ছিল—সেটা ও সবটাই ২৫শে রাত্রি থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খেয়ে একটা সেন্সলেস হাফ-অ্যাস্লিপ নির্বোধের মত ঝিমিয়েছিল।

বাইরে সারা শহরে মিলিটারি ভেহিকল্‌সের চলাফেরার শব্দ। গুলির শব্দ। টু-টুটুটু-টু। লাইট মেশিনগান, হেভি মেশিনগান। অটোমেটিক রাইফেল। মর্টার।

ট্যাঙ্ক চলার শব্দও পেয়েছিলাম। সে একটা নেজাল—আই মীন শোনাটে ঝন-ঘন-ঝন-ঘন শব্দ কানে শুনে শরীরটা শিউরে ওঠে, মস্তিষ্ক আর্তনাদ করে উঠতে চায়—প্রাণপণে

নিজের মুখ নিজে চেপে ধরি। বাইরের আর্তনাদের মধ্যে যত ঈশ্বরের নাম—হায় আল্লা হায় আল্লা, হে ভগবান—তত জন্তুর মত উ—আ—হা চীৎকার।

সেন একবার কেঁদেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনি কাঁদছেন?

সেন বলেছিলেন—হ্যাঁ। ছেলেটা মেয়েটা আর স্ত্রীকে যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মনে হচ্ছে আর দেখা হবে না। এখান থেকে বেরুতে আর দেবে না এরা।

জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনার কেউ নেই আপনার জন?

বলেছিলাম—না। এখন আমি সম্পূর্ণ একা।

* * *

রাত্রি তখন প্রায় শেষরাত্রি—

হ্যাঁ, ২৬শে মার্চ শেষরাত্রি; সেন তাঁর ঘড়ি দেখে বলেছিলেন দুটো। বেশ কিছুক্ষণ যেন সব থেমে এসেছিল—কাল থেকে দিনরাত্রি মানুষজন সব পাগল হয়ে গিয়েছিল। মাত্র ঘণ্টা-দেড় কি দুই সবে যেন ছেদ পড়েছে। মধ্যে-মাঝে দুটো কি একটা কি পর পর তিন-চারটে শটের আওয়াজ হচ্ছিল।

সেন অন্ধকারের মধ্যেই ঘড়ি দেখে বলেছিলেন—দুটো।

আমি বলেছিলাম—থামল মনে হচ্ছে—

কথা শেষ হতে না হতে পর পর দুটো রাইফেলের গুলির আওয়াজ হল, আমাদেরই সদর দরজাতেই একটা বুলেট এসে বিঁধল, আর একটা কিছু পড়ার শব্দ হল, তার সঙ্গে একটু-খানি চীৎকার। চীৎকার ঠিক হয়েছিল কিনা তা ঠিক বলতে পারব না। মনে হচ্ছে রহিম আঃ বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। কানা রহিম কখন যে এরই মধ্যে এই কিছুক্ষণ শান্ত নিস্তব্ধ রাত্রির ভরসা পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে কোথাও হোক পালিয়ে যাবার কল্পনায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তা আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু বেরিয়ে সে পড়েছিল—একটা চোখে সে একটু-আধটু দেখতে পেত। পথে সেদিন আলো ছিল—মিলিটারিব লোকেরা নিজেদের গরজেই জালিয়ে রেখেছিল। রাত্রি শান্ত হওয়ার আভাস পেয়ে আর বাইরের আলোর আশ্বাস পেয়ে যেই বেরিয়ে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে, আর দুদিক থেকে দুটো রাইফেল গর্জে উঠেছে।

রহিম পড়ে গেল। রহিমের কুকুরটাও বোধহয় ওর সঙ্গে বেরুতে চেয়েছিল—সেটা আর্তনাদ করে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গুলি। ব্যস, সব নিস্তব্ধ।

না। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানা বুটপরা পা এসে বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে কয়েকটা গুলি ছুঁড়লে। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ল। দুটো বুলেট আমাদের লুকোনো ঘরের দেওয়ালে বিঁধল। বাড়ির চারিপাশে আবার খুঁজলে। পাইখানা বাথরুম কলের শুকনো চৌবাচ্চা একটা কয়লা-রাখা চোরকুঠরী। তবুও ওই সাপের খোলসটা দেখে আমাদের ঘরটায় ঢুকল না—গাল দিতে দিতে বেরিয়ে চলে গেল।

কিছু নেই বাড়িটায়। না জিনিসপত্র না মানুষ না ঔরৎ।

বললে—ছোকরী ছোকরী। বাংগালীন ছোকরী কালী কালী, লেকেন আচ্ছা আচ্ছা হ্যায়। একঠো নেহি। বিলকুল ভাগ গয়ি।

আমরা বোবা হয়ে বসেছিলাম।

ভাবছিলাম—এর পর?

আমি ভাবছিলাম আমি এখান থেকেই চেঁচিয়ে বলব—ময় বাংগালী নেহি হুঁ, ময় হিন্দু ভি নেহি, মুসলমান ভি নেহি, ময় ক্রীশ্চান হুঁ। পাকিস্তানী ক্রীশ্চান; মুঝে যানে দো।

ঠিক সেই একই সময়ে সেনও ঠিক এক কথাই ভাবছিলেন। ভাবছিলেন চলে যাবার কথা।

না গিয়ে উপায় নেই—এখানে থাকলে মরতেই হবে।

হঠাৎ সেন উঠে দাঁড়ালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি?

সেন বললেন—পালাব। এখানে বাঁচা অসম্ভব।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যাবেন?

—ঢাকার বাইরে—শহর থেকে দূরে—যেখানে হোক।

তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি করবেন?

কোন চিন্তা-ভাবনা করলাম না, করতে ইচ্ছে হল না; গত কালকের আজকের মত দুটো রক্তাক্ত প্রেততাণ্ডবে বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর দুটো রাত্রি একটা গোটা দিন এই আরশোলা-ইঁদুর-পিঁপড়ে ভর্তি অন্ধকার একটা ঘরে রুদ্ধশ্বাসে কাটানোর পর এসবের থেকে দূরে কোথাও পালাবার কথায় কোন চিন্তা-বিবেচনার কথা আসবে কি ক'রে, কোন্ পথে? আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম—কিন্তু পালাব কোন্ দিকে? কি করে?

সেন বললেন—এর মধ্যেই বেরুতে হবে। না হয় মরব। এত লোক তো মরল—আমরা মরতে এত ভয় করব কেন। রিস্ক নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। এবং এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। মানে ভোর হবার আগে।

* * *

পেরেছিলাম তা।

তিনটের পর একটা সময় এসেছিল, বোধ করি প্রেততাণ্ডব ক রে ওরাও তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া এ অঞ্চলটাকেও মৃতের অঞ্চল বলে মনে হচ্ছিল। যে বাড়িগুলো লুঠ করবার তা লুঠ হয়ে গেছে; আগুন লাগাতেও বাকি নেই। এসব বাড়ির মেয়েদেরও বোধ করি আর কেউ অবশিষ্ট নেই।

তখনও দু'চারটে লাশ পড়েছিল এখানে ওখানে সুতরাং ক্লান্ত না হয়ে আর কিছু করবার ছিল না। তবে দূরান্তর থেকে মেশিনগানের শব্দ উঠছে। বাতাসে যেন আগুনের আঁচ রয়েছে। এরই মধ্যে রাত্রি তিনটের পর একটা লরি এসে দাঁড়াল। শিউরে উঠেছিলাম। আবার বুঝি আরম্ভ হবে নূতন তাণ্ডব! হে ঈশ্বর!

আতঙ্কিত হয়ে বিস্ফারিত চোখে সেন এগিয়ে গিয়ে জানালার ফুটোতে চোখ রাখলেন। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা ক'রে পিছনে বসে রইলাম। মিনিট-দুয়েক পর গাড়িটা চলে যাওয়ার শব্দ হল। সেন জানালা থেকে সরে এসে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আমি তাঁর পিছু পিছু গেলাম আর ক্রমাগত প্রশ্ন করলাম—মিস্টার সেন? সেন? সেন?

সেন শুধু বললেন—চুপ। চুপ করুন। চুপ—

বাইরের দরজায় উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে ফিরলেন। আমাকে বললেন—চলুন। এই চান্স। যে-কোন মুহূর্তে আবার গাড়ি আসতে পারে। বলে নিজের একটা ঝোলা আর একটা ব্যাগ তুলে নিলেন। আমিও নিলাম আমার চব্বিশ ঘণ্টার ঝোলাটা তুলে। আরও একটা হাতব্যাগ।

সেন বললেন—ভারী জিনিস নেবেন না।

বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে বাইরে রাস্তার উপর। রাস্তার আলো জ্বলছে। রাস্তার উপর এখানে ওখানে ডেড বডি পড়ে আছে। মেয়ে-পুরুষ। মেয়ে কম। গলির মধ্যে দুটো উলঙ্গ নারীদেহ পড়েছিল। গুলি করে মেরেছে। পাশ কাটিয়ে আসতে হল। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমরা গলিপথ ধরে চলছিলাম। মধ্যে মধ্যে রাস্তার এপার থেকে ওপারে গিয়ে আবার গলিতে ঢুকছিলাম। বড় রাস্তার কোথাও মৃতদেহ কোথাও রক্ত—কোথাও রাস্তার ধারের বাড়ি পুড়ছে।

ঠিক ছিল না কোথায় চলেছি। মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হয়ে গেছে। পুরনো পৃথিবী, শান্ত পৃথিবী, বিশ্বাসের পৃথিবী, নিরাপদ পৃথিবী যাকে জানতাম সে পৃথিবীই যেন হারিয়ে গেছে।

সেন হন হন ক'রে চলেছিলেন। আমিও চলেছিলাম।

মোরগ ডাকল কাক ডাকল কোকিল ডাকল একসময়।

থমকে দাঁড়ালেন সেন। বললেন—কোথায় এসেছি বলুন তো?

পুরনো শহরের কোন একটা অংশ।

খাঁ খাঁ করছে। এদিকটায় আলো নেই। মানে রাস্তাতে ইলেকট্রিক নেই। ভোরবেলাতেও থমথম করছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে চোখে পড়তে লাগল মানুষের মুখ। গলি থেকে মানুষেরা মুখ বাড়াচ্ছে। ভয়ার্ত মানুষ। দু'চারজন বাইরে এল—আবার ভিতরে ঢুকল। আবার বেরিয়ে এল। তাদের বগলে পোঁটলা, কাঁধে জিনিসপত্রের মোট। ওরাও পালাচ্ছিল।

জায়গাটা বুড়ীগঙ্গার ঘাটের কাছাকাছি।

ঘাটে ফেরি নৌকোয় চড়ে ওপারে গিয়ে যে যেদিকে পারে পালাবে।

ঘাটের ওপরে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দলে দলে লোক জমে রয়েছে। সামান্য

শব্দে চমকে উঠছে। মেয়েরা কাঁদছে।

সেন আমাকে বললেন—আপনি কোথায় যাবেন?

বললাম—ঠিক তো করিনি। মনেও কিছু নেই। কোন মিশনে যাওয়ার কথাটা মনে ছিল না তা নয় কিন্তু ভাল লাগছিল না। মনে করতেও না।

সেন একটু চুপ করে থেকে বললেন—আপনি বোধহয় ভুল করলেন। আমারও খেয়াল হয়নি।

—কি? বুঝতে পারলাম না সেন কি বলছেন।

সেন বললেন—আপনি আমাদের মত এদের মত চলে যাচ্ছেন কেন? আপনার তো কোন আশঙ্কার কারণ নেই। আপনি হিন্দু নন—আপনি এদেশের মুসলমান নন—

আমি বলেছিলাম—মিস্টার সেন—তার থেকে মরা ভাল। আমার মা বাঙালী, আমি ক্রীশ্চান; জানোয়ারদের বিরোধী নই বলে জানোয়ারদের মিত্র হিসেবে ওদের কাছে প্রাণ বাঁচাতে চাইনে আমি। তার থেকে বরং আমি কোন ক্রীশ্চান মিশনে গিয়ে আশ্রয় নেব। They will save me.

সেন অ্যাপ্রুভ করেছিলেন আমার আইডিয়া। বলেছিলেন—সেটা ভাল হবে। এ আপনি ভাল আইডিয়া করেছেন।

কিন্তু নদী পার হয়ে ওপারে এসে সব গোলমাল হয়ে গেল। এই মেয়েটির সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িয়ে পড়লাম।

ও-ঘরের দিকে হাত বাড়িয়ে অফিসারটি বললেন—ওর সঙ্গে?

—হ্যাঁ। নাজমার সঙ্গে। রহিমের মেয়ে নাজমা। আশ্চর্য রকমের কালো মেয়ে নাজমা। তাই দু'বছর আড়াইবছর পরেও ওকে দেখে চিনতে কষ্ট হয়নি।

অসংখ্য লোক—বেশির ভাগ গরীব আর মধ্যবিত্ত; এরা দলে দলে ঢাকা ছেড়ে পালাচ্ছে। এদের পাড়ায় হানা দিয়েছে ইয়াহিয়া খাঁয়ের মিলিটারির দল, পাড়া পুড়ে গেছে; হেভি মেশিনগানের গুলিতে আর মর্টারের explosionএ ভেঙে গেছে; যারা সামনে পড়েছে তারা মরেছে গুলিতে, মেয়েদেরও মেরেছে। তবে তাদের দুর্ভোগ অনেক বেশী—চরম লাঞ্ছনার পর বেয়নেট বিঁধে দিয়েছে বুকে কি পেটে। ছেলেগুলোকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বেয়নেটে গেঁথে নিয়ে খেলা করেছে তারা। যারা বেঁচেছে তারা পালাচ্ছে। ঢাকায় আর কিছু নেই। ইউনিভারসিটি কামান-মর্টার দেগে ভেঙে দিয়েছে। প্রফেসরদের কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে হানা দিয়ে টেনে বের করে এনে গুলি ক'রে মেরেছে। গার্লস হোস্টেল থেকে মেয়েদের ট্রাকে তুলে নিয়ে এসে তাদের চরম লাঞ্ছনা ক'রে শেষে গুলি ক'রে মেরেছে। বাঙালী পুলিস বাঙালী ই-পি-আরদের ২৫শে মার্চরাত্রে ব্যারাকে হানা দিয়ে নির্বিচারে গুলি ক'রে মেরেছে। আওয়ামী লীগ লীডারদের বাড়ির উপর ট্যাঙ্ক চালিয়ে দেবে গুজব রটেছে। আওয়ামী লীগের লোকেরাও তৈরী হচ্ছে। তারা লড়াই দেবে—।

ভাবছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, সেনও দাঁড়িয়েছিলেন পাশে। ঢাকা থেকে বেরিয়ে এসে

তিনি মত বদলেছেন—তিনি এ লড়াই দেখবেন। ওই বাড়িটার মধ্যে থেকে আমরা বুঝতে পারিনি যে প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। বুঝতে পারিনি এখনও পৃথিবীতে নিশ্বাস নেবার বাতাস আছে। মানুষের মৃতদেহ—রক্তে আর ধুলোতে কর্দমাক্ত পথ ছাড়া আর কিছু দেখবার আছে। নদীর এপারে এসে বুঝলাম—আছে। তাই শুনছিলাম।

সেন এরই মধ্যে ঠিক করেছিলেন তিনি যাবেন চট্টগ্রাম কুমিল্লা হয়ে শিলেট ময়মনসিংহের দিকে।

আমি ভাবছিলাম—যাই না ওর সঙ্গে।

হঠাৎ কেউ 'বড় ভাইসাহেব' ব'লে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আমার সামনে—একেবারে কোলের কাছে।

কে? চমকে উঠলাম। সামনে দেখলাম আশ্চর্য কালো মেয়ে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে; নরুণে চেরা লম্বা দুটি চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে দরদরধারায়; মাথার রুখু করকরে চুলগুলো বিশৃঙ্খল হয়ে ছড়িয়ে আছে; কোলে একটা ঘুমন্ত শিশু। আমার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। দেখতে দেখতে মনে হয়ে গেল একটি কৌতুকময়ী চঞ্চলা আশ্চর্য কালো মেয়েকে।

রহিমের মেয়ে—নাজমা।

ছায়া রহিমকে ডাকতো– রহিমচাচা।

রহিম ছায়াকে বলতো মা। নাজমাকে নাজমাই ডাকত ছায়া। নাজমা ছায়াকে ডাকতো 'দিদি' বলে, আমাকে বলতো 'বড় ভাইসাহেব'।

আপনাআপনি আমার মুখ থেকে নামটা তার বেরিয়ে এল—তার মধ্যে ছিল অনেক বিস্ময়। সবিস্ময়ে বললাম—নাজমা!

হা-হা ক'রে নাজমা কেঁদে উঠল।

* * *

নাজমার স্বামী গুলি খেয়ে মরেছে। একটা বস্তির মধ্যে একখানা ছোট্ট ঘরে ছিল ওদের বাসা। সেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরে সেই হিংস্র অন্ধকারের মধ্যেও সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে নদীর ধারে পৌঁচেছিল কোনমতে। তার ছেলেটা বেঁচেছে—সে বেঁচেছে। কাল সারাদিন লুকিয়েছিল নদীর ধারে। রাত্রে পাড়াটা দেখে এসেছে। উঠোনে স্বামীর দেহটা পড়ে আছে; নাজমা বললে -ছাতিভায় গুলি ঢুক্যা পিঠ পালে বাইরিয়া গেছে– রক্তে সব ভাইস্যা গেছে। চাপ বাঁধিছে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বললে—আমি কার কাছে যামু,—কোথা যামু আমি?—বড় ভাইসাহেব আপনি বলে দ্যান।

এই ক'ঘণ্টা আগে রহিম পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরেছে—কথাটা ওকে বলতে পারলাম না। কোন জবাবও খুঁজে পেলাম না। ওকে নিয়ে কি করব? কিন্তু ও

আমাকে ছাড়লে না।

সেন বললেন—ঈশ্বরটিশ্বর তো মানি না ভাই ডেভিড—তবে ওকে তোমার ঘাড়ে ঈশ্বর চাপিয়ে দিলেন একথা বলতে আমার একটুও সঙ্কোচ হচ্ছে না।

ওই কথাটাই যেন আমিও বলতে চাচ্ছিলাম আমার আমিকে। একজন ক্রীশ্চানের যে ঈশ্বরবিশ্বাস থাকে সে বিশ্বাস ঠিক আমার নেই। চার্চে আমি যাইনি দীর্ঘদিন। এবার ঢাকায় ফিরে এসে একদিন গিয়েছিলাম। তার আগে মাসকয়েক যাইনি। নৌকোতে ঘুরছিলাম তখন।

হঠাৎ লোকটি ইংরেজীতে বলতে আরম্ভ করলে—You see I am not a Saint—I don't believe in things like others. নাজমার ওই করুণা ভিক্ষার মধ্যে আমার অনেক কিছু আবিষ্কার করা উচিত ছিল, কিন্তু তা করিনি—করতে পারিনি। I didn't like it. ওই মুহূর্তে আমি আর এক মানুষ ছিলাম বোধহয়।

তা ছাড়া ঢাকার বাইরে এসে নদীর এপারে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল পুরনো পৃথিবী সব একেবারে মুছে যায়নি। তাই সেনের ওই কথাটা শুনে মনে হল ঠিক এই কথাটা তো আমি আমার আমিকে বলতে চাচ্ছি। সেই মুহূর্তে ঢাকার বাইরে নদীর এপারের ঘাটে দাঁড়িয়ে মনে করতে পারছিলাম না যে গোটা দেশটা জ্বলে উঠবে ক্ষেপে উঠবে।

সেন বললেন—তা হ'লে আমি রওনা দিলাম ভাই। তুমি এক কাজ কর, একেবারে ইন্টিরিয়রে গিয়ে কিছুদিনের জন্যে থেকে যাও। ওকে পার তো কোন একটা খেটে-খাওয়া কাজেকামে লাগিয়ে দিয়ো। ও খাটবে খাবে—তুমিও তোমার কাজ দেখে নিয়ো। তোমার স্ক্রু-ড্রাইভার, টেস্টার-যন্তরগুলো সঙ্গে এনেছ তো?

সেন চলে গেলেন। আমি ভেবেচিন্তে পথ ধরলাম নদীর ধারে ধারে গোয়ালন্দের দিকে।

I had some money—two thousand and five hundred. অর্থের ভাবনা ছিল না। ভাবনা ছিল নাজমা।

এমনই একটা আশ্চর্য কালো মেয়ে এবং তেমনি আশ্চর্য তার ছোটখাটো চেহারা। যেন একটি বালিকা মেয়ে। কিছুক্ষণ ভালো ক'রে দেখলে কিন্তু blood boils in your veins. তার যৌবন যেন উপচে পড়ছে।

আমার মত cat's eye চোখওয়ালা, তামাটে গায়ের রঙওয়ালা, ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা একটা লোকের পিছন পিছন এই আশ্চর্য কালো খাটো মেয়েটিকে দেখে সকলেই একটু একটু আশ্চর্য না হয়ে পারেনি।

না-হলে পথটায় বিশেষ বিঘ্ন হয়নি। তখনও সারা দেশটার বুকের ওপর যে হাওয়া বইছে যে হাওয়ার নিঃশ্বাস নিলে দেহমন চনচন করে ওঠে, মাঠে চাষী তখনও হাল বইছে, দেখা হলে জয়বাংলা বলছে; বাজারে জায়গায় চায়ের দোকানে লোকজন বসে মুঠি তুলে শপথ নিচ্ছিল—They will fight to the last; ট্রানসিস্টারে ক্যালকাটা রেডিয়ো স্টেশনের

প্রোগ্রাম বাজছে। ঢাকা রেডিয়ো কেউ শোনে না। কারুর ঘরে বাজলে তার বিপদ আছে।

ঢাকায় ২৫।২৬শে তারিখের বীভৎস নারকীয় তাণ্ডবের কথা বিস্তারিত করে বলছিল রেডিয়োতে।

এরই মধ্যে লোকের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছিল—কোত্থেকে আসছেন?

—ঢাকা। বলতে ভয় পায়নি। লুকোবার প্রয়োজনও মনে হয়নি। এরপর প্রশ্ন করেছে—কোথায় যাবেন?

তাও সত্য বলেছি—পালায়ে যাইত্যাছি, কোথা যামু ক্যামন কইরা কই কয়েন?

—নাম কি আপনার?

এবার মিথ্যে বলেছি—বলেছি মনসুর। আমি ক্রীশ্চান, নাম ডেভিড আর্মস্ট্রং বলতে সাহস করি না।

তারপর জিজ্ঞাসা করেছে—ও কে? এই কালো মেয়েটি? এমন কালো তো দেখা যায় না। ওর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?

আপনাআপনি মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে—আমার স্ত্রী। সেকথা ওকে আমি বলিনি। তবে ও শুনেছে দু-চারবার, কিন্তু কোন ভাবান্তর হয়নি। ওর বাচ্চাটিকে কোলে ক'রে চুপ ক'রে বসে থেকেছে। এক-আধবার বড় সংকোচের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়েছে, মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠেছে।

লোকে ঠিক বিশ্বাস করেনি আমার কৈফিয়ৎ। এই ধরনের কালো মেয়ে সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে নয়। আশ্চর্য কালোর এই জাত দেখা যায় ওই বেদেটেদেদের মধ্যে—হিন্দুদের একেবারে নিচু জাতের মধ্যে। লোকে সন্দেহ ক'রে তাকিয়ে থাকত আমাদের দিকে। নাজমার ছেলেটা অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করত। ছেলেটার রঙ ওর মায়ের মত কালো নয়। চোখ তার আমার মত কটাসে না হলেও গায়ের রঙ যেন ফরসা ছিল। নাজমা তার ছেলেটাকে আমার কোলে তুলে দিয়ে আমার কাছে সরে এসে গা ঘেঁষে বসত।

নাজমাকে আমি সময় বুঝে অনেক সময় বলেছি- ভয় করিস না নাজমা। তোর নেকা দিয়া ঘর বসত কইরাইয়া তবে আমার দায় শ্যাষ অব। তরে আমি এমনি ছাইড়া দিয়া চইলা যামু না। তু ভাবস না।

ও বলত—কে আমারে নিকা করবে বড় ভাইসাব?

বলতাম—ক্যান? তুই কালো, তাই কস ই-কথা?

ও বলত—তাও কই। তা ছাড়া আমার এই চাঁদটার কি অইব কও? পরের ছাওয়াল সমেত আমার মতুন কালী মাইয়া কে ঘরে লইবে, ক্যানে লইবে? নিকা করলি—আমার ছাওয়ালডারে সে মাইয়া ফ্যালাবে। তা ধিকা—আমারে একটা পাট কাম ঠিক কইরা দিয়ো আমি খাইটা খামু। আমার চাঁদডারে আমার বাঁচাইতেই অইব। ও মরলি আমি বাঁচুম না।

নাজমার রূপ একটা আছে। আশ্চর্য রূপ। মিস্টার অফিসার, আপনার চোখ আছে—আপনি সে রূপ দেখছেন—কিন্তু ওর মনের চেহারাটা আরও সুন্দর। ছেলেটাকে কোলে ক'রে দোলা দিয়ে ঘুমপাড়ানী গান গাইত। সে যে কত মিষ্টি তা বলতে পারি না। ওর মিষ্টি গলার কথা আমার অজানা ছিল না। ওর বাপের হাত ধরে ঢাকার রাস্তায় ভিক্ষে করত সে গান শুনেছি—ওর গলার গান আমার টেপে রেকর্ড হয়ে আছে। ওকে সাবধান ক'রে বলতাম—নাজমা এমন কইরা গান গাইস না। লোকেরা শুনলি কি জানি তরে ছিনাইয়া নিবে।

সরল বোকা মেয়েটা লজ্জা পেয়ে বলত—ধ্যেৎ।

আমার পক্ষে শক্ত হয়েছিল ওকে বোঝানো যে ওর রূপ আছে।

মিস্টার অফিসার, দিনের পর দিন আমি যত ভাবতাম—এ বোঝা আমি নামাব কি ক'রে ততই যেন ওকে আমি আঁকড়ে ধরেছি নিজেই। ভয় হয়েছে ও না আমাকে ছেড়ে চলে যায় অন্য কারুর সঙ্গে—কিংবা হঠাৎ কোনখানে দশদিন থাকতে থাকতে বলে বসে, তুমি এবার চইলা যাও বড় ভাইসায়েব—আমি এইখেনে রইয়া গ্যালাম গিয়া।

ঘরের প্রতি নাজমার বড় টান।

প্রায়ই গল্প করত ওর জীবনের অল্প ক'দিনের ঘরের। যে জোয়ান ছেলেটিকে ভালবেসে সে তার ভিক্ষাজীবী বাপকে ছেড়ে তার সঙ্গে চলে গিয়ে ঘর বেঁধেছিল ঢাকার আর এক প্রান্তে—সেই পুরুষের বিশেষ করে সেই ঘরের। তাদের আরও অনেক আশা ছিল। অনেক আশা, অনেক প্রত্যাশা। তারা শহরে রোজগার ক'রে নিয়ে গ্রামের দিকে যাবে। সেখানে কিছু জমি কিনবে—বাড়ি তৈরী করবে, হালগরু কিনবে; তার ছাওয়াল বড় হবে—তাকে পাঠশালে দেবে। সে পড়বে—ইস্কুলে পড়বে, কলেজে পড়বে।

এমনি গল্প করত। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম অবাক হয়ে। I will not conceal Mr. officer—আমি গোপন করব না যে এইভাবে এই আশ্চর্য কালো মেয়েটির একটু প্রত্যাশা আশায় উজ্জ্বল মিষ্ট হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি—; আমার বুকের মধ্যে একটা কিছু যেন তোলপাড় করে উঠেছে। আমি চঞ্চল হয়েছি। I could understand that it was desire,—that eternal desire of a man; সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তিরস্কার করেছি।

সেনের কথা মনে পড়েছে। সেন বলেছিল—আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না ডেভিড, কিন্তু এই মুহূর্তে ওই মেয়েটিকে দেখে আমার মনে হচ্ছে—এর দায় তোমাকে ঘাড়ে নিতে হবে, এটা হল ঈশ্বরের নির্দেশ।

আমারও মনে হয়েছিল, এই কথাটাই যেন আমি আমার আমিকে বলতে চেয়েছিলাম।

পথের পর পথ পিছনে ফেলে সামনে চলছিলাম। কোথায় গিয়ে ওকে নিরাপদ দেখতে পারব। চলছিলাম নারায়ণগঞ্জ ফেলে সামনের দিকে, গোয়ালন্দের দিকে। মধ্যে ক্রীশ্চান মিশন পেয়েছিলাম কয়েকটি। সেখানে গিয়ে আশ্রয় চেয়েছিলাম।

আমার পুরনো পাসপোর্টে আমার ছবির সঙ্গে আব্বাকে দিয়েছিল, ওদের আমার সব কথা শুনে ওঁরা বলেছিল—surely, তোমাকে আমরা অবশ্যই আশ্রয় দেব, but—

আব্বার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল—She is not a Christian, She is a Muslim girl—ওকে তো আশ্রয় দিতে পারব না।

আমি বলেছিলাম কি বলছ তুমি ফাদার। এই একটি বিপন্ন মেয়েকে তোমরা আশ্রয় দেবে না?

ফাদার বলেছিলেন—তুমি জান না কি হচ্ছে দেশের মধ্যে। ঢাকায় চিটাগংএ কুমিল্লায় বড় বড় শহরে হাজার হাজার men women children মেশিনগানের গুলিতে—

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বলেছিলাম—আমি চোখে দেখেছি ফাদার। দিনের আলোয় ঢাকার রাস্তার উপর mothers sisters daughters were dragged in—and—

ফাদার উপরের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে ডেকেছিলেন। বুকে ক্রশ চিহ্ন এঁকে শুচি হয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন—ওরা যে মুহূর্তে জানতে পারবে যে ঢাকা থেকে পালানো একটি মুসলিম মেয়েকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি সেই মুহূর্তে ওরা অপবাদ দেবে যে আমরা একটি মুসলিম মেয়েকে ক্রীশ্চান করছি। তারপর—

আমি চুপ করেই থেকেছিলাম। কি বলব এর পর? আশঙ্কা তো ফাদার মিথ্যে করেননি।

ফাদার বললেন—এখন Pak soldiers চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, gates of hell have been thrown open and devils are out—শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের দিকে ধাওয়া করছে। I would advice you to find out a shelter somewhere.—তুমি জান না মুসলিম লীগ people and জামেত-উলেমা people are working as informers. তোমাকে দেখলে তারা ধরিয়ে দেবে and—

* * *

হঠাৎ ধরা পড়লাম। ধরা পড়লাম আমি।

লাহোর অঞ্চলে একটা বড় ইলেকট্রিক কোম্পানীতে চাকরি করতাম। সেই কোম্পানীতে এক নবাবজাদা অফিসারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। উর্দু গজলে আমার খুব শখ ছিল; একদিন একটা নিঃসঙ্গ স্টোর আপিসে রাত্রে গজল গাইছিলাম আমি—নবাবজাদা জাফরউল্লা খাঁ হঠাৎ এসে পড়েছিল সেদিন এবং আমার সঙ্গে ডেকে আলাপ ক'রে সারারাত সে এক মহফিল জুড়ে দিয়েছিল। আমীর লোক, দিলদরিয়া আদমী, আমার উপরওয়ালা হয়েও আমার গান শুনে বলেছিল—দেখ নোকরি আমরা কখনও করিনি। নোকর আমরাই রাখতাম। এককালে কেনা নোকর গোলাম বান্দা থাকত আমাদের। কারুর উপর মেজাজ খুস্ হ'লে তাকে খোলঙ্গা দিয়ে জায়গীর দিয়ে দিয়েছি, জমিন দিয়েছি। আজ উ রোজ চলা গিয়া। জমিন জায়গীর আর নেই। লেকিন মেজাজ আছে। তোমার উপর খুস্ হয়ে গেছে মেজাজ। তুমি খুব ভাল গজল গেয়েছ। শরাব খেয়েছ আর খেয়ে

ঠিক আছ সেই জন্তে তুমি দোস্ত হ'লে আমার।

এরপর অনেকবার দেখা হয়েছে। নবাবজাদা -হাসেনা হাসেনা হুরাইয়া বেগম বলে এক বাঈএর বাড়ি যেতো—আমি লাহোর গেলেই সে আমাকে নিয়ে যেত হুরাইয়ার বাড়ি।

Of course I was quite a different person then. তখনও জীবনে মা বাবা যাওয়ার দুঃখ ছাড়া দুঃখ পাইনি কোন। সে-ও খুব বেশী নয়, কারণ my mother was a nurse by profession - নিজে নার্স ছিল, আমি মানুষ হয়েছিলাম একটি মুসলমান আয়ার কোলে। বাবা রেলের চাকরে, তা ছাড়া সাদা চামড়ার মানুষ—ওদের হার্ট একটু স্বতন্ত্র ধরনের, আমি বলেছি আমার মায়ের মৃত্যুর পরই সে একটি আধবুড়ী খাঁটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করে ইংল্যাণ্ড চলে গিয়েছিল—never thought anything about me; একটা নুড়ি পাথর হাতে নিয়ে লুফতে লুফতে হঠাৎ ফেলে দিয়ে চলে যাবার মত আমায় ফেলে চলে গিছল। তার উপর আমার প্রথম যৌবন। ঝড়ো জীবন—wild life সম্পর্কে আমার আকর্ষণ ছিল।

ইনস্‌পেক্টর বললেন—Please be brief।

—Brief। হাসলে একটু লোকটি।—আচ্ছা। একটা কথা বলে নিই শুধু, সেটা এই যে ছায়া আমার জীবনে এসে আমাকে পাল্টে দিছল। And then this girl—ওই নাজমা।

* * *

নাজমাকে নিয়ে গোয়ালন্দ ছাড়িয়ে কালুখালি রতনদিয়া বলে একটা আধা টাউনে আমি একটা বাসা ক'রে নিঃশ্বাস ফেলতে চেয়েছিলাম। জায়গাটা যেন অপেক্ষাকৃত শান্ত মনে হয়েছিল। বাজারে জায়গা; ক'রে খাবার—কাজ-কাম পাবার যেন সুবিধে ছিল। একদিকে শহর গজিয়েছে, অন্ত দিকটা পাড়াগাঁ।

এখানে চারিদিকটা যেন অপেক্ষাকৃত শান্ত।

এপ্রিল মাস পড়ে গেছে তখন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ। সারা দেশটা মার খেয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে, তবুও ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়েনি।

সারা দেশ জুড়ে পশ্চিম-পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রাম জ্বলছে মানুষ মরছে গুলি খেয়ে, সব থেকে বেশী লাঞ্ছনা মেয়েদের, তাদের মেরে ফেলবার আগে দল বেঁধে পশুর মত তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করছে। পথের ধারে নদীর ঘাটে গ্রামের মধ্যে উলঙ্গ নারীদেহ আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে আছে। সারা দেহ রক্তে-ধুলোতে মিশানো কাদায় কর্দমাক্ত হয়ে গেছে; কারুর বুকে গুলির ছিদ্র, কারুর পেটটা ফাঁসিয়ে দিয়েছে। সে দৃশ্য বীভৎস, সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর। নাজমা আমাকে মধ্যে মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠে বলত—বড় ভাইসাহেব, আমার কি অইব?

বেয়নেটে বিঁধে মেরে ফেলা শিশুদেহ পড়ে আছে নারীদেহের পাশে।

একতাল রক্তাক্ত মাংস।

নাজমা তার ছেলেটাকে বুকে চেপে ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত।

ওদিকে উত্তেজনা উত্তাপ বৈশাখের দুপুরের গরম বাতাসের মত উঠেযেন বিস্ফোরণের খুব ধরেছে।

মার্শাল ল চলছে ২৬শে ভোরবেলা থেকে।

২৭শে খবর রটেছিল—মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর টিক্কা খাঁ গুলিতে মারা গেছে। একটি মেয়ে রৌশনারা বুকে মাইন বেঁধে ট্যাঙ্কের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছে।

নানান্ গুজব নানান্ খবর। খবর রটেছিল—চিটাগং থেকে মুক্তিফৌজ লিবারেশন আর্মি আসছে ঢাকার দিকে। ২৪নং ফিল্ড ফোর্সের মেজর দৌলতপুরে আহত হয়েছে। পাক বম্বার সারা ব্রিজ উড়িয়ে দেবে কি দিয়েছে বলেও গুজব রটেছিল।

ঢাকা রেডিয়ো বন্ধ। রাজশাহী রেডিয়োও বন্ধ। চিটাগং-শিলেট-রংপুর কোন রেডিয়ো চালু নেই তখন।

কলকাতা রেডিয়োর খবরের জন্যে লোকেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। কলকাতা রেডিয়োতে একদিন মুজিবনগরে বাংলাদেশ গভর্ণমেণ্ট তৈরীর খবর শুনলাম।

আমার ট্রানজিস্টারটা ঝোলার মধ্যে পোরাই ছিল। এমন সুন্দর ছোট জিনিসটি বের করতে সাহস হয়নি। লোকেরা এমনিই আমাকে এবং নাজমাকে পাশাপাশি দেখে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। তার উপর এই চোখে-ধরা এমন জিনিসটিকে বের করতে সাহস হয়নি।

নিতান্ত নির্জনে সময় সুযোগ পেলে খবর ধরে শুনতাম।

এর পরই জোয়ারের পর ভাটির মত উলটো স্রোত বইল। লোকেরা আশা করেছিল—যে বিপ্লব ঢাকায় সেদিন আরম্ভ হয়েছিল সেই বিপ্লব চারিপাশ থেকে in waves চলে আসবে—এই কিছুদিন আগের সাইক্লোনের মত। এবং West Pakistani troops movement, military operation উড়িয়ে ভাসিয়ে ব্যর্থ করে দেবে। কিন্তু তা হল না। সপ্তাহ দু'য়কের মধ্যে হাজারে হাজারে Pak soldiers মেশিনগান অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে মিলিটারি ভেহিকল্‌স্ চড়ে শহরগুলোকে ছেয়ে ফেললে। হাজারে হাজারে লোক মরল—mothers daughters and sisters were raped in open day-light, then they were shot and killed, কামান মর্টার চালিয়ে university ভাঙলে—বড় বাড়ি ভাঙলে। বস্তি পোড়ালে। সেখানেও সেই এক ইতিহাস।

লোকেরা পালাতে লাগল। আগরতলা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ—হিন্দুস্থান। আমরা তখনও ঠিক করিনি বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও যাব কিনা। কালুখালি রতনদিয়ার কাছাকাছি এসে নাজমার ছেলেটা অসুখে পড়ল। নাজমা নিজেও ভয় পেয়ে যেন এলিয়ে পড়বার পূর্বমুহূর্তে কাঁপছিল দুখানা দুর্বল পায়ের উপর দাঁড়িয়ে। ছেলেটার গায়ে বেশ উত্তাপ।

রতনদিয়া কালুখালির বাজারের একপাশে একখানা ঘরে প্রথম সপ্তাহখানেক থাকব

জেবে একটুকরো বাসা নিয়েছিলাম।

তারপর দেখলাম—এখানে ক'রে খাবার খেটে খাবার পথ আছে। ব্যাগ থেকে বের ক'রে নিলাম আমার যন্ত্রপাতি। যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম, তাতে ছুটো ঘর ছিল, সামনে ছিল একটি বারান্দা; সেই বারান্দার দেওয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে লিখে দিলাম—Mr. D. Armstrong—Electrical Engineer—ইংরিজী বাংলা দুইয়েই লিখলাম। দিনসাতেক পর আরবী হরফেও লিখলাম। তখন ঢেউ যেন ফিরতে আরম্ভ করেছে।

বলতে দ্বিধা নেই—মনে মনে লজ্জার আর শেষ ছিল না।

তা আমি স্বীকার করেছিলাম। কারণ আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম ওই মেয়েটিকে।

ওকে বলেওছিলাম—নাজমা, তুই যেন আর নিজের নাম নাজমা বলবি নে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি—তোর নাম মায়া। মায়া আর্মস্ট্রং।

ওর খুব আশ্চর্য মনে হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল—বলব মায়া—? মায়া —। কি?—আর্মস্ট্রং শব্দটা প্রথমটা বুঝতেই পারেনি বেচারা।

—মায়া আর্মস্ট্রং। মুখস্থ কর। রপ্ত ক'রে নে।

—ছায়া দিদির বোন?

—না। তাও না। ছায়ার কেউ না। তুই শুধু মায়া। ছায়া মরবার পর তোকে আমি বিয়ে করেছি।

অবাক হয়ে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

আমি কারণটা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—দেখ, তুই মুসলমান মেয়ে আমি ক্রীশ্চান, আর আমার তুই কেউ নস, এ জানতে পারলে হয়তো গণ্ডগোল বাধবে রে। আবার তো দেখছি গতিক খারাপ হয়ে আসছে। লীগের পাণ্ডারা জামাতেউলেমার দালালেরা তো চারিদিকে বেড়াচ্ছে—কে জানে কোন্ ফ্যাসাদ বাধায়? কখন এসে বলবে—ও মেয়ে আমরা কেড়ে নিয়ে যাব। তবে তুই যদি যেতে চাস—কেউ যদি তোকে নেকা করে—

বার বার শিউরে উঠে নাজমা বলেছিল—না-না-না-না বড় ভাইসাহেব। না। আমার চান্দেরে অরা কুকুর-বিরালের মতুন ছ্যাক ছ্যাক কইরা খেদাইতে চাইবে—ঘেন্না করবে—হয়তো বা মাইরাই ফ্যালবে।

* * * *

নতুন ঘরে আসতেও নাজমার ভয় ছিল।

কিসের ভয় কাকে ভয় তা বলতে পারি না, নাজমাকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সেও বলতে পারেনি—বোকার মত আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছিল। শেষে বলেছিল—আমি জানি না—কইবারে পারুম না বড় ভাইসাহেব—তবে ক্যামন যানো ভয় লাগে—ভয় পায়।

ভয় আমারও লাগত। ভয় লাগত আমার আমাকে।

নাজমার মধ্যে আশ্চর্য একটা কি আছে। ওর আশ্চর্য কালো রং—ওর ওই আশ্চর্য যৌবন। সেন আমাকে বলেছিলেন ঈশ্বরের নির্দেশে এ দায় এসে আমার উপর বর্তেছে।

আমি সারা জীবনে বাইবেল গোটাটা পড়িনি। তবু বাইবেল একখানা আমার কাছে থাকে। নাজমাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চলতে মনে হল বাইবেল পড়ি। আমি পড়তাম। নাজমাকে বলেছিলাম—নাজমা, আল্লাকে ডাকতে ভুলিস নে, নামাজ যেন একবার ক'রে পড়িস। নামাজ নাজমা ঠিক পড়তে জানত না তবে হাঁটু গেড়ে বসে একবার চোখ বুঁজে আল্লা দয়া কর ব'লে ডাকত। বিপদের মধ্যে যখন কূলকিনারা পাওয়া যায় না—তখন এ ছাড়া কোন গতি থাকে না। তবে এর ভরসাও যখন করা যায় না তখন আর কারুর ভরসা বা কিছু ভরসাই থাকে না।

সেই ভরসাকে মাথায় করে একখানা বাড়ির একটা অংশ, একটা কুঠরী, একটুকরো রান্নাঘর, ভিতরে বাইরে দুটো বারান্দা ভাড়া নিলাম। নাজমার নাম হল মায়া। মায়া আর্মস্ট্রং।

একটা গোটা দিন মুখস্থ করলে নাজমা।

মায়া আর্মস্ট্রং, মায়া আর্মস্ট্রং, মায়া আর্মস্ট্রং। আর্মস্ট্রং, আর্মস্ট্রং, আর্মস্ট্রং, আর্মস্ট্রং।

পথ ছেড়ে ঘরভাড়া নিয়ে বাসায় ঢুকতে নাজমার ভয় হয়েছিল। ঘরে ঢুকে কিন্তু সে "আঃ বাঁচলাম" বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দার উপর শুয়ে পড়েছিল। অসুস্থ, জ্বর-হওয়া ছেলেটাকে টেনে নিয়েছিল কোলের কাছে। প্রায় ঘণ্টা-তিনেক ঘুমিয়ে তারপর উঠেছিল। দিনচারেকের মধ্যেই ছেলেটা সেরে উঠল, কিন্তু মানুষের দেহ মানুষের মন ওই বাড়িখানির উঠানটুকু মেঝেটুকু ঘরখানার চালের ছাউনিকে একেবারে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল যেন।

* * * *

বাড়িওয়ালাটি ছিল বড় ভালো মানুষ। অনেকটা মৌলানা ভাসানী সাহেবের মত দেখতে। মৌলানা ভাসানী যদি বিশ্ববিখ্যাত না হতেন তাহলে বলতাম—মানুষটাও এমনি ধরনের। শেখ আব্বাস করিৎকর্মা লোক—হিম্মৎওয়ালা আদমী। হজ ক'রে এসেছেন, নাম হয়েছে—হাজী আব্বাস।

পশ্চিমবঙ্গের লোক; দেশ ছেড়ে এখানে এসে শক্ত হয়ে চেপে বসে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে চাষ ছিল—জমি-সম্পত্তি ছিল। বেচেকিনে এখানে এসে ধান-চালের ব্যবসা করেছিলেন—তার সঙ্গে ইটখোলা। বাজারের শেষদিকে লম্বা একসারি ঘর তৈরী করিয়েছিলেন—ভাড়া খাটতো। খান বিশেক সাইকেল-রিকশা আছে – সেগুলি ভাড়ায় খাটে। আমাকে ঘরভাড়া দিয়েছিলেন ডেকে।

শহরে ঢুকবার মুখে গাছের তলায় বসেছিলাম আমরা। নাজমার ছেলেটা নতিয়ে পড়েছিল হঠাৎ—জ্বর তখন অনেকটা; বেহুঁশ ছেলে কোলে নিয়ে কাঁদছিল নাজমা। হাজীসাহেব ইটখোলা দেখে রিকশায় ফিরছিলেন। ছেলে কোলে ঘিরে নাজমাকে কাঁদতে

দেখে রিক্শা থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হয়েছে বাচ্চার ?

আমি ভয় পেয়েছিলাম।

নাজমা বলেছিল—আমার চান্দেরে বাচান। কি হয়েছে দেখেন।

হাজীসাহেব দেখেশুনে বলেছিলেন—সর্দির দোষটা খুব জোরালো মালুম হচ্ছে। জরও অনেকটা। কিন্তু তোমাদের বাড়ি কোথায় ? যাবে কোথায় ?

কৈফিয়ৎ যা দিয়েছিলাম তা অসত্য দিইনি। অসত্য বলবার কারণও কিছু ছিল না। সৎ-অসত্যের যেটুকু মামলা সে হল নাজমাকে নিয়ে। নাজমার ধর্ম নিয়ে।

হাজীসাহেব বলেছিলেন—আপনি বলছেন আপনি ক্রীশ্চান, তাই-ই হবেন। কিন্তু এই কালো মেয়েটা ?

পরক্ষণেই বলেছিলেন—থাক, ও যা—ও তাই। তবে আমি একটা কথা ওকে শুধিয়ে নেব।

নাজমাকে বলেছিলেন—ওগো মেয়ে, তোমার ছেলের তো অনেকটা জর। তুমি আমার বাড়ি যাবে ? তুমি তো মুসলমান, ও ক্রীশ্চান, আমি মুসলমান। দেখ যাবে ?

নাজমা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—না।

হাজী হেসে বলেছিলেন—তাহলে একখানা ঘর আমি দিচ্ছি—ভাড়া ক'রে কদিন থাকুন ; ছেলেটি সারুক তারপর যাবেন যেখানে যাবেন।

নাজমার খোকা চান্দের জর [illegible]। আমরা ঘরের মমতায় পড়লাম। হাজীসাহেবও বললেন—সেই ভালো ডেভিড সাহেব। এখনই আর কোথাও যেতে চেষ্টা ক'রো না। সারা পূর্বপাকিস্তানে এরা দোজখের আগুন জেলে দিয়েছে। ঢাকা চট্টগ্রাম কুমিল্লা নওয়াখালি শিলেট মৈমনসিংহ রংপুর রাজশাহী বরিশাল খুলনা যশোর সমস্ত শহরে শহরে পাকিস্তানী ফৌজ পৌঁছে গিয়েছে, বালবাচ্চা বুড়ো জওয়ান ছাওয়াল মেরে একাকার করেছে, মা মাসী বোন বেটীদের ইজ্জৎ ধুলোতে মিশিয়ে দিয়েছে দিনের আলোতে—

আমি বলেছিলাম—ঢাকায় সে-সব আমি নিজের চোখে দেখেছি। নাজমাও দেখেছে ওর নসীব আর খোদাতালার দোয়া সেরাত্রে ও লুকুবার জায়গা পেয়েছিল আর খা সোলজাররা জায়গাটা খুঁজে পায়নি। তাই তো পালাচ্ছি।

—কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায় ?

নাজমা বলেছিল, আমি বলিনি। বলেছিল—কোন গাঁওয়ে—কোন নদীর চরে কোন জঙ্গলের ধারে যেখানে দুঃখের ভাত সুখে-শান্তিতে খেতে পারে মানুষ, রাত্রে দু'চো বুঁজাতে পারে।

হাজী বলেছিলেন—তেমন কোন গাঁও তো আজ কোথাও নেই বেটী। আল্লার জা নেই। হিন্দুস্থানে অনেক মানুষ যাচ্ছে। হাঁ—সেখানে পৌঁছালে এইসব শয়তানের গিদা ঘরজ্বালাদের নাগালের বাইরে যাওয়া যাবে বটে—সেখানে মানুষেরা নাকি খুব যতনের সা ডেকে নিচ্ছে বটে কিন্তু সেখানে যাওয়ারও অনেক মেহনৎ, অনেক তকলিফ, অনেক বি

আবার সেখানে পৌঁছেও তো সেই তাঁবুর তলায় ভিজে মাটিতে গাছের তলায় শুকনখাবার খালা পেতে খেতে হবে। তার থেকে থাকো এখানে। আমরা বাঁচলে তোমরা বাঁচবে। আমার চার ছেলে, তারা আওয়ামী লীগের লোক। যতক্ষণ আমরা থাকব—ততক্ষণ তোমাদের ভয় নাই।

* * * *

শেখ আব্বাস হাজীসাহেব চিরকালের সেই বিচিত্র মানুষ—যাদের বৈচিত্র্য চিরকাল ধরে পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও পুরানো হয় না ময়লা হয় না মলিন হয় না—দাম কমে না।

ইন্‌স্‌পেক্টর হেসে বললেন—Please, bare facts only।

—কেন? কি বেশী বলেছি বলুন?

ডেভিড আর্মস্ট্রং একটু উষ্ণ হয়ে উঠল।

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি বলুন।

—আমি সত্যিই বলছি। মিথ্যা ইমোশন সৃষ্টি করে আপনাদের প্রতারণা করতে চেষ্টা করলে, আপনারা নিশ্চয় ধরতে পারবেন এবং আমাকে শাস্তিও দেবেন। কিন্তু এই সত্যটুকু না বললে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন না।

হাজী শেখ আব্বাস দেশের পার্টিশনের সময় ওদেশে গিয়ে আজও আক্ষেপ করেন। মুরশিদাবাদে বাড়ি ছিল। হিন্দু বন্ধু ছিল অনেক। কিন্তু সে-সব কথা থাক। হয়তো বেশী হয়ে যাবে।

এখানে কৃতী লোক। এখানে এসেও এই ক'বছরের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ হয়েছেন। কতকগুলো ব্যবসা খুলেছেন এবং সব ব্যবসাগুলোর তিনিই হলেন প্রাণপুরুষ। সারা বাজারে হাজীসাহেবের উপকার পায়নি এমন লোক খুব কম। মানুষের অসুখে-বিসুখে বিপদে-আপদে এমন বন্ধু আর মেলে না। তাঁর কামে-কারবারে ইটখোলায় রিকশার ব্যবসায়ে চাল কেনাবেচায় একশো দেড়শো লোক নিমক খেয়ে খাটে। অন্তভাবে ওঁর কাছ থেকে ক'রে খায় আরও অনেক লোক।

ছয় ছেলে হাজীসাহেব শেখ আব্বাসের।

শেখ আসাদুল্লা, আমানুল্লা, ইরফান, ইরসাদ, ইকবাল আর এবাদৎ। তিন মায়ের ছয় ছেলে।

আসাদুল্লা রাজশাহীতে উকীল।

আমানুল্লা ইস্কুল-মাস্টার।

ইরফান কলেজে পড়ে।

ইরসাদ ইকবাল বাপের সঙ্গে কারবারে খাটে। ওরা কলেজ পর্যন্ত পড়া ছেলে। আর এবাদৎ ইস্কুলে পড়ে। তরুণী কনিষ্ঠা পত্নীর সন্তান। এখানকার বাজারে মানুষের মিছিলের সামনে থেকে ঝাণ্ডা বয়ে বেড়ায়।

আসাদুল্লা এখানে আওয়ামী লীগ থেকে পাকিস্তানী নির্বাচনে জিতেছেন।

হাজীসাহেবের বাড়িতেই আওয়ামী লীগের আস্তানা। বাড়ির সামনেই প্রকাণ্ড উঁচু বাঁশের মাথায় বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ উড়ছে।

রোজ একবার ক'রে খোঁজ নিয়ে যেতেন হাজীসাহেব। সে যখন হোক। তাঁর সঙ্গে আরও ভালবাসা জমল ট্রানসিস্টার নিয়ে। আমার ছোট ট্রানসিস্টারটা দেখে হাজীসাহেবের ছেলেমানুষের মত লোভ হয়েছিল। ওটা আমি নিজে তৈরী করেছি শুনে আমার উপর তাঁর খুশীর আর শেষ ছিল না। তাঁর ছিল একটা দামী ব্যাটারী সেট। ভাল করে অ্যাডজাস্ট করতে পারতেন না। আমি অ্যাডজাস্ট করে লণ্ডন মস্কো শুনিয়ে দিয়েছিলাম।

হাজীসাহেব সেদিন বললেন—ডেভিড সাহেব, খারাপ খবর আছে। খান সিপাইরা ট্রাকভর্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। চাটগাঁ কুমিল্লা শীলেট রাজশাহী রংপুর—সব একেবারে পুড়িয়ে তোপের মুখে গোলা মেরে ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছে। যশোর খুলনা বরিশাল সব এক হাল। ইবার ছোট শহর হাটগঞ্জের পালা।

আমি রেডিয়োর খবর জানতাম। কলকাতা রেডিয়ো দুবেলা তিনবেলা বাংলা ইংরিজী হিন্দী খবরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের খবর দিয়ে যাচ্ছে।

হাজীসাহেব বললেন—ফরিদপুরের খবর আজ আইসাছে এই সকালবেলা। খবর ভারী খারাপ।

আমি ভয় পেয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি বলছেন হাজী সাহেব? সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম—আমাকে কিছু কইত্যাছেন নাকি?

হাজী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—না কইয়া আর উপায় নাই ডেভিড সাহেব। হাজী আব্বাসের জিন্দগীতে এমন কথা কখনও কইতে হয় নাই হে ডেভিড। তোমারে ঘরখানা ভাড়া দিবার সময় নিজে থিক্যা ডাইকা আইনা বইলাছিলাম—ভয়ডর কিছু কইরো না ভাই, তুমি এই ঘরে থাক। তোমার পোলাটার অসুখ শক্ত অসুখ—এ নিয়া পথে বেরাইলে বিপদ হবে। হাজী আব্বাস লোকজনেরে ডাইকা ঠাঁই দিয়া কখুনও কারে কয় নাই আর তোমারে ঠাঁই দিতে পারছি না।

আমি হাজীসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম—তাকিয়েই রইলাম। তিনি যে সঠিক কি বলছেন বুঝতে পারছিলাম না।

হাজীসাহেব এবার বললেন—খবর খারাপ ডেভিড সাহেব, রাজবাড়ী থেক্যা আমাদের লোক আইস্যাছে, খান পল্টন ফরিদপুর থেক্যা রাজবাড়ীর কাছ বরাবর আইসা গেছে। সঙ্গে আছে মিলওয়ালা জাফরউল্লা পাঞ্জাবী খানদরের বাচ্চা। রাজবাড়ীর শহরে আগুন কইরা সব অঞ্চলটাকে দোজখ বানাইয়া দিছে। মুসলিম লীগের দালালগুলান—যারা এতদিন ভয়েডরে চুপ কইরা ছিল, শামুকের মতন খোলার মধ্যি নিজেরে গুটাইয়া লুকাইয়া মরার মত পড়্যা ছিল, তারা ইবার হুঙ বার কইরছে।

তারপরই ঘাড় নেড়ে বলেছেন—না, আবুতাহের শামুক নয়, কেঁচো নয়, বিছে-কাঁকড়াও নয় ডেভিড সাহেব—সে সাপ।

দিনের আলোয় মানুষের সাড়ায় বুড়ো কেউটে খরিসের মত গর্তের মধ্যে এই লোকটা চুপ মেরে শুটিয়ে পড়েছিল। মানুষের হাঁক ডাকে সাড়ায় সে গর্জাতেও সাহস করেনি। এবার রাত্রি নেমে এসেছে। এবার সে বেরিয়ে এসেছে গর্ত থেকে। এখন ফণা তুলে গর্জাতে শুরু করেছে। রাজবাড়ী কালুখালি পাংশা অঞ্চলে সে এক মস্ত নামের ফর্দ তৈরী করেছে। যারা নাকি আওয়ামী লীগের লোক। সেই ফর্দ অনুযায়ী এই অঞ্চলটায় খান সিপাহীরা তাদের ট্রাকে চড়ে জীপে চড়ে নদীতে লঞ্চে চেপে এসে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে নেমে তাদের উৎখাত ক'রে দিয়ে যাবে। সে যা করছে, সে নাকি বড় ভয়ঙ্কর, বড় নিষ্ঠুর।

আমি বললাম—আমি দেখেছি। ঢাকায় প্রথম রাত্রি প্রথম দিন একটা অন্ধকূপে গর্তের মধ্যে ভয়ার্ত জন্তুর মত লুকিয়ে থেকে চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখেছি। গলা থেকে একটা ভয়ার্ত চীৎকারও বের হয়নি। ভয়ে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।

হাজী বললেন—না, তার থিক্যাও গাঁয়ে তাদের জালিমি আরও ভয়ঙ্কর ডেভিড সাহেব।

গাঁয়ের বাড়িঘর তো টিনে-ছাওয়া ঘর; কারুর বা খড়-ছনের চাল। গোলা মেরে ভাঙতে হয় না। মিলিটারি ট্রাক গ্রামে এসে ঢোকে—সাধারণ গরীব মানুষেরা তাদের ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকে। আমাদের মত যারা লড়াই দেবার জন্তে কসম খেয়েছে—আল্লার নাম নিয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা হয়তো সরে যায়। আড়ালে যায়। আর যারা বেইমান, যারা সাপ, যারা শয়তান তারা পাকিস্তানী ঝাণ্ডা উড়িয়ে বেরিয়ে গিয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ আওয়াজ তুলে খান সিপাহীদের সালাম বাজিয়ে নামতে বলে। সিপাহীদের সব প্রথমে দেখিয়ে দেয় তারা বাংলাদেশের তরফের লোকেদের বাড়ি, তারপর আরম্ভ হয় শয়তানী খেল। লুঠ করে যথাসর্বস্ব—ঘরে টেনে বের করে আনে মেয়েছেলে বালবাচ্চা কানাখোঁড়া বুড়োবুড়ী সব।

—তারপর?

—হায় আল্লা—হায় খোদা। কি বলব তোমাকে ডেভিড সাহেব, মা-বাপের সামনে বেটীর উপর, স্বামীর সামনে স্ত্রীর উপর, ছেলের সামনে মায়ের উপর সে অত্যাচার—

—চাকাতে এ-ও চোখে দেখেছি হাজীসাহেব।

—দেখেছ? দেখবে বৈকি ডেভিড, শয়তানের শয়তানীর রকম হয়তো অনেক রকম, কিন্তু সেই অনেক রকমই তো সর্বত্র ঘটবে—সেই অনেক রকমই যে তার জুলুম, জালিমিরই একরকম। যাবার সময় ঘরগুলো আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। রেখে যাচ্ছে এক-একটা সিপাহীরা থানা। আমাদের এ চাকলাটায় থানা বসেছে রাজবাড়ীতে। রাজবাড়ীর লাগোয়া জাফর রাইস মিলে হবে তার আসল হেড-কোয়ার্টার। শয়তান জাফর খাঁ ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ফরিদপুর। শুনেছি সে ফিরে এসেছে সিপাহীদের সঙ্গে। জাফর খাঁয়ের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া পুরনো ঝগড়া। সে এবার আমাদের উপর শোধ নেবে, ছাড়বে না।

হাজীসাহেব সবশেষে বললেন—তোমাকে আমি ডেকে আশ্রয় দিয়েছি। তোমাকেই

সব থেকে আগে বলতে এসেছি ডেভিড সাহেব—তুমি তাই ভেবে ঠিক করে নাও কি করবে।

আমি ভাবছিলাম—কি করব ?

হাজীই বললেন—পালাতে চাও তো এখনও সময় আছে, তোমরা চলে যাও।

জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় পালাব ?

—কোথায় পালাবে ? দেখ, তুমি ক্রীশ্চান –তুমি আধা সাদা মানুষ। তোমার তো কোন ভয়ের কথা নয়। তুমি নিজের পরিচয় দিলেই তোমাকে ছেড়ে দেবে। বড় জোর ধরে রাখবে কি টাকা-টাকা কোথাও পাঠিয়ে দেবে। মারতে তোমাকে পারে না এমন বলছি না। দুনিয়াতে মানুষ যখন জানোয়ার হয়ে হাতিয়ারের দাঁত-নখ নিয়ে খুনখারাপী খেলায় মাতে তখন কোন কানুনের ধার সে ধারে না। তবু তোমার একটা খুঁটি আছে ধরে দাঁড়াবার। তবে ওই কালো মেয়েটাকে তোমার সঙ্গে দেখলে—তোমারও বাঁচোয়া থাকবে না, ওরও না। তুমি ক্রীশ্চান ও মুসলমান—এইটাই হবে বড় গুনাহ্। প্রমাণও নেবে না তোমার সঙ্গে ওর কি সম্বন্ধ—তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে—তারপর—

সমস্ত দীনদুনিয়া যেন চোখের সামনে মুছে যেতে লাগল। মনে হল অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে সব। আমার নিজের জন্তে ঠিক নয়। এই নাজমার জন্তে। নাজমা আমাকে এমন করে জড়িয়ে ধরেছে এই কয়েকটা দিনের মধ্যে যে ওকে ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবলে সারা দেহমন একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা অনুভব করে। সারা বুকটা উদ্বেগে আশঙ্কায় দুঃখে টনটন করে ওঠে।

আমরা ঘরের মধ্যে বসে কথা বলছিলাম। বাইরে দাওয়ার উপর হাজীসাহেবের চারজন লোক বসে আছে। একটা সাইকেল-রিকশা খাড়া আছে, একজন সাইকেল-চড়া ছেলে অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি এদিকে। আবার ভিতর দিকে দাওয়ার উপর বসে নাজমা ভয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—তার সে কান্নাও শুনতে পাচ্ছি।

হাজীসাহেব বললেন—একটা পথ আছে ডেভিড সাহেব—

বললাম—বলুন—

উনি বললেন—আমরা আমাদের মেয়েছেলেদের সরিয়ে দেব এখান থেকে। কেবল পুরুষেরা থাকব—আমরা লড়াই দেব। মরতে আমাদের অনেককে হবে। মরব। তুমি চাও তো তুমি আমাদের সঙ্গে থেকে লড়াই কর। নাজমাকে আমাদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পার—ও তাদের সঙ্গে থাকবে।

আমি বলেছিলাম—আমি একবার ওকে জিজ্ঞাসা করি।

হাজী বলেছিলেন—শোন, আমাদের এই যে শেখ বংশ, এদের গোড়াকার কথাটা বলি শোন। নাজমাকে বলো। আমাদের বাড়ি বহুকাল ধরে মুর্শিদাবাদের উত্তরে—লালগোলা ভগবানগোলার ওদিকে। তখনও আমরা শেখ নই। আমরা—যতদূর জানি ডেভিড, আমরা তখন কায়স্থ ছিলাম জাতে। মস্তবড় গৃহস্থ। তখন মুর্শিদাবাদে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সুবাদার। আমার সাত-আট পুরুষ আগে—আমার পূর্বপুরুষেরা তখন দুই

ভাই। বড় ভাই নবাব দরবারে মোক্তারি করত। দেশের জমিদার রাজাদের কাজ করত মোক্তার উকিলেরা, এ হল তাই। নবাব দরবারের উজীরনাজির পেশকার থেকে কানুনগো-আমীন-গোমস্তাদের সঙ্গে আলাপ রাখত। তাদের টাকাকড়ি দিয়ে কাজ উদ্ধার করে নিত। নিজেরা জমিদারদের কাছে কাজ হিসেবে ঠিকে করে কাজ নিত। সেই টাকার কিছু দিত নবাবী আমলাফয়লাদের—কিছু দিত জমিদারদের কর্মচারীদের—আর বাকিটা থাকত তার নিজের। রোজগার তার ভালই ছিল, দেশেও খাতির ছিল; ফোঁটা তিলক কাটত, মালাজপ করত। আর শুনি—কোন্ লোকের কোন্ ভাল জমিটি নিতে হবে ফাঁকি দিয়ে—সেই কথা ভাবত মালা জপতে জপতে।

ছোট ভাই ছিল আলাদা রকমের মানুষ। বাবরি চুল ছিল—লম্বা-চওড়া পুরুষ পুরুষ ছিল—ধর্মেকর্মে মতি ছিল না, লেখাপড়াও ভাল শেখেনি, শখ ছিল লাঠি তলোয়ার খেলায়—কুস্তিতে সাঁতারে। সব থেকে বেশী শখ ছিল সাঁতারে আর নৌকো ছিপ নিয়ে বাইচ খেলায়। নিজের নৌকো ছিল ছিপ ছিল। আর শখ ছিল চাষের বলদে—ঘোড়ায়—আর দুধালো উঁইযায়।

মেলামেশাতেও রুচি ছিল আলাদা।

মেলামেশা ছিল এক নৌকোওয়ালা সর্দারের সঙ্গে। কাছেই ছিল নৌকোওয়ালা মাল্লাদের একখানা গাঁও। এরা রাজমহল থেকে ভগবানগোলা লালগোলা মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত নৌকো বাইত। ভাড়া খাটত। এরা খুব দুর্ধর্ষ। নৌকো বাইচ নিয়ে এদের সর্দারের সঙ্গে আলাপ ছিল খুব জমাট। এরা চাষীও ছিল খুব ভালো। তবে ধর্মে ছিল এরা মুসলমান। ছোট ভাই এদের সর্দারের সঙ্গে ঢোলক কাঁসী বাজিয়ে গানের আসর বসাতো নৌকোয় আর গাঙের বুকে ঘুরত। লোকে মন্দ বলত কিন্তু যে শোনে না শুনবে না তাকে শোনায় কে? বড় ভাইয়ের সঙ্গে ভাত আলাদা—ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী—তার কথা বলবারই বা এখতিয়ার কি? বড় ভাই ভয়ও করত ছোটকে। তার উপর সোনার সঙ্গে সোহাগার পানের মত তার পরিবারটিও ছিল ওই আশ্চর্য মেজাজের। ছেলেপুলের মা। ধর্ম-অধর্ম মানত না। স্বামীর কথাই ছিল কোরান-হদিস।

এই সর্দার নৌকোওলা হঠাৎ মারা গেল। গাঙের দহেই ডুব দিয়েছিল কি একটা পড়ে-যাওয়া জিনিস তুলতে, উঠবার সময় বড় একটা মাছের চুঁ লেগেছিল বুকে। তাইতেই মারা যায়। মরবার সময় একবার জ্ঞান হয়েছিল—সেই সময় বলেছিল—আমার শেরিনা বেটিকে তুমি দেখো।

শেরিনা সর্দারের একমাত্র বেটি। মা-মরা মেয়ে। আরও দুটো বিবি তার ছিল—কিন্তু তাদের পোলাপান কেউ ছিল না। এই শেরিনাকে নিয়ে দুই বিবি চেষ্টা করছিল আপনাপন বাপের গোষ্ঠীর কারুর সঙ্গে বিয়ে দিতে। তারা যাই হোক, সর্দার তাদের 'পছন্দ' করত না। তারে নিয়ে যখন দুই বিবি আর গাঁয়ের লোক ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে—তখন এই কায়স্থবাবু একদিন এসে শেরিনাকে নিয়ে চলে গেল নিজের বাড়ি। একটা দাদা হয়ে

গিয়েছিল—দাদার লাশ ফেলে দিয়েছিল আমার পূর্বপুরুষ। এদিকে সর্দারের গ্রামে রটল—শেরিনাকে লুঠ করে নিয়ে গেছে রক্ষিতা করে রাখবে। ওদিকে তার নিজের গ্রামে লোকেরা, কথাটা লুফে নিয়ে বললে—তোমার জাত গেল।

কথাটা লুফে ধরে নিয়েছিল সেই মোক্তারসাহেব—কোঁটা-তিলকধারী বড় দাদা।

ছোট কত্তা বললে—কুছ পরোয়া নেহি বাবা। যো হি আল্লা ও হি ভগবান। যো সত্যনারায়ণ ও হি সত্যপীর। ধরম মানুষের এক—দিলকো সাচ্চা রাখনা। রাম রহিম না জুদা করো ভাই দিলকো সাচ্চা রাখো জী। সর্দার ছিল দোস্ত, ওর বেটি আমারও বেটির মত। আমার দিল ঝুটা নেহি। সাচ্চা আদমী আমি। ওকে রক্ষিতা রাখব আমি? আরো বাবা রাম কহো—লা-ইলাহি-ইল্লালা। দুনিয়ার বেইমানদের তুমি সাজা দিয়ো।

বলে সে চলে এসেছিল গ্রাম থেকে। ভগবানগোলায় ছিল ওর একটা চাষবাড়ি। সেইখানে বাস করছিল—মুসলমানও হয়ে গিয়েছিল।

সর্দারের মেয়ের সাদী দিয়েছিল—খুব ভাল পাত্রে খুব ভাল ঘরে।

ডেভিড সাহেব—এই যে মাল্লা সর্দারের বেটি—যার ভার নিয়ে আমার পূর্বপুরুষ জাত দিয়েছিল এই মাল্লা সর্দারকে, নিজের জাত দিয়েছে তবু তাকে ফেলে দেয়নি।

* * *

হাজীসাহেবের এই কাহিনী আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম।

হাজীসাহেব বললেন—নাজমা বেটিকে তুমি আমার বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে দিতে পার। আব্বাস হাজী যে বংশের ছেলে—সে বংশে জাত আর বাত এক কথা।

বলেই হাজীসাহেব উঠলেন। বেরিয়ে চলে গেলেন।

আমি নাজমাকে বললাম—নাজমা, হাজীসাহেব ভাল কথা বলেছেন—তুমি ওঁদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে যাও।

নাজমা আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে হা-হা করে কেঁদে উঠল। বললে—না-না-না বড় ভাই, তাইলে আমি মরে যাব মরে যাব। তার ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার সে কান্নার আর যেন শেষ ছিল না। বাইরে চারিদিকে শোরগোল উঠেছে। বাইসিক্লে চড়ে লোকজন প্রচণ্ডবেগে ছুটেছে। বাইসিক্লের ঘণ্টার মধ্যে একটা আশ্চর্য ব্যস্ততা এবং আতঙ্ক যেন ফুটে উঠছে।

নাজমার সামনে আমি নির্বাক হয়ে বসে ভাবছিলাম—কি হবে? কি করব?

কতক্ষণ পর তা ঠিক জানি না। তবে অনেকক্ষণ পর। হঠাৎ আবার হাজী সাহেবের গলা শুনলাম।—ডেভিড। ডেভিড।

বেরিয়ে এলাম।—কি বলছেন?

—কি বলব? কি ঠিক করলে? এদিকে দু'পহর গড়িয়ে গেছে। ভাবছি রাত্রির কথা। রাত্রিতে যদি শয়তানের সিপাহীরা আসে তা হলে মহা বিপদ হবে। ঘুমিয়ে থাকবে

মানুষ, বাঁচবার জন্তে উঠে দাঁড়াবার সময় পাবে না, কিছু কিছু লোক সন্ধ্যের আগেই বেরিয়ে যাবে গ্রাম থেকে বাজার থেকে। আমাদের মেয়েদের পাঠাব রাত একপ্রহর হলেই। নাজমা যাবে? বল?

—আমি বললাম—নাজমা যাবে না হাজীসাহেব। ও কেবলই বলছে—ও মরে যাবে—ও মরে যাবে। আমাকে ছেড়ে ও যাবে না।

—কিন্তু করবে কি?

—ভাবছি—

—ভাববার সময় খুব নেই ডেভিড। আজ রাত্রি কিংবা কাল বেলা একপ্রহর পর্যন্ত এখানে এসে পড়বে খান সিপাহীরা, সে খবর আমি পেয়েছি—তাতে কোন ভুল নেই। আর আমার উপর তাদের কঠিন আক্রোশ। লীগওয়ালা আবু তাহের—সে আমার জ্ঞাতি, জ্ঞাতির চেয়ে বড় দুশমন কেউ হতে পারে না ডেভিড।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন আবার—আবু তাহের আসবে, তার সঙ্গে আসবে সেই পাঞ্জাবী মিলওয়ালা জাফর। সে যে কি ভীষণ না দেখলে কেউ বোঝাতে পারবে না না মুখের কথায়।

একটু থেমে থেকে আবার বললেন—আমাদের মেয়েদের দলের সঙ্গে তোমাকে যেতে দিতে কেউ মত করবে না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আছে ডেভিড।

বলেই বললেন—ভাল মনে পড়েছে। তুমি নাজমাকে নিয়ে বিপদে পড়বে। গ্রাম অঞ্চলে তোমার ওই চোখ ওই গায়ের রং দেখে পাঞ্জাবী মনে করবে। খান সিপাহীরা এই কালো মেয়েকে দেখে ওকে হয়তো—

—ওকে বাঁচানো মুশকিল হবে ডেভিড। এদেশের মেয়েদের উপর এদের যত লালসা তত ঘেন্না। তুমি শুনেছ রেডিয়োতে—চট্টগ্রামে একজন খান সিপাহীদের কর্নেল সাহেব কি বলেছে? একজন ইউরোপীয়ানকে বলেছে—এদেশটার এই বিপ্লব দমনের নামে পুরুষগুলোকে মেরে ফেলা হবে—তখনই হবে সুখের জিন্দগী। এদেশের বেওয়া ছোকরীদের আমরা বাঁদী করে রাখব। আমাদের উপপত্নী হবে এরা।—একটু জল আন তো ডেভিড। একটু জল।

মুখে চোখে মাথায় জল দিলেন হাজীসাহেব। তারপর বললেন—শোন ডেভিড, আজই মৌলভী সাহেবকে ডেকে নাজমার সঙ্গে তোমার সাদী একটা দিয়ে দিতে চাই। না-হলে তুমি নাজমাকে বাঁচাতে পারবে না। বেটি বললে কেড়ে নেবে—বোন বললেও নেবে, হয়তো মা বললেও নেবে। এক তোমার স্ত্রী বলে তুমি ওকে বুকে জাপ্টে ধরে রাখতে পারবে।

* * * *

হাজীসাহেব আশ্চর্য মানুষ। সেইদিনই মৌলবী ডাকিয়ে আমার কলমা পড়িয়ে নাজমার সঙ্গে আমার বিয়ের কাজ সেরে দিতে চেয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, তোমাকে আমাদের দলের সঙ্গে পাঠাতে পারছি না—এটাতে আমার দুঃখের শেষ নেই। কিন্তু কি

করব ?

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

তখন রাত্রি হয়েছে ; গ্রাম থেকে সরে যাওয়ার পালা শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের চারিপাশে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে আওয়ামী লীগের ছেলেরা পাহারা দিচ্ছে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা গেঞ্জি, কোমরে গামছা বাঁধা—হাতে বল্লম বা শড়কী বা লাঠি। কারুর কোমরে দা-ও গোঁজা।

শুনলাম এ পাহারা চলে গেছে মাঠের মধ্য দিয়ে বড় রাস্তার ধার পর্যন্ত ; এদিকে নদীর ঘাট পর্যন্ত। খান সিপাহীদের কোন সন্ধান পেলেই—বাঁশীর ইশারা ছুটে আসবে বাতাসে বাতাসে গ্রাম পর্যন্ত। গ্রামের মধ্যে যারা সন্দেহভাজন তাদের বাড়ির চারিদিকে পাহারা পড়ছে। তারা যেন বের হাতে না পারে। নিরাপদ যেদিকটা -সেদিক দিয়ে গরুর গাড়ি চলছে দু-চারখানা—অধিকাংশই চলেছে পায়ে হেঁটে। কোমরে মাথায় বোঁচকা পুঁটলি নিয়ে চলছে মেয়েরা—পুরুষেরা কাঁধে বাঁক বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কতকগুলো সাইকেলরিকশা যাচ্ছে আর আসছে খানিকটা দূর অবধি রাস্তায় লোকজনদের নিয়ে—মাঠের পায়েহাঁটা পথের মুখে নামিয়ে দিয়ে আসছে।

হাজীসাহেব বসে আছেন নিজের দাওয়াতে। সামনে লম্বা বাঁশটার মাথায় তখনও আওয়ামী লীগের বাংলাদেশের ঝাণ্ডা উড়ছে। হাজীসাহেবের পাশে বসে আছে মেজ ছেলে আমানুল্লা। এই সন্ধ্যেতে এসে পৌঁচেছে রাজশাহী থেকে। রাজশাহী কলেজ-ইস্কুল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রায়। যা ঢাকায় ঘটেছে—তাই ঘটেছে এখানেও। কলেজে পড়ত হাজীসাহেবের ছেলে ইরফান—সে নেই। গুলি খেয়ে মারা গিয়েছে। বড় ছেলে আসানুল্লা—উকীল এবং আওয়ামী লীগের সভ্য হিসেবে এবার নির্বাচনে জিতেছে তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে—কিন্তু বেঁচে আছে কি নেই তার কোন স্থিরতা নেই। মেজ ছেলে আমানুল্লা ইস্কুলমাস্টারী করত, সে কোনরকমে পালিয়ে এসেছে। নৌকোয়—পায়ে হেঁটে—খানিকটা বাসে—কোনরকমে এই সন্ধ্যেতে এসে পৌঁচেছে।

সে বলছিল—হাজীসাহেব শুনছিলেন।

—রাজশাহীর ই পি আর-এর সিপাইরা নিজের বন্দুক নিয়ে পালিয়ে বাংলাদেশের খাতায় নাম লিখিয়েছে। একজন বড় পুলিস অফিসারকে গুলি করে মেরেছে পাক সিপাইরা।

হাজীসাহেব বললেন—ইরফান গুলি খেয়ে মরল—মরণের সময় কেউ তোরা কাছে ছিলি ?

আমানুল্লা কথা বলতে পারলে না।

হাজী বললেন—না। দুখ আমার নেই। আমি মুসলমান—খোদার নাম নিয়া সব দিব বলে—বাঙালী আমি, বাংলাদেশের জন্তে লড়াইয়ে নেমেছি—সব দিব বলেছি। দুখ আমার নেই। আটপুরুষ আগে আমরা হিন্দু ছিলাম—ভাইদের তগ্‌গদের দুশমনিতে জাত হারাইয়াছিলাম। পুড়িত করেছিল। আমরা দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম, এসেছিলাম

ভগবানগোলায়। পলাশীতে যে লড়াইয়ে নবাব সিরাজুদ্দৌলার হার হল—সে লড়াইয়ে সিপাহসালার মীরজাফর বেইমানি করে লড়াই বন্ধ করে কোম্পানিকে জিতিয়ে দিলে—নবাবী সিপাহীরা গুলি খেয়ে মরল গোলা খেয়ে মরল। তাতে মোহনলাল মীরমদন মরেছিল—তার সঙ্গে আমাদের বংশের শেখ মনজুর হোসেন সাহেব জান দিয়েছিলেন; তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর বিশবছর বয়সের নওজোয়ান ছেলে মমতাজ হোসেন। সেও মরেছিল। ছেলে যখন মরে—তখন পাশে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাপ তলোয়ার হাতে লড়ছে এক ফিরিঙ্গীর সঙ্গে। ছেলে তাকে ডেকে বলেছিল—বাপজান—আমি যাচ্ছি।

বাপ বলেছিল—বেহেস্তে যাবে। ভয় করো না।

বলতে বলতে একটা গুলি এসে বিঁধেছিল তার বুকে।

আমি ভাবছিলাম আমি এবার উঠব। উঠব এবং রওনা হব, রওনা হব কোন নিরুদ্দেশ উদ্দেশে। বনে-জঙ্গলে কিংবা কোনো নদীর চরে, ময়মনসিং জেলার ওদিকে গেলে পাহাড় আছে, বরিশাল-খুলনার দিকে গেলে সুন্দরবন আছে। সেইখানে কোন নির্জনে এই নাজমা মেয়েটাকে একটা কুটীর গড়ে দিয়ে বলব—তোর চান্দাকে নিয়ে তুই এখানেই থাক নাজমা; আল্লা তোকে তোর ছাওয়ালকে দয়া করুন। তুই যখন বলবি বড়ভাই তুমি এবার যাও, তখন আমি চলে যাব।

ডেভিড আর্মস্ট্রং ভারতীয় পুলিস অফিসারটির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভেবে নিলে। তারপর বললে—

সে-রাত্রির অন্ধকার সে এক আশ্চর্য অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে! সে-অন্ধকার যেন সাধারণ রাত্রির অন্ধকার নয়, সে অন্ধকার সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে নেমেছে আবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে কেটে যাবে—শেষ হবে। মনে হচ্ছিল এ অন্ধকার যেন কোনদিন পোয়াবে না।

আধাগ্রাম আধাশহরটা সেই অন্ধকারে ভয়ে যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল— আতঙ্কে যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারই মধ্যে—লাঠি শড়কী রামদাও কয়েকটা—তা বোধহয় পনেরটা হবে, বন্দুক নিয়ে একদল অল্পবয়সী জওয়ান ঘোরাফেরা করছে—পাহারা দিচ্ছে। বাকী লোকেরা ভয়-পাওয়া লোক। তারা গায়ে ঘেঁষে এ ওর কাপড় কি হাত ধরে চলেছে নিঃশব্দে। রাত্রিটা ছিল অন্ধকার, আকাশে ছিল মেঘ। আলো জ্বালা ছিল বারণ। ওই অন্ধকারের মধ্যে দল বেঁধে মানুষজনদের নিঃশব্দ চলার সেই কালো কালো চলন্ত ছবিগুলি কেমন যেন মনকে ভয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

মসজিদের সামনে চাতালে হাজীসাহেব বসেছিলেন। তাঁরই কাছে আমি বসেছিলাম। নাজমাও ছিল তার ছেলেকে নিয়ে। হাজীসাহেব চেয়েছিলেন আমার সঙ্গে নাজমার একটা বিয়ে গোছের কিছু ঘটিয়ে দিতে। নাজমা শুনে আমার দিকে বোবার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছিল। বুকে চেপে ধরেছিল তার বাচ্চাটাকে—চাঁদকে। আমি লজ্জিত হয়েছিলাম। ঠিক এইটে যেন সে বরদাস্ত করতে পারছিল না। হাজীসাহেবকে বলেছিলাম—হাজীসাহেব; আপনি আমার কাছে হজরত-তুল্য লোক। আপনি আমাকে ওই হুকুম

করবেন না। নাজমা আমার কাছে নাজমা। বহেন বলেন বহেন, বেটি বলেন বেটি, মা বলেন মা—যা বলেন তাই। ওকে ওর ছেলেকে কোন নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আমি খালাস হব।

হাজী বলেছিলেন—আমি তোমার বাপের বয়সী কি তার থেকেও বড় ডেভিড। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি। তোমার ভালো হোক বেটা। তবে তোমার নসীব আর খোদার মর্জি।

নাজমা সেই তখন থেকেই এসে বসে আছে আমারই ঠিক পিছনে আমার জামার খুঁট ধরে। চাঁদ তার কোলে ঘুমুচ্ছে। সে চুলছে।

হাজীসাহেব এরই মধ্যে বলছিলেন—কোন্ কালের গল্প। কলেজে পড়া ছেলে ইরফান গুলি খেয়ে মারা গেছে, বড় ছেলে রাজশাহীর উকীল আসানুল্লা—সে ধরা পড়েছে। পাকিস্তানী খান সিপাহীর দল তাকে অ্যারেস্ট করেছে, তাকে ধরিয়ে দিয়েছে জমায়েৎ-ইসলামের কে এক আখতার হোসেন। কথা শুনেই হাজী বললেন—আমি মুসলমান—খোদার নাম নিয়া সব দিব বলে লড়াইয়ে নেমেছি। দুখ আমি করব না।

বলতে বলতে মনে পড়েছিল তাঁর বংশের পুরনো কথা। এমন মনে পড়ে। অতীত গৌরব তো ভোলা যায় না। মনে পড়েছিল—সেই দুশো চব্বিশ বছর আগের পলাশীর যুদ্ধে তাঁর পূর্বপুরুষ মনজুর হোসেন আর তাঁর ছেলে মমতাজ হোসেনের প্রাণ দেওয়ার কথা। লড়েছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার তরফে। দ্বিতীয় ছেলে আসানুল্লা সে বাপের কাছে বসেছিল, অনেকটা কেমন যেন পাথর-হয়ে-যাওয়া ঠিক নয়, পাথর হয়ে যাচ্ছে এমন মানুষের মত। মানুষটা কাঠ হয়ে বসেছিল—শুধু ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল বলেই একেবারে পাথর হয়ে গেছে বলছি না।

আসানুল্লা বাপকে বাধা দিয়ে বললে—বাবা!

হাজীসাহেব বললেন—কি?

আসানুল্লা বললে—ওসব কথা থাক্ বাবা।

—কেন রে? শুনে মনে জোর পাস না? কর্তাদের কথা?

আসানুল্লা বলে উঠল—রাজশাহীর জামাতে ইসলামের পাণ্ডাও তো শুনি আমাদের চাচাটাচা কি হন। আখতার হোসেন সাহেব।

—চাচা হয় আসানুল্লা—, আখতার আমার ভাই—আখতারের দাদো আর আমার দাদো এক বাপের ছাওয়াল—মা ভিন্ন। আমার দাদোর মা এদেশের বেটি। আর আখতারের দাদোর মা হল আগ্রা শহরের এক পড়ন্ত খান সাহেবের বেটি। ফরক তো খুব বেশী নয়; আমার দাদো আর আখতারের দাদো একসঙ্গে এক উঠানে খেলা করত। তফাত আখতারের সঙ্গে আমার দু'পুরুষের।

—সেই আখতার হোসেন সাহেবই দাদাকে ধরিয়ে দিয়েছে। রাজশাহী প্রথমেই এসেছিল আমাদের কাবেজে। তখন আমাদের একদল, আমরা বলেছিলাম—লীগ আর

জাবাতে ইসলামের দুশমনদের খতম করে দাও। ওদের রেখো না। কেউ শুনলে না আমাদের কথা। সবাই ভাবলে—ইয়াহিয়া টিক্কা খাঁ ক'দিনের মধ্যে ভেকে মিটমাট করবে। এখন। এখানে আপনারা তাহের মিয়াকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাহের মিয়া আপনাদের বাঁচতে দেবে না।

হাজী বললেন—ইরফান গুলি খেয়েছে। আসানুল্লাকে গ্রেপ্তার করে প্রাণে রেখেছে, না—বল আমিন ঠিক ক'রে বল। আমার মনে লাগে কথাটা তুই বলতে পারছিস না।

চীৎকার করে উঠল আমানুল্লা—হাঁ—হাঁ—হাঁ—তুমি যারে ভাই কও। বল আমাদের চাচা হয়—সেই তারে মারাইছে। চোখে দেখেছে যে লোক সেই আমারে বলে গেছে।

—আসান নাই?

—না। নাই। বন্দুকের গুলি মেরে শেষ হয় নাই, বেয়নেট দিয়া খুঁচ্যা খুঁচ্যা মারছে। বড়দাদা নাই।

—চুপ দে আমিন। অরে তদের মা অখনই শুনবে। শুনলি পর সি কাঁদলে—কালুখালির ঘাটমাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে রে। চুপ দে বাপ। চুপ দে।

Mr. Officer—জীবনে এত বড় দুঃখ আর এমন জগৎ-জোড়া থমথমে অন্ধকার আমি দেখিনি। এর আগেও বটে এর পরেও বটে একলা রাত্রি জেগে বসে থেকেছি। আমার স্ত্রী ছায়ার মৃত্যুর পর দু'বছর প্রায় সে উদাসী বিবাগী হয়ে ঘুরেছি। পায়ে হেঁটে নৌকোয় তখন কত রাত্রি একলা জেগে বসে কাটিয়েছি, এরপরও এই ক'দিনের মধ্যে নাজমাকে নিয়ে গাছতলায় পথের ধারে কোন গ্রামের মসজিদের চাতালে—কোন ভাঙা পোড়াবাড়িতে কোন ইস্কুলঘরের দাওয়ায় কাটিয়েছি রাত্রি। নাজমা ঘুমিয়েছে আমি জেগে থেকেছি। আকাশে মেঘ উঠেছে, বিদ্যুৎ চমকেছে, বাতাস দিয়েছে, আমি বসে কাটিয়েছি। কিন্তু মনে বুকে এত দুঃখ কখনও অনুভব করিনি—রাত্রিকে এত দীর্ঘ কোনদিন মনে হয়নি।

হাজীসাহেব আমাকে বলেছিলেন—ভোরবেলা তোমাকে আমি পথ ধরিয়ে দেব। তুমি ঘুমিয়ে নাও।

কিন্তু ঘুম আমার আসেনি। দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে থেকে তখন অন্ধকারের মধ্যেও চোখে বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখছিলাম ওই বৃদ্ধকে। বৃদ্ধ প্রায় আপনমনেই কথা বলে যাচ্ছিলেন। বলছিলেন অবশ্য আমানুল্লাকে। কিছুক্ষণ পর পর ইরসাদ ইকবালও এসে বসেছিল। আর ছিলাম আমি আর নাজমা। নাজমা ঘুমোচ্ছিল।

হাজী বলছিলেন—আখতার ধরিয়ে দিয়েছে আসানকে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গুলি করিয়েছে বলছিস—তা বোধহয় ওর তাই করারই কথা রে। সেই দাদোদের আমল থেকে এই আক্রোশ। আমাদের দাদোর বাবার নাম মহম্মদ ওসমান সাহেব। আমার দাদোর মাকে সাদী করেছিলেন—তিনি ছিলেন এই দেশের মেয়ে, মস্ত বড় জোতদার ছিলেন

যেন অনেক কয়েক মিনিট দীর্ঘ মনে হল। তবুও তাকে প্রশ্ন কেউ করলেন না—তারপর ?

জজসাহেবও স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন—তাঁর হাতে পেনসিল ছিল একটা, অকস্মাৎ সেটা হাত থেকে খসে টেবিলের উপর এবং টেবিল থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সেই শব্দে সজাগ হয়ে উঠল ছেলেটি। বললে—হুজুর, একদিন মায়ের বাক্স খুললাম। মায়ের জিনিসপত্র ছিল না কিন্তু ট্রাঙ্ক ছিল তিনটে। যত বাজে ভাঙা ফুটো জিনিস ভর্তি থাকত। একটা বাক্সের দরকার ছিল। বোমা তৈরি করেছিলাম—সেগুলো নিয়ে যাবার জন্যে বড় বাক্সেরই দরকার ছিল। খড় ন্যাকড়া নিচে দিয়ে আরও খড় ন্যাকড়া দিয়ে প্যাক করে তার ওপর খানকতক কাপড় বই দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে। বড় একটা হাঙ্গামা আছে। দলে দলে হাঙ্গামা হুজুর। বাজারে বাক্স কেনার হাঙ্গামা ছিল। তাই বাড়ির বাক্স একটা খালি করে নিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম। আমার মা সে-দিন—।

—সন্ধ্যের পর। মা বাড়ি ছিল না। একটা বাক্স খালি করে ফেললাম। হুজুর, তার মধ্যে পুরনো ছেঁড়া একটা গরম কোট ছিল। কতকগুলো কাগজ ছিল। একটা সিগারেটের কেস ছিল। পুরনো রুমাল ছিল। হুজুর, সব শেষে ছিল—একখানা ফটো। অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

হুজুর, আলোতে ছবিখানা দেখলাম, দেখে আমি চমকে উঠলাম। এ কে ? এ কে ? চেয়ারে বসে ? আর পাশে দাঁড়িয়ে ?

চিনতে পারলাম হুজুর।

মাকে চিনলাম আগে। বিয়ের কনে আমার মা। মাথায় মুকুট গায়ে গয়না পরনে দামী শাড়ি। তারপর চিনতে বাকী রইল না চেয়ারে যে বসে তাকে। সে আমার বাবা প্রণব কুমার চক্রবর্তী। দেখলাম হুজুর—অবিকল আমি।

আমার সব ভুল হয়ে গেল। আমি ভুলে গেলাম আমাকে ট্রাঙ্ক নিয়ে যেতে হবে। আমি ভুলে গেলাম। ছবিটা নিয়েই বসে রইলাম আলোর সামনে। কালীপড়া একটা লণ্ঠন। তারই আলোতে অবাক হয়ে দেখলাম। আমি শুনেছিলাম—দিদিমা মাঝে মাঝে বলত—আমি বাবার মত দেখতে। মা আমাকে দেখে হয় মুখ ফিরিয়ে নিত নয় বিরক্ত হত—তার চিহ্ন ফুটত তার মুখে। আমি এ ছবি কখনও দেখি নি। বাবা যখন মারা যায় তখন আমি এক বছরেরও নই। সেদিন এই ছবি দেখে আমার যে কি হল তা বলতে পারব না। মনে হল আমি যেন রাজা হয়ে গিয়েছি। মনে হল ছবিখানা নিয়ে সারা হাওড়ার পথে পথে দেখিয়ে আসি—চীৎকার করে বলে আসি—দেখ আমার বাবার ছবি দেখ।

দলের লোক ডাকতে এল—তাকে ট্রাঙ্কটা দিয়ে দিলাম—আমি গেলাম না। বললাম—যাব না আজ। আমাকে ডাকিস নে। খুনোখুনি হয়ে যাবে। পালা। সে চলে গেল। আমি ক্যাপার মত ঘরে ঘুরতে লাগলাম। ঠিক এই সময় এল আমার মা।

মাকে আমি রাক্ষুসী বলতাম। বলতাম তার ওপর রাগের জন্যে—যেভাবে সে মারত তার

জন্যে। পরে আর একটা চেহারার জন্যেও বলতাম। সে যে সাজ করে ওই একটা লোকের সঙ্গে বেরিয়ে যেত সপ্তাহে একদিন করে রাত্রে তার জন্যে। সে ঘরে তালা দিয়ে বাইরে যেত। আমার তো ঠিক ছিল না কিছু। আমি ঢুকতাম পাঁচিল টপকে। তারপর ঘরের চাবি খুলে নিতাম—সে চাবি আমার কাছে থাকত। ঘরের তালা খুলে মা ওই সাজে ঢুকতেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে গেল। আমি গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, কোথায় গিয়েছিলি?

মা চমকে উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

আমার রাগ চড়ে চড়ে উঠেছিল—বললাম—বল, আজ তোকে বলতে হবে। কেন তুই যাবি এমনভাবে? তোর লজ্জা নেই তোর হায়া নেই?

মা আমাকে ঠেলা দিয়ে বলেছিল—সরে যা—সরে যা নীলু—আমার মাথায় খুন চড়িয়ে দিস নি।

আমি সরি নি। পথ দিই নি ঘরে ঢুকতে।

মা বলেছিল—নীলু! সর আমি চান করব।

—হুজুর, বাইরে থেকে এসে মা চান করত। সে সেই বোধ হয় গোড়া থেকেই। আমি আজন্ম দেখে আসছি।

আমি বললাম—না। আগে তোকে বলতে হবে কেন তুই আমার বাবার মুখে আমার বংশের মুখে এমন করে কালী মাখিয়ে দিবি? আমার বাবা মরে গিয়েছে সে কি তার—

মা আমার কথায় বাধা দিয়ে বলেছিল—তোর বাবাকে আমি ঘেন্না করি তোদের বংশকে আমি ঘেন্না করি। আর তুই? তোকে পেটে ধরে আমার লজ্জার শেষ নেই। অথণ্ড তোর পরমায়ু—তুই হয়ে হয়েই মরিস নি।

আমি ঠাস করে এবার মায়ের মুখের উপর চড় কষিয়ে দিয়েছিলাম; শুধু চড় মারাই নয় হুজুর; ছেলেবেলা থেকে মায়ের উপর অহরহ রাগ করে থেকে থেকে মেজাজ আমার রাবণের চিতার মত জ্বলে—আমার বাবাকে আমার বংশকে গাল দেওয়া আমার সহ্য হয় নি। শুধু চড়ই মারি নি খারাপ কথা বলে গালও দিয়েছিলাম।

মা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। হুজুর, মায়ের সঙ্গে সমানে মারপিট করেছি—মা মারলে আমিও মেরেছি—হাতে কামড়ে দিয়েছি, ঢেলা ছুঁড়েও মেরেছি কিন্তু এমনভাবে কখনও গালে চড় মারি নি।

কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে আমার মুখের দিকে সাপের মত তাকিয়েছিল মা। আমি মনে করেছিলাম মা ভয় পেয়েছে—মা এবার বলবে—আর করব না। আমি ভাবছিলাম ওকে গলা টিপে মেরে ফেললে কি হয়!

অনায়াসে তখন আমি খুন করতে পারতাম। আমিই মায়ের হাত ধরে তাকে ঘরে টেনে এনে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম—তারপর বলেছিলাম, বল কেন তোর পাপে আমার চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে? বল?

মা বলেছিল—আমি যেদিন মরব সেদিন তোকে ডেকে সব বলে যাব। আর তুই যদি

ময়িস তবে—

আমি তখন মরীয়া। আমার হাতের কাছেই পড়েছিল একখানা কানাভাঙা রেকাবি সেই-খানা তুলে নিয়ে মায়ের কপালে মারলাম—ভাবলাম না কি হবে! রেকাবির ধারটা কপালে খপ্ করে বসে গেল। বললাম—সীতা সাবিত্রী আমার—হারামজাদী—কুত্তার বেটী কুত্তি—

কথা আমার শেষ হল না—শেষ করতে পারলাম না আমি—মায়ের কপাল থেকে গলগল করে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে মুখখানাকে ভয়ংকর করে তুললে। আমি বোবা হয়ে গেলাম। চেয়ে রইলাম মুখের দিকে।

মা বাঁ হাত দিয়ে সেই রক্ত নেড়ে আঙুলে মেখে চোখের সামনে ধরে দেখে আস্তে আস্তে বললে—রামের মত স্বামী পেলে আমিও সীতা হতে পারতাম নীলু। তোর বাপ রাম ছিল না রে! রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল—রাম সমুদ্র বন্ধন করে রাবণকে বধ করে তারপর সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিয়েছিল। তোর বাবা রাম ছিল না—আমাকে কুত্তার বেটী বললি—আমার বাবা কুত্তার চেয়েও অধম জীব ছিল। অর্থের জন্যে বড়লোক লম্পটের পা চেটেছে—তাদের কাছে স্ত্রী কন্যা বিক্রি করেছে। আমাকে যখন বিক্রি করলে আমার হাতে নগদ দু'হাজার টাকার নোটের গোছা ধরিয়ে দিয়ে বাবা নির্লজ্জের মত পাষণ্ডের মত সেই টাকা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে পকেটে পুরে বেরিয়ে গেল। ঘরের দরজাটা মল্লিক বন্ধ করে দিয়ে—।

হুজুর, মা আমার হাউহাউ করে কেঁদে উঠল একবার। বললে—ওরে নীলু, আমাকে সেকালে দাসী বাঁদী যেমন বিক্রি হত তেমনি করে বিক্রি করলে প্রথমে বাপ। আমি তখন ষোল বছরের মেয়ে—আমি কি করব? অসহায় অবলার মত পড়ে রইলাম—লোকটা আমাকে রাক্ষসের মত গোগ্রাসে গিললে—।

তোর বাবাকে তখন আমি দু'হাত বাড়িয়ে ডেকেছিলাম—তুমি স্বামী—তুমি আমাকে বাঁচাও বাঁচাও। বলেছিলাম—ভীম যেমন দ্রৌপদীকে কীচকের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল তেমনি করে বাঁচাও। শুধু বাঁচানো নয় তুমি শোধ নাও। তুমি ওকে খুন কর। করে যদি ফাঁসি যেতে হয় যাবে—তুমি ভেবো না—আমি বিষ খেয়ে মরব। কিন্তু তোর বাবা কাপুরুষের অধম কাপুরুষ—আমাকে উদ্ধার করতে এসে ছুরি তুলে কাঁপতে লাগল থরথর করে, ওই রাবণ তার হাত ধরলে, ছুরিটা পড়ে গেল। তোর বাপ তার পায়ে গড়িয়ে পড়ে বললে—আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে ছেড়ে দিন। ওই আমাকে বলেছিল—। তোর বাপ আমার দিকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

আমি মাটির পুতুলের মত অবশ হয়ে গিয়েছিলাম—চোখেও বোধ হয় পাতা পড়ে নি—মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু শুনেই গিয়েছিলাম—মায়ের কাছে লিখিয়ে নিয়েছিল—আমাকে আপনি কিনিলেন—তার দাম দিলেন আমার বাবাকে আমার স্বামীকে। আমি চিরদিন কেনা হইয়া রহিলাম। বাবা লিখে দিয়েছিল—আমার স্ত্রী রত্নমালাকে স্বেচ্ছায় আপনাকে বিক্রয় করিলাম এবং দুই হাজার টাকা বুঝিয়া পাইলাম। তারপর বাবা নিজে নাকি নিয়ে যেত

মাকে সঙ্গে করে।

কপাল থেকে রক্ত ঝরে ঝরে মুখ ভিজিয়ে বুক ভিজিয়ে দিয়েছিল—মধ্যে মধ্যে থানা থানা হয়ে জমেও উঠেছিল—সেদিকে তারও খেয়াল ছিল না আমারও ছিল না। সব বলা শেষ করে মা বলেছিল—ওরে নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না সেই বাপের মেয়ে বলে। সেই স্বামীর স্ত্রী বলে। তোকে ক্ষমা করতে পারি নি ওই কাপুরুষ বাপের ছেলে বলে। তুই পেটে না এলে আমি হয়তো মরতাম মরতে পারতাম। তোকে কোন দিন স্নেহ করি নি কিন্তু তোর জন্যেই মরতে পারি নি।

বলতে বলতে মা ঢলে পড়ে গিছল। রক্তক্ষয়ে দুর্বল হচ্ছিল সে খেয়াল ছিল না। তারও ছিল না। আমারও ছিল না। যখন পড়ে গেল তখন মা বললে—নীলু, তুই লোকজন ডাক রে —তাদের সামনে বলব আমি নিজে রাগ করে কানাভাঙা রেকাবিখানা নিজের মাথায় বসিয়ে দিয়েছি।

হুজুর, আমি সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর শোধ আমি নেব। আমার মা। হুজুর, লোকে আমাকে মস্তান বলে—যার মায়ের উপর এমন অত্যাচার হয়—যার চারিদিকে কোন আনন্দ নেই আশা নেই সে মস্তান না হয়ে কি করবে? উপায় কি তার? মায়ের কাছে সব কথা শুনে অবধি আমি ঘুরেছি—পাগলের মত ঘুরেছি। তারপর ছোরা নিয়ে তৈরী হয়ে সেদিন দাঁড়ালাম ওই গলির মোড়ে।

বলতে ভুলেছি হুজুর, মাকে হাসপাতালে দিতে হয়েছিল। মা লোকেদের কাছে বলেছিল নিজের কপালে সে নিজেই ভাঙা রেকাবি বসিয়েছে—হাসপাতালে বলেছিল এমন কাটা নিজের হাতে হয় না। লোকজনে বলেছিল—তাহলে ওর ছেলেই মেরেছে। তাও লেখা আছে পুলিসের খাতায়। তারপর মা বাঁচল—হাসপাতালে সাতদিন থেকে ফিরে এল। এসে বললে —নীলু, তুই চলে যা। আমি তোকে টাকা দিচ্ছি, এই বাড়ি বিক্রি করে টাকা দিচ্ছি তুই চলে যা কোথাও।

আমি মাকে কিছু না বলে চলেই গেলাম। চলে গেলাম না, লুকোলাম কাছেপিঠেই। বুকে আগুন জ্বলত অহরহ। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে ঝগড়া হল। তাদের আমি ছাড়লাম, তারা আমাকে ছাড়লে। ছোরাখান্না নিয়ে তকে তকে থাকতাম। জানতাম মা সপ্তাহে একদিন যায়। ঠিক করেছিলাম প্রথম দিনেই রাক্ষসকে আমি বধ করব। আর এক দিন এক বারও সে আমার মায়ের গায়ে হাত দেবে তার থেকে আমার মৃত্যু ভাল। কিন্তু তা পারি নি হুজুর। সে আমার আপসোস। এত আপসোস আমার বারা দাদামশায়ের কাজের জন্যেও হয় নি। প্রথম দিন গাড়ি এল কিন্তু সে এল না।

দ্বিতীয় দিন গলির মুখে অন্ধকারে দাঁড়ালাম।

একটা লোক নেমে ভিতরে গিয়ে মাকে ডেকে আনলে।

রাক্ষসটা নামলে। এগিয়ে এসে বললে—এস।

আমি লাফিয়ে পড়লাম। পেটে ছুরি চালালাম। তারপর বুকে বাঁদিকে ডানদিকে।

লোকটা পড়ে গেল। যে লোকটা মাকে ডাকতে গিছল সে ভয়ে ছুটে পালাল। গাড়ির ভিতর থেকে ড্রাইভারটা চীৎকার করে উঠল। মা বলে উঠল—নীলু!

বললাম—হ্যাঁ। এই তোকে খালাস করে দিলাম। এরপরও যদি এই পাপ তুই করিস তবে তুই যা বলেছিস সব মিথ্যে আর তার জন্যে তোর কুষ্ঠ হবে জেনে রাখিস। যদি না হয় তবে ফাঁসি যাব আমি—আমি মরা ঈশ্বরকে নরককুণ্ডের পাঁকে পুঁতে দেব চিরদিনের মত।

আমাকে ফাঁসির হুকুম দিন।

আমি খুন করেছি। আমার মাকে যে টাকার জোরে জন্তু-জানোয়ারের মত কিনেছিল তাকে খুন করে আমার মাকে আমি খালাস করেছি।

ঠিক এই মুহূর্তে একটা গুরুভার কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দে সারা আদালত ঘরটা চকিত হয়ে উঠল। কি পড়ল? আসামীও চুপ করলে এবং সেই দিকে তাকালে যেদিক থেকে শব্দটা

উঠেছিল সামনের দিক থেকেই।

একটি অতি বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

মা।

তার মা চেয়ারে বসেছিল—সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। কোর্ট অ্যাডজোর্নড হল সেদিনের মত।

ছয়

"মানুষের প্রতি কি মানুষের অন্যায় করবার অধিকার আছে? প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। এ অধিকার নাই। তবু অন্যায় ঘটে। মানুষ মানুষের উপর সজ্ঞানেই অন্যায় করে। তাহার প্রতিবিধানের জন্য দেশে আইন আছে কানুন আছে শাসন আছে শৃঙ্খলা আছে তবু অন্যায় হয়। এবং বহু ক্ষেত্রে সে অন্যায়ের প্রতিকার হয় না। আইন অসহায়ভাবে দুর্বল হয়ে মাথা নত করে। মানুষের ন্যায়বোধ নীতিবোধ সমস্ত কিছুকে মানুষেরই প্রবৃত্তি সরীসৃপের মত বিষাক্ত দংশনে বিনষ্ট করে। আইন শৃঙ্খলার লোহার বাসরঘর নির্মাণ করে মানুষ ন্যায়নীতির লখীন্দরকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সূচীপ্রমাণ ছিদ্রপথে কালনাগিনী প্রবেশ করে লখীন্দরের প্রাণ হরণ করছে যুগ যুগ ধরে। মানুষ অসহায়ভাবে মেনে নেয় এবং এই সরীসৃপ প্রবৃত্তিকে মাথা নত করে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটে। বর্তমান ঘটনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আসামী নীলু চক্রবর্তীর জীবন নিষ্ঠুর অভিশাপে অভিশপ্ত জীবনের একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

জন্মের বোধ করি প্রথম মুহূর্ত থেকে সে তার মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত, সম্ভবতঃ ঠিক বলা হল না—মাতৃরোষের দ্বারা তিলে তিলে সে দগ্ধ। সমাজে সে চরমতম অপমানে অপমানিত, লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত। এক কামার্ত নরপিশাচের কুটিলতম অত্যাচারে অত্যাচারিত।

পাবলিক প্রসিকিউটর বলেছেন সাক্ষীদের দ্বারা তিনি প্রমাণিত করেছেন যে আসামী কুখ্যাত একজন মস্তান। স্থানীয় লোকেরা তার নামকরণ করেছে টাইগার। অর্থাৎ হিংস্র শ্বাপদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং হিংস্র শ্বাপদ।

হয়তো তাই।

এ সম্পর্কে আসামীপক্ষের অ্যাডভোকেট বলেছেন—হয়তো তাই। যার মায়ের অপমান হয় ধনী ব্যভিচারীর কলুষিত থাবার নীচে, যে বালকের জীবনে কোন সম্মান নেই সমাদর নেই সে যদি সত্যই প্রাণবন্ত হয় তবে বাঘের মত হিংস্র হয়ে নিষ্ঠুরভাবে বর্তমানের সব কিছুকে ভেঙে-চুরে চূর্ণ করে না দিয়ে তার পথ কোথায়? যাকে কেউ স্বীকার করে না তাকে আপন শক্তিতে স্বীকার করাতে হয়, সকল অত্যাচারকে রোধ করতে হয়।

মানুষের কাছে সকল অত্যাচারের চরম অত্যাচারে—মায়ের অপমান।

আসামীপক্ষের অ্যাডভোকেট বলেছেন—সারা দেশের অবস্থা এবং দেশের তরুণদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলতে ইচ্ছে করে যে এই বালক এবং তার মা তার প্রতীক।

এ কথা স্বীকার করতে আমারও ইচ্ছা হয়। এবং বলতে আমি বাধ্য যে এই বালকের মায়ের উপর যে কুটিল এবং কল্পনাতীতরূপে কুৎসিত অত্যাচার হয়েছে, আইনসংগতভাবে তার প্রতিকার হয়তো পেতে পারত কিন্তু এর শোধ নেবার অধিকার তার ছিল না। এ কথাও সত্য যে, বিচিত্র মানুষের সমাজের অতীত-কালের প্রভাবে ওই মিথ্যা দলিলে সই করিয়ে নিয়ে এই নারীর উপর যে অত্যাচার হয়েছে এবং যে অত্যাচারের মুখে অসহায়ভাবে তার পিতা ও তার স্বামী তাকে সমর্পণ করেছে তাতে তার এই পুত্রটি এইভাবে নিজের জীবনপণে ফাঁসিকেই স্থির পরিণাম জেনেই অত্যাচারীকে হত্যা করেছে; সে দুর্দান্ত, প্রাণবন্ত—তার পক্ষে বোধ হয় এই ছিল স্বাভাবিক। দেশের আইন এতে সম্মতি না দিলেও এই প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দিতে উদ্যত হত্যাকারী পুত্রটিকে মানুষ শ্রদ্ধা ও প্রশংসার দৃষ্টি দিয়েই মনোলোকে অভিষিক্ত করবে।

আমি মহামান্য হাইকোর্টের কাছে এই বালকের সকল অপরাধের মার্জনার জন্য সুপারিশ করছি।"

দায়রা বিচারের রায়খানা পড়ছিলেন সুধাংশুবাবু। সুধাংশুবাবুর সেই বসবার ঘরে। সেই রাত্রিবেলা। সামনে দাঁড়িয়েছিল সেই চাঁপা—সেই রত্নমালা।

প্রেতিনী নয়,-মমতায় বেদনায় জল-টলমল দুই চোখ নিয়ে সুধাংশুবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল—মা। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ছিল।

সকল গ্লানি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত মা।

সুধাংশুবাবু প্রসন্ন এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকালেন।

আশ্রয়টুকুর মধ্যে বসে একখানা ক'রে রুটিও আমরা খেয়েছিলাম।

নাজমা দেখতে ছোট, ফয়াগড়নের কালো মেয়ে—কিন্তু তার বুকে কি অফুরন্ত দুধ। আর ওর ছেলেটা, চাঁদ ওর নাম—ছেলেটাও শান্ত। ছেলেটা এর মধ্যেও হাসছিল। বেরিয়েছিলাম সেখান থেকে সন্ধ্যার মুখে। সঙ্গে একটা টর্চ ছিল—তার ব্যাটারি ক্ষয় হয়ে এসেছিল। সেইটেকে ভরসা করেই বেরিয়েছিলাম। ওদিকে তখন আগুন ধোঁয়া কোলাহল কমে এসেছে। মনে হল—যে সিপাহীর দল এসেছিল এখানকার বিদ্রোহ-বিপ্লব দমন করতে, তারা কাজ সেরে চলে গেছে।

ভরসা ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। নাজমাকে বললাম—নাজমা ভয় পাসনে যেন। ভয় পেলে আর কূলকিনারা মিলবে না।

নাজমা বললে—না বড়ভাই, ডর আমার নাই। চল তুমি।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম—ধরাই যদি পড়ি নাজমা?

নাজমা বলেছিল - সে আমার নসীব—আর কি কমু?

* * * *

কার নসীবের নির্দেশ তা জানি না। ধরা পড়ে গেলাম আধঘণ্টার মধ্যে। খানিকটা মাঠে মাঠে পায়-চলা পথে চলে মনে হল দিগদিগন্ত হারিয়ে গেছে। অন্ধকার রাত্রি—দূরে দূরে গ্রামে আলো দেখা যাচ্ছে—কিন্তু সেদিকে চলতে সাহস নেই। চলছিলাম নিঃশব্দে। খুঁজছিলাম একটা অন্ততঃ গাছতলা। এক সময় মনে হল গাছতলা যেন পেলাম। ওই দূরে একটা গাছতলা। গাছতলাটার দিকে আসতেই হঠাৎ টর্চের আলো মুখের উপর পড়ল। কেউ যেন টর্চের আলো ফেললে মুখের উপর। জিজ্ঞাস করলে—কে? কে তোমরা?

আমি কিছু বলবার আগেই সে বললে - তুমি .ক? তুমি তো এদেশের লোক নও। এই চেহারা এই চোখ এই চুল এই রং।

লোকটার দিকে তাকিয়েছিলাম আমি। আলো তার মুখের উপর না পড়লেও মুখখানা দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম এ দেশেরই লোক। মনে হল রাজাকার-টাজাকার দলের কেউ হবে। কিংবা মুসলীম লীগ। মাথার টুপিতে চাঁদতারা বসানো ছিল।

পরিচয় আমি গোপন করলাম না। বললাম—আমি একজন পাকিস্তানী ক্রীশ্চান—আমার বাবা ইংরেজ ছিলেন—মা ছিলেন দেশী ক্রীশ্চান।

আমার পাসপোর্টটাও দেখালাম।

তারা কিন্তু নিষ্ঠুর হাসি হাসছিল। তার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু বুঝতে দেরি হল না—আমাদের সব কিছু সন্ধান ক'রে সব কেড়ে নিয়ে রুমালে বেঁধে কোমরে গুঁজলে—তারপর দাঁত মেলে বিচিত্র কামার্ত হাসি হেসে দু'হাত বাড়ালে নাজমার বুকের কাপড়ের দিকে।

ক্ষীণকায়া নাজমাকে তো চোখেই দেখছেন—ওর যৌবন সমৃদ্ধ যৌবন। হ্যাঁ।

এ কয়দিন তার দিকে তাকিয়ে—বার বার ওই যৌবনের দিকে তাকিয়েছি আবার ভেবেছি। কেন? এমন উদ্ধত যৌবন—

ও যখন ওর ছেলেটাকে কোলে করত—তখন এর উত্তর পেতাম। উদ্ধত যৌবন নয় নাজমার—সমৃদ্ধ যৌবন। তার সব সমৃদ্ধি ওই ছেলেটার জন্যে।

আমি চীৎকার করে উঠলাম—না।

নাজমাও চীৎকার ক'রে উঠল। ভাষাহীন একটা চীৎকার। ঠিক এই মুহূর্তে তীব্র আলো জ্বলে উঠল। মোটরের শব্দ উঠল।

আমরা অন্ধকারে বুঝতে পারিনি—গাছতলাটা একটা গাড়ি চলাচলের সরকারী রাস্তার ধারের একটা গাছতলা। আলোটা জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের আওয়াজ হল। পর পর তিনটে-চারটে। বাতাসে শিস কেটে গুলি বেরিয়ে গেল আমাদের কিছুটা দূর দিয়ে।

এরা চীৎকার করে উঠল—পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

গুলি বন্ধ হল। গাড়িটা গোঙাতে গোঙাতে এসে দাঁড়াল। একটা মিলিটারি জীপ—তার সঙ্গে আরও একখানা জীপ। গাড়ি থামল—আলো নিভল না। সে আলো পরিপূর্ণভাবে আমাদের উপর এসে পড়েছিল। নাজমা আমাকে জাপটে ধ'রে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি আমার ঈশ্বরকে ডাকলাম—ক্রাইস্টকে ডাকলাম, আল্লাহতায়লাকে ডাকলাম—পয়গম্বর রসুলকে ডাকলাম—হিন্দুর ঈশ্বরকেও ডাকলাম। নাজমাকে বাঁচাও। জীবনের মধ্যে একটি ভিখিরীর মেয়ে, কালো মেয়ে—একটি মজুর আদমীর স্ত্রী—আমাকে বড়ভাই বলে—আমাকে সজ্জন জেনে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে আত্মরক্ষার জন্য। আমি দুর্বল—আমি অসহায়—তোমরা বাঁচাও তাকে। তোমরা বাঁচাও।

এরই মধ্যে একটা খুব ভারী গলার আওয়াজে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কেয়া নাম তুমহারা? তারপরই বললে—Hallo—are you not David Armstrong? Motor mechanic David? গজল গানে-বালা ডেভিড নেহি হো তু?

আমি অবাক্ হয়ে গিছলাম। ভয় আমার খুব হয়েছিল—মনে পড়েছিল ঢাকার ২৫শের রাত্রিকালের কথা। তবুও বিস্ময়ের শেষ ছিল না। মিলিটারি জীপ থেকে নেমে এমন বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরে আমার সঙ্গে আমার নাম ধরে ডেকে কথা বললে কে?

আমি কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কে? আপনি—আপনি—

উত্তর পেলাম—পছান্‌তে নেহি? I am Zaffar Mahammad Jaffarulla Khan of Lahore? Look at my face—

তারপর একসঙ্গে একরাশি প্রশ্ন।

তুমি এখানে কোথা থেকে এলে? এখানে তুমি কি করছ?—তুমি এখানে কি কর? এমনধারা চেহারা হয়েছে কেন? আরে তুমি কি এই ছোটা আদমীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ নাকি?

আরে—এ কে? এটা—? এই ছোকরী? এই কালো মেয়েটা? আ—হা। এ

তো বহুত আচ্ছা—খুবসুরতী হ্যায়!—আরে ডেভিড, কাঁহাসে এইসা চীজ তুমনে জুটায়া হো?

কামার্তের লালসা তার কথাগুলো থেকে যেন ঝরে ঝরে পড়ছিল। আমাকে নাজমা সজোরে জড়িয়ে ধরলে।

* * * *

জাফরউল্লা খাঁ—সেই জাফরউল্লা খাঁ। যে জাফরউল্লা খাঁ পাকিস্তান ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের একজন অফিসার ছিল। যে আমার গজলগান শুনে দোস্তি করেছিল। যে আমাকে নিয়ে এই পূর্ব পাকিস্তানে আসতে চেয়েছিল। আমি ওর সঙ্গে আসিনি—ভালো লাগেনি।

সেদিন সেই মুহূর্তে আমি লজ্জিত বোধ করেছিলাম।

জাফর খাঁ বলেছিল—ভাগ্যিস আমার চোখে পড়েছিলে তুমি। না হলে তোমাকে হয়তো এরা গুলি ক'রে মেরে দিয়ে তবে কথা বলত। কালো কালো এই বাঙালীগুলোর মধ্যে ইংরেজী শিখে যারা কায়দে আজমের পাকিস্তানকে বরবাদ করে দিতে চায় তাদের কুত্তার মত গুলি ক'রে মারতে কসম খেয়ে লড়াইয়ে নেমেছি আমরা। Thank your star David —নিঃসন্দেহে তুমি ভাগ্যবান।

গাড়িগুলো হাজিসাহেবের গ্রামে ঢুকছিল। এসে থামল মসজিদের সামনে। ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে গুলি খেয়ে মরা বেয়নেটের খোঁচায় মরা মানুষ। এই গাঁয়ের মানুষ। মেয়ে-পুরুষ, বাপ-ছেলে, বুড়ো-বুড়ী।

জাফর খাঁ নেমেই বললে—সেই শয়তানকে—কুত্তাকে হারামীকে মিলেছে? হাজী শেখ আব্বাসকে? নেই মিলা?

—নেই মিলা।

কুৎসিত গালাগালি দিলে জাফর খাঁ।

পাকিস্তানের দুশমন—ইসলামের হুকুমৎ না-মানা লোক শয়তান হাজী শেখ আব্বাস। এখানে ধানচালের কারবার নিয়ে জাফর খাঁ মিলওয়ালার সঙ্গে দুশমনি করে হাজী আব্বাস। এখানে আওয়ামী লীগের ঝাণ্ডা উঁচা করে এই হাজী শেখ আব্বাস। তাকে পাওয়া যায়নি?

—খোঁজা হয়েছে ভাল ক'রে? খোঁজ ভাল ক'রে। মুর্দা হোক আর জিন্দা হোক—বের কর তাকে। ভাল ক'রে খুঁজে দেখ। টর্চলাইট ফেলে দেখ। সার্চলাইট জ্বেলে—আলো ফেলে খোঁজ।

—দেখ ভাল করে আওয়ামী লীগের কোন লোকের বাড়ি খাড়া আছে কি না; পোড়ার হাত থেকে বেঁচেছে কিনা। দেখ। দেখ—

দুটো মড়া টানতে টানতে নিয়ে এল একজন স্থানীয় লোক--ইয়ে দেখিয়ে—ইয়ে হ্যায় হাজীকে মঝলে বেটা আমীন—আমানুল্লা শেখ—আর ইয়ে হ্যায় এক লেড়কা—ইরসাদ—

ভাল ক'রে দেখলে জাফর খাঁ। তারপর দুটো লাথি মেরে সরিয়ে দেবার ভঙ্গি ক'রে বললে—বুচ্চা কো মিলনা চাহি।

—ওদের বাড়ির ঔরৎরা কোথায়?

—তাদের আগেই সরিয়ে দিয়েছে—

—আঃ।

* * * *

আমি পাথর হয়ে যাচ্ছিলাম। অবশ, পঙ্গুর মত বসেছিলাম জাফর খাঁর সামনে। জাফর খাঁ একটা গোটা মুর্গী রোস্ট নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষুধায় এবং উল্লাসের উৎসাহে খাচ্ছিল। তার সঙ্গে হুইস্কি।

হাজীসাহেবের গ্রাম থেকে মাইল তিনেক দূরে একেবারে নদীর কিনারায় জাফরউল্লা খাঁয়ের রাইস মিল, তার সঙ্গে আরও ব্যবসার সারিবন্দী আপিস। পাশেই সুন্দর বাংলো। বাংলোর মাথায় পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ উড়ছিল, সামনে বারান্দায় জাফরউল্লা খাঁ খাচ্ছিল। আমিও বসেছিলাম। না, আমিও খাচ্ছিলাম। আমার সামনেও খাবার ছিল। কিন্তু আমি দেখছিলাম জাফর খাঁকে।

জাফর খাঁ মোটা হয়েছে। রঙ কিছু ময়লা হয়েছে কিন্তু মেদবৃদ্ধি হয়েছে। চিবুকের নিচে মাংসের একটা থলি যেন ঝুলে পড়েছে। মদে মুখটা থমথম করছে। হা-হা ক'রে হাসছে। মধ্যে মধ্যে আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষছে। আক্রোশ হাজী আব্বাসের উপর।

জাফর খাঁ পাঞ্জাব থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল, দৌলৎ আর দৌলতখানা গড়বার জমিনের সন্ধানে।

—পুরব তরফ কি দক্ষিণ তরফ চলে যেয়ো।

জাফর খাঁ বলছিল আমাকেই। বলছিল—আমার বাপ দাদা এঁরা বলতেন - এক জায়গায় জায়গীর টুকরো টুকরো করো না। চলে যেয়ো ছড়িয়ে পড়ো। আমার পূর্বপুরুষ সামাদ খাঁ এসেছিলেন নাদির শাহের সঙ্গে। শাহ নাদির সারা বালুচিস্তান সারা পশ্চিম পাঞ্জাব হিন্দুস্তানের বাদশার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জায়গীদার বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সামাদ খাঁর জায়গীর বাড়িয়ে গিয়েছিল তার ছেলে। শাহ আবদালী দিল্লীর বাদশাকে হারিয়ে নিজের সীমানা যখন বাড়িয়ে নিলে তখন সামাদ খানের ছেলের জায়গীরেরও সীমানা বাড়ল। তারপর যত ছেলে বেড়েছে তারা চলে এসেছে পুরব তরফ। কালা ছোটা আদমীদের এই মুল্কে আমরা ইসলাম এনে এদের জাত দিয়েছি মান দিয়েছি। এদের বাড়িঘর বানাতে শিখিয়েছি। ডেভিড, তোমরা এসে আমাদের বাদশাহী সুলতানীর সুখের ঘর ভেঙেছিলে। আল্লার মেহেরবাণী ইংরেজ চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আপসোস কি জান, তোমরা বেধরমী কাম কি করেছ জান? আমাদের বাদশাহী আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে যাওনি। এই উত্তর-পশ্চিমে খানিকটা আর এই পুব দিকে খানিকটা দিয়ে বাকিটা দিয়েছে ওদের—ওই হিন্দুদের।

* * * *

জাফরউল্লা মুরগীর রোস্টটা পুরো খেয়ে নিয়ে কানায় কানায় পরিপূর্ণ মদের গ্লাসটি তুলে নিল এবং নিঃশেষে গ্লাসটা শেষ ক'রে সিগারেট ধরিয়ে বললে—তুমি তো খাচ্ছ না ডেভিড?

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। গলার ভিতরটা আমার যেন বন্ধ হয়ে আসছিল একটা ভয়ে ; জাফরউল্লার মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম ঢাকার ২৫শে রাত্রির সেই তাণ্ডব নৃত্যের একজন মিলিটারি অফিসারকে। কি বলব তাই ভাবছিলাম মনে মনে।

জাফরউল্লা খাঁ এখানে একজন বিশিষ্ট ব্যবসাদার মিলওয়ালা। পাঞ্জাব থেকে যে সব ব্যবসাদারেরা এসে পূর্ব পাকিস্তানে সমস্ত ব্যবসায়কে নিজেদের করায়ত্ত করেছেন জাফর খাঁ তাঁদেরই একজন। ধানচালের ব্যবসায়ে তিনি তৃতীয় কি চতুর্থ প্রধানজন। এ অঞ্চলে মুসলীম লীগ জামাতে ইসলামের যাঁরা সমর্থক আছেন, প্রধান আছেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষক তিনি। এখানে যে পাকিস্তানী সিপাহীরা এসেছিল এবং আগুন জালিয়ে সব ছারখার ক'রে দিয়ে সাধারণ হতভাগ্য মানুষদের নির্বিচারে খুন ক'রে অঞ্চলটার উপর পাকিস্তানী ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল তার সমস্ত ছকটা তিনি তৈরী করেছিলেন লীগ সমর্থক আবু তাহের এবং আর ক'জনের পরামর্শ নিয়ে। প্রথম অভ্যুত্থানের সময়ই তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে ঢাকা চলে গিছলেন। ঢাকাতে তাঁর বাড়ি আছে। এতদিন পর পাকিস্তানী সিপাহীদের নিয়ে তিনি ফিরেছেন পাকিস্তানী জেহাদ নিয়ে। এখানকার যে দখল বেদখল ক'রে দিয়েছিল এখানকার হাজীসাহেবরা, সেই দখল উদ্ধার করলেন আজ। পাকিস্তানী ফৌজের অল্প কয়েকজনকে রেখে বাকিরা চলে গেছে। এখন জাফর সাহেব নিজের মিলের বাংলোর মধ্যে বিজয়ীর মন নিয়ে উল্লাসে হা-হা ক'রে হাসছেন। এখন কি ক'রে বলব—মিস্টার খান এ আমার ভাল লাগছে না।

আমি জানি যে মুহূর্তে বলব সেই মুহূর্তে তাঁর টেবিলের পাশে যে চেয়ারটা রয়েছে তার উপর চামড়ার বেল্টসমেত যে রিভলভারটা রয়েছে সেটা তাঁর হাতে উঠবে। এবং পরমুহূর্তেই সেটা গর্জে উঠবে, আমার বুকে বিঁধবে বুলেটটা। আর্মিতে ব্যবহার হয় এ রিভলবারগুলি—৪৫ বোরের।

জাফর খাঁ নিজে হাতে মদের গ্লাস তুলে এগিয়ে দিয়ে বললেন—খাও। আজ এ আমার একটা রাজ্য জয় মিস্টার ডেভিড। সত্যি সত্যি একটা রাজ্য জয় করেছি। ছোটা আদমী ওই শেখ আব্বাস—ও বলে হজ ক'রে এসেছে—ইনসাল্লা। পয়গম্বর রসুল নিশ্চয়ই খুব খুশী হননি। ওই আব্বাসকে আজ খতম করেছি। ওর বাড়ি ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছি ; ওর ছেলেরা বোধহয় সবগুলো মরেছে। ওদের ঔরৎদের পাইনি। পাব। জরুর পাব। এখন এ ইলাকা হল আমার নিজের জায়গীর, নিজের রাজ্য। তোমার বহুৎ নসীবের জোর ডেভিড যে তুমি আমার চোখে পড়েছ। না হলে ওরা তোমাদের খতম ক'রে দিত।

এবার আমি বললাম—আপনাকে বহুত বহুত সালামত আর অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার খান তার জন্য। এবার আর একটা প্রার্থনা করব।

—কি বল ?

—আমাদের এইবার ছেড়ে দেন—আমরা কোথাও নিরাপদে গিয়ে—

—নিরাপদ। হা-হা ক'রে অট্টহাস্য ক'রে উঠল জাফরউল্লা খাঁ। নিরাপদ কোথায়

ডেভিড ? গোটা পুরব পাকিস্তানের মাটি রক্তে ভিজে যাবে। যারা এখান থেকে আমাদের উচ্ছেদ করতে চায়—যারা আমাদের তাড়াতে চায় তাদের একজনকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব না। এতটুকু একটা বাচ্চাকেও না। আমার কাছে থাক ডেভিড। Enjoy the rest of the days of your life. আমি তোমাকে একটা ভাল চাকরি দেব। And তার সঙ্গে একটি হারেম। A very good harem. অবশ্যই এ দেশের মেয়েদের দিয়ে। They are very good—very very good girls. উপভোগ করবার মত এমন আর হয় না। These black girls—

আর এক গ্লাস পূর্ণ ক'রে মদ ঢেলে নিয়ে জাফর খাঁ বললে—তোমাকে একটা গল্প বলি। আমার পূর্বপুরুষ এদেশে এসেছিলেন নাদির শাহের সঙ্গে। যাবার সময় আমার পূর্বপুরুষ নবাব হয়ে বসলেন সিন্ধুনদের ধারে। সেখানে তাঁর হারেমে ছিল একশোও বাঁদী। গোলাম বাঁদীর হাট থেকে ব্যবসাদারেরা তাঁর কাছে বেছে বেছে বাঁদী নিয়ে আসত। তাঁর ভাল লাগত গুজরাটওয়ালী গোয়ালিন। লেকেন তার রঙ ফরসা হলে তিনি পছন্দ করতেন না। আমার বংশের আর এক আমীরের জন্যে আফ্রিকায় লোক যেত বাঁদী আনতে। তাঁর ভাল লাগত হাবসী লেড়কী।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম। আমি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের ছেলে। ষোল-সতের বছরে বাপ আমাকে পাকিস্তানে ফেলে দিয়ে চলে গেছে ইংল্যাণ্ড। আমি অনেক দেখেছি Mr. Officer. Naked life আমি দেখেছি। কিন্তু জাফর খাঁর মত ভালগার মানুষ আমি দেখিনি—এত কুৎসিত এত ভয়ঙ্কর আর কাউকে আমি দেখিনি। দাঁত মেলে হাসছিল, মধ্যে মধ্যে কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছিল আর কথা বলছিল।

—I like Bengali girls—black Bengali girls. আমি এখানে আজ ক'বছরই হল এসেছি। এখানে আমার এক আশ্চর্য হারেম আছে। কালো গরীব মেয়েদের নিয়ে আমার সে হারেম। এদের হারেমে রাখি কেন জান ? যখন ওদের দিকে তাকাই তখন মনে হয় আমি ওদের যুদ্ধ ক'রে জয় ক'রে এনেছি।

আমি তোমাকে এমনি একটা হারেম ক'রে দেব। যদি black girls না চাও তুমি ফর্সা রঙের মেয়ে পাবে। অনেক পাবে। Lakhs of educated young men মরবে ডেভিড —তাদের girls থাকবে। তাদের আমরা পাব।

আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। বোবা হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েই থেকেছিলাম শুধু। মনের মধ্যে চিন্তার আকারেও কিছু ছিল না।

বলেই যাচ্ছিল জাফর খাঁ। বলছিল—I don't like them—these educated modern Bengali girls ; তুমিও চাও না জানি। তোমার choice খুব ভাল, I have liked your girl—

এতক্ষণে একটা electric current যেন আমাকে সারা অস্তিত্বকে নাড়া দিয়ে নিষ্ঠুর চাবুক মারার মত আঘাত দিয়েছিল। আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম—Mr. Khan—

জাফর বলেছিল—কি ?

আমি বলেছিলাম—না।

—কি না ?

—ওর গায়ে তুমি হাত দিয়ো না জাফর খাঁ। না। না।

হা-হা-হা শব্দে হেসে জাফর খাঁ ভেঙে পড়েছিল।

* * * *

Mr. Officer—রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে নরক যেন চোখের সম্মুখে বিমূর্ত হয়ে উঠেছিল।

জাফরউল্লা খাঁর বাড়ির এদিকে ওদিকে জোরালো আলো জ্বলছিল। নিরাপত্তার জন্যেই আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছিল অনাথা অসহায়া কয়েকটা মেয়েকে নিয়ে ধানবিছানো বাঁধানো উঠানটার উপর কতকগুলো পিশাচের অকল্পিত পৈশাচিকতা।

আর আমি ছিলাম বারান্দায় একটা থামের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। সামনে টেবিলের উপর রাখা ছিল সেই ৪৫ বোরের রিভলবারটা। আর সামনে ঘরের মধ্যে মেঝের উপর পড়েছিল উলঙ্গ অনাবৃত একটি মেয়ে। নাজমা। হতচেতন। চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে, হাত দুটো অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

কিছুটা দূরে চাঁদ পড়ে আছে—নিথর, নিস্পন্দ। আমারই চোখের সামনে ছেলেটার গলায় পা দিয়ে ওকে হত্যা করেছে জাফর খাঁ। তারপর আমারই চোখের সামনে নাজমাকে বিবস্ত্র ক'রে কুটিল উল্লাসে ওকে ধর্ষণ করেছে।

নাজমা কয়েকবার মানুষকে ডেকে ঈশ্বরকে ডেকে আর চীৎকার করেনি। চীৎকার করেনি নয়, চীৎকার করতে পারেনি। ও অজ্ঞান হয়ে গেছে।

জাফর খাঁ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা মদের গ্লাস। কি ভয়ঙ্কর যে তাকে দেখাচ্ছিল তা আমি স্মরণই করতে পারি। বলতে পারি না। বর্ণনা ক'রে বোঝাতে পারি না।

আমার চোখের সামনেই সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল নাজমার উপর।

ঠিক এই সময়েই—বোধহয় মিনিটখানেকের মধ্যেই রাইফেলের গুলির আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আলো নিভে গেল।

চীৎকার ক'রে উঠল একদল মানুষ। আকাশ বিদীর্ণ-করা চীৎকার। কি ক্রোধ সে চীৎকারের মধ্যে, কি প্রচণ্ড উল্লাস সে চীৎকারের মধ্যে সে বলতে পারব না। চমকে উঠেছিলাম। চমকে উঠেছিলাম ওদের ধ্বনি শুনে। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

ধ্বনি শুনে একটা জন্তুর মত চীৎকার ক'রে উঠেছিল জাফর খাঁ।

গাঢ় অন্ধকারে তখন সব ঢেকে গেছে। জাফর খাঁর চীৎকার চিনেছিলাম ওর বর্বর গলার আওয়াজ শুনে। অন্ধকারের মধ্যে উলঙ্গ দানবটা খুঁজছিল সেই রিভলবারটা। আমি খুঁটিতে বাঁধা হয়েই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নাজমা সেই পড়েই ছিল।

এরই মধ্যে ছায়ামূর্তির মত মানুষেরা এল।

পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মুসলমান নওজোওয়ান। খালি পা, পরনে লুঙ্গি—কারও খালি গা, কারও গায়ে গেঞ্জি, কারও একটা খাকিরঙের হাফহাতা কামিজ। তাদের সর্বাগ্রে রয়েছে এবাদৎ। ষোল বছরের ছেলে। হাতে রাইফেল। দিনের বেলা এরা পালিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যে থেকে আবার একত্রিত হয়ে দল বেঁধে রাত্রির অন্ধকারে এগিয়ে এসেছে। এসেছে শোধ নিতে।

এখন আক্রোশে ডেকে এনেছেন এদের হাজীসাহেব নিজে।

হাজীসাহেব গুলি করে মারলেন জাফর খাঁকে।

জাফর খাঁ একটা ভয়ঙ্কর হিংস্র পশুর মত চীৎকার করলে মরবার সময়। পর পর চারটে গুলির পরও সে চীৎকার করেছিল।

* * * *

Mr. Officer, হাজীসাহেব লোক সঙ্গে দিয়ে অনেকটা দূর এগিয়ে দিয়েছেন আমাদের। আমার আসবার কোন ইচ্ছা ছিল না, কারণ ছিল না। আমি এসেছি কেবল ওই নাজমার জন্যে।

নাজমা বাঁচতে চায়। তার চাঁদ মরেছে। সে এখনও আশা করে, বড়ভাই তুমি আমার ঘর গড়্যা দিবা, আমার নিকা দিয়া দিবা। আমার চাঁদ আবার ফিরে আসবে। পাগল হয়ে গেছে নাজমা।

হাজীসাহেব আমাকে বলেছেন—ডেভিড সাহেব, তুমি নাজমারে নিয়া যাও উপার বাংলায়। ইপার বাংলায় যখন বাংলাদেশের ঝাণ্ডা উড়বে তখন তারে নিয়া তুমি এস এখানে।

আমি অনেক কষ্টে নাজমাকে বয়ে এনেছি এখানে।

আমি স্পাই নই। স্পাই শব্দটাকে আমি ঘৃণা করি। আমি নাজমাকে নিয়ে এসেছি। ও একটি আশ্চর্য কালো মেয়ে—ওকে আমি ভালবাসি। ওকে আমি আবার ওদেশে ফিরে নিয়ে যাব।

সুতপার তপস্যা

(এপার বাংলা)

কি ? সুব্রত নেই ? সুব্রতর কাপড়জামা, একটা ছোট হাতব্যাগ পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে একসঙ্গে পাঁচটি মৃতদেহ ; মুখ-চোখ কুপিয়ে বিকৃত করা ; গলিত শব ; একটা আলগা মাটি-চাপা-দেহ গর্তের মধ্যে যেমন-তেমন করে চাপা দেওয়া হয়েছিল।

আসানসোলের কাছে একটা কলিয়ারিতে ইউনিয়ন নিয়ে ঝগড়া শেষ পর্যন্ত দাঙ্গায় পরিণত হয়েছিল—মানুষ মরেছে কতজন, তার সঠিক হিসেব কেউ বলতে পারে না, পুলিসও না ; পাঁচটি পাওয়া গেছে, কতজন কত পরিত্যক্ত পিটের গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, কতজনের দেহ ট্রাকে তুলে কিছুদূরে জঙ্গল বা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে—তাই বা কে বলবে।

সুতপা যেন পাথর হয়ে গেল।

এক হাতে চায়ের কাপটা সে ধরে ছিল, সেই কাপটা সে ধরেই রইল—চোখ দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে নিষ্পলক হয়ে গেল। নীরব, তবে নিস্পন্দ নয়—নিঃশ্বাস পড়ছিল। তার সে চেহারা দেখে মানুষের অন্তরাত্মা কেমন যেন আনচান করে ওঠে। যে দেখে সে ভয় পেয়ে যায়।

সুতপার বড়বউদি ঘরের দরজা খুলেই তাকে এইভাবে দেখে আতঙ্কিত হয়ে ডেকে উঠল—ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি !

সুতপা বিহ্বলের মত শুধু সাড়াই একটা দিলে—এঁ্যা ! হাত থেকে কাপটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। তারপর যেন টলতে লাগল।

সুতপার বড়বউদি ঘরের ভিতরে শ্বশুর দাশগুপ্ত সাহেবকে ডাকলে—বাবা ! ঠাকুরঝি—

দাশগুপ্ত সাহেব প্রবীণ মানুষ, বয়স ষাটের কোঠায়, পেশায় আইন ব্যবসায়ী—ব্যারিস্টার মানুষ। প্র্যাকটিস অবশ্য বিশেষ একটা কিছু নয় ; আবার নেহাত কিছু নয় তাও নয়। তবে পণ্ডিত বলে খ্যাতি তাঁর ভারত-জোড়া। নূতন কালে রাজনীতি শাস্ত্রের যত আধুনিকতম তত্ত্ব—সে সম্পর্কে তাঁর মতামতের মূল্য অনেক। কেরালা থেকে দিল্লী এবং দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁরা তাঁকে সমীহ করেন—প্রতিটি মন্তব্যকে খুঁটিয়ে বিচার ক'রে দেখেন। তিনি কোন দলভুক্ত নন এবং সকল দলকেই তিনি বক্রোক্তি করে বিদ্ধ ক'রে থাকেন।

দাশগুপ্ত ঘরের মধ্যে বসে একজন পুলিস অফিসারের কাছে সমস্ত বিবরণ শুনছিলেন। ভদ্রলোক এসেছেন আসানসোল থেকে ; যেসব পুলিস অফিসাররা নিজেরা কেস ইনভেস্টিগেট করেছেন, ইনি তাঁদের একজন। ইনস্‌পেক্টর সুধীর বোস। একখানা চিঠি নিয়ে এসেছেন

তিনি। চিঠিখানা তাঁরা সুব্রতর যে ব্যাগটা পাওয়া গেছে, তারই মধ্যে পেয়েছেন। চিঠিখানা ফুলস্কেপ কাগজে লেখা চিঠি ; দীর্ঘ চিঠি। চিঠিখানা সুব্রত লিখেছে বা লিখছিল সুতপাকে। বিশ-পঁচিশ পৃষ্ঠার চিঠি। বার বার ছেদ টেনে শেষ করতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি, আবার লিখেছে। চিঠিখানা শেষ করেছিল লেখক কয়েকবারই এবং ঠিকানার জায়গায় সুতপার নাম-ঠিকানাও লিখেছিল। কিন্তু তারপরও আবার পুনশ্চ দিয়ে আবারও লিখেছে। তাতেও শেষ হয়নি মনে হয়েছিল বলে আবারও লিখেছিল—এতেও তৃপ্তি হয়নি বলে চতুর্থবার দু-তিন লাইন লিখেছিল।

সেই চিঠির ঠিকানা ধরেই ইনস্‌পেক্টর এখানে এসেছেন।

দাশগুপ্ত সাহেব প্রথম সংবাদটা শুনে, ডেকেছিলেন বড় পুত্রবধূকে। এত বড় মানুষটা—এত পাণ্ডিত্য, এত স্থিরতা—সব যেন একমুহূর্তে একটা আচমকা দমকা বাতাসে আলো নিভিয়ে দেওয়ার মত এক বিপুল বিহ্বলতার অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে গিয়েছিল।

অসহায় বালকের মত দাশগুপ্ত সাহেব বলেছিলেন—বউমা, এ আমি কি করব বল তো? কি ক'রে আমি সুতপার কাছে মুখ দেখাব বল তো?

বউমা বলেছিল—এর আর আপনি কি করবেন বাবা?

—মা, আমি যে ভুলতে পারছি না—আমার জন্মদিনের জন্যে—

বাধা দিয়েছিল পুত্রবধূ।—না বাবা। আপনার জন্মদিনে আপনি সুতপাকে আসতে বারণ করেছিলেন। আপনার সে-পত্র আমি দেখেছি। সে না এলেই পারত।

দাশগুপ্ত বললেন, সেই তো বলছি মা, আমি ষাট বছরের বেশী বয়সের বৃদ্ধ—আমার জন্মদিনের জন্যে—ছি—ছি—ছি।

ইনস্‌পেক্টর সুধীর বোস চুপ ক'রে বসেই ছিলেন। তিনি এবার কথা বলবার সুযোগ করে নিয়ে বললেন—মিসেস মুখার্জীকে—I mean সুতপা দেবীকে একবার ডাকুন। এই যে চিঠিখানা—এখানা তো আমি এখন আপনাদের দিয়ে যেতে পারব না, এখানা এখন আমাদের ফাইলে থাকবে। উনি একবার পড়ে নেবেন বলেই চিঠিখানা আমি নিয়ে এসেছি।

দাশগুপ্ত বললেন—বড় নিষ্ঠুর চিঠি, সুব্রত নির্মম হয়ে পত্রখানা লিখেছে। এতটুকু মমতা হয়নি।

দুটো কনুই টেবিলের উপর রেখে দুই হাতে নিজের মাথা চেপে ধরেছিলেন দাশগুপ্ত সাহেব। তারপর বলেছিলেন—বউমা।

—সুতপাকে ডাকতে বলছেন?

—হ্যাঁ মা। এ সংবাদ তো দিতেই হবে তাকে।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বড় বউ বললে—এ বিয়ে দিতে আমরা সে সময় বার বার বারণ করেছিলাম বাবা।

দাশগুপ্ত সাহেব বললেন—সুতপা আমাকে বলেছিল—বাবা, সুব্রতকে আমি ভালবাসি। তার জন্যে আমি সব সইতে পারব। সব সইব। তুমি যদি না বল বাবা,

তা হলে আমি বিয়ে করব না। নয়তো তোমার পরে—আমি তার ঘরে চলে যাব। সে বলেছে, আমার জন্তে সে অপেক্ষা করবে। তা ছাড়া—

—থাক্ সে-সব কথা মা—ভুল ভুলই। মানুষ ভুল করবেই।

বড় বউ বাইরে যাবার জন্তে পা বাড়িয়ে বললে—হ্যাঁ, বিয়েটা আমাদের উপর, মানে ভাই-ভাজদের উপর, তাদের বাপেদের গুষ্টির উপর রাগ ক'রে করে ব'সেছিল—সে আমাদের অজানা নয়। আপনিও তাতে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

বড় বউ কথা শেষ করতে-করতেই দরজাটা ঠেললে, যাতে কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই সে বেরিয়ে যেতে পারে। কারণ শ্বশুরকে যে খোঁচাটা সে দিয়েছে, তার উত্তরটা যাতে তাকে না শুনতে হয়।

দাশগুপ্ত সাহেব মধ্যে মধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বিশেষ ক'রে এই ধরনের খোঁচা খেলে। থাক সে কথা। বড় বউ অমিতা দরজা খুলেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। দরজার ওপাশেই কাপ হাতে দাঁড়িয়েছিল সুতপা। মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে, দৃষ্টি বিস্ফারিত নিষ্পলক, মানুষটার চেতনা আছে কি নেই বোঝা যায় না।

সে চেহারা দেখে তার অন্তরাত্মা আনচান করে উঠল। সে আতঙ্কিত হয়ে ডাকলে—ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি!

এবার অমিতা ডাকলে শ্বশুরকে—বাবা! ঠাকুরঝি—

চমকে উঠলেন দাশগুপ্ত—কে? সুতপা?

—হ্যাঁ। বোধহয়—

– কি? কি বোধহয়?

অমিতা সুতপাকে জড়িয়ে ধরলে। সুতপা একটা বিহ্বল সাড়া দিলে—এঁ্যা!

দাশগুপ্ত সাহেব বুদ্ধির ব্যাপারে মস্তিষ্কের ব্যাপারে আজও ক্ষুরের ধারের মত শাণিত বুদ্ধির অধিকারী, কিন্তু দেহ তেমন সমর্থ নেই, তবু তিনি এগিয়ে এলেন—সুতপার পিঠে হাত দিয়ে তাকে ডেকে বললেন—সুতপা! মা!

সুতপা সামলেছে তখন, বললে—বাবা!

কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং কাঁপছে কাঁপানো তারের সুরের মত।

দাশগুপ্ত বালকের মত দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন।

সুতপা ইনস্‌পেক্টর বোসের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—চিঠিখানা দেখি!

* * *

চিঠিখানার প্রথম ছত্রেই, নিষ্ঠুরতম কথা কুটিলতম লক্ষ্যভেদে তীক্ষ্ণতম আঘাত। 'সুতপা, ডাইভোর্স সমাজে চালিত হয়েছে, আইনের জোরে বলবৎ হয়েছে—তবুও ডাইভোর্সের এখনও একটা যন্ত্রণা আছে, লোকলজ্জার একটা জ্বালা আছে আমাদের দেশে। সে যন্ত্রণা এবং জ্বালা থেকে তোমাকে অব্যাহতি দেবার জন্তে পথ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ পথ পেয়ে গেছি।

সেই সংবাদটা জানাচ্ছি তোমাকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। একটা মারাত্মক হানাহানি খুনোখুনির মধ্যে এসে পড়েছি। ইচ্ছে করেই এসেছি। এখানে এই কলিয়ারির ইউনিয়নটা এ অঞ্চলের মধ্যে সব থেকে important Labour Union. তার দখল নিয়ে লড়াই হবে। এবং—, থাক্ সে-সব কথা। সে-সব কথার আগে একটা কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আমাদের বিয়েটা একটা মারাত্মক ভুল, এই কথা তোমার দাদারা বউদিদিরা একবাক্যে বলেন। তোমার বাবা বলেন কিনা ঠিক জানি না। তবে মনে মনেও যদি কথাটা কচলান, তাতেও দোষ দেব না। আমার মা তো তার অখুশীর কথা গোপন করতেন না। কিন্তু ভুলটা কার? আর ভুলটাই বা কি?

ভুলটা তোমারও বটে, আমারও বটে, আমাদের অভিভাবকদেরও বটে; তবে বিবাহ করেছি আমরা—ভুল আমাদেরই।

তবে এ ভুল চিরকাল, মানে সেই আদিকাল থেকে করে আসছে মানুষ। রাজার ছেলে ঘুঁটেকুড়ুনীকে বিয়ে করেছে, রাজকন্যে রাখাল ছেলেকে ভালবেসেছে—সব বাধা-বিঘ্ন বুক দিয়ে ঠেলে বেড়ি ভেঙে প্রাসাদের উপর থেকে লাফিয়ে পরিখার জলে পড়ে ওই রাখাল ছেলের পাশে দাঁড়িয়েছে।

রাজার ছেলে রাজার মেয়ের বেলাতেও ভালবাসার পথ মসৃণ ছিল না। সংযুক্তা-পৃথীরাজের বিয়ের ব্যাপারটা ভেবে দেখ; চৌহান রাজবংশই শুধু ধ্বংস হয়নি, গোটা ভারতবর্ষ মুসলমানদের পায়ের তলায় এসে গেল। এখানে সংযুক্তার রূপের জন্য যুদ্ধ হয়নি, সংযুক্তার পিতৃপক্ষ ওই তার কন্যা পৃথীরাজকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল বলে—মুসলমানদের ডেকে এনেছিল। সুভদ্রা-হরণ রুক্মিণী-হরণ এসব পুরাণের কথা।

সামাজিক যুগে, বড়লোকের ছেলে গরীব লোকের মেয়ে, বড়লোকের মেয়ে গরীব লোকের ছেলের বিয়ে অজস্র হয়েছে এবং তার ট্রাজেডিও মানুষের মুখে মুখে রয়েছে। গল্প-উপন্যাসে রয়েছে।

তবে তোমার বাবা তো বড়লোক, মানে ধনী লোক নন! ব্যারিস্টার হলেও আয়টায় তো খুব বেশী নয়।

ভুল আমার ওখানেই হল।

দেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে খাড়া করা হল। সামন্তরাজারা গেল, জমিদারদের জমিদারী গেল, কদর বাড়ল গুণী লোকদের। বামুন বৈদ্য কায়স্থ গন্ধবণিক সুবর্ণবণিক সদগোপ মাহিষ্য নবশাখ এসব বেড়াগুলোও শুকনো শাক আড়ার পুরনো বেড়ার মত ঝড়ে-বৃষ্টিতে ধাক্কায় খসে পড়ল, ভেঙে শুয়ে পড়ল।

তোমার মনে আছে বিয়ের আগে তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম—তাতে লিখেছিলাম তুমি আমাকে ভালবাস, আমি তোমাকে ভালবাসি। এর মধ্যে—এই স্বাধীন ভারতবর্ষে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ যে ভারতবর্ষের আদর্শ—সেখানে বামুন-বদ্যি প্রশ্নটা কি প্রশ্ন

নাকি? আমার মাকে মানতে হবে, আমি তাঁকে মানাবো।

কিন্তু ভুলটার সামনে দাঁড়িয়ে ভুলটা করে ফেললাম।

ভুলে গিছলাম তোমার দাদারা আলাদা পার্টির-লোক। আমি অন্য পার্টির ছেলে। তোমার দাদারা বউদিদিরা যে পার্টির মেম্বার, সে পার্টির সঙ্গে আমাদের পার্থক্য মারাত্মক।

অবশ্য তখনও তুমি পার্টির মেম্বার ছিলে না—স্টুডেণ্টস ফ্রণ্টে ওদের সমর্থক ছিলে। এবং তোমার বাবা পার্টির মেম্বার ছিলেন না। তুমি আমাকে আকর্ষণ করেছিলে, কিন্তু তাঁর উদারতা এবং স্নেহ আমাকে উৎসাহিত করেছিল। এত উদার তিনি। বোধ করি সেই কারণেই তিনি এ বিয়েতে অমত করতে পারেন নি। তুমি—তুমিই আমাকে বলেছ—বাবার কাছে বলেছিলে—বাবা আমি যে ওকে ভালবাসি। নাই বা হল ও দাদাদের পার্টির লোক।

আর একটা কথা বলব—বলতে হবে, না বললে আমি অকৃতজ্ঞ হব—তোমার বাবা আমাকে সত্যই ভালবাসতেন।'

* * *

না। কোথাও এতটুকু সত্য গোপন করেনি, একবিন্দু মিথ্যাও জুড়ে দেয় নি। কিছু আড়াল দিতে চায়নি।

ব্যারিস্টার বি-বি-ডি,—বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত ব্যারিস্টার হিসেবে বড় নন—তাঁর আয়টায় প্রথম শ্রেণীর কেন, দ্বিতীয় শ্রেণীরও অনেকজনের পরে। তবে রাজনীতি শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ভারত-জোড়া তো বটেই, আংশিক ভাবে বিশ্বব্যাপ্ত বলা যায়। সোসালিজম থেকে কম্যুনিজম পর্যন্ত সকল ইজমের আধুনিকতম আকারপ্রকার ভাবভঙ্গি সম্পর্কে তাঁর মতামত রাশিয়া চীন পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের অনেক আগে থেকেই এদেশের পলিটিক্যাল পার্টিগুলি তাঁর মতামতের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকত, তাঁর কাছে মতামতের জন্য আসত; স্বাধীনতার পর তাঁর ওজন বেড়েছে, এখন বামপন্থী বিদেশী রাষ্ট্রের যেসব আগন্তুকবৃন্দ ডেলিগেশন দলভুক্ত হয়ে আসেন—তাঁরা বি-বি-ডি'র সঙ্গে দেখা ক'রে যান। তিনি নিজে কোন দলভুক্ত নন—সকল দলকেই কিছু কিছু সাহায্য তাদের প্রয়োজনের সময় করেও থাকেন। সেখানে ফেরান না তিনি কাউকেই; তবে একটি রাজনৈতিক দলকে সাহায্য কিছু বেশী করেন—কারণ তাঁর দুই ছেলে এবং পুত্রবধূরা ওই পার্টির সভ্য। সভ্য-সংখ্যা কম, কিন্তু তারা প্রতিটিজনই মডার্ন বিশিষ্ট ইণ্টেলেকচুয়াল।

কন্যা সুতপা—তাঁর সব থেকে প্রিয় সন্তান—মা-মরা মেয়ে—সে-ও এই পার্টির ছাত্রফ্রণ্টে স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত পাণ্ডাগিরি করেছে। হঠাৎ সে পাল্টে গেল। হঠাৎ তার দৃষ্টি রাজনৈতিক দিগন্ত থেকে পিছলে এসে বা সরে এসে আবদ্ধ হল সুব্রতর উপর।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

সুব্রত তাই লেখে। লোকেরা অবশ্যই মুখার্জী বলে। সুব্রত সংশোধন করে দেবার চেষ্টা অনেক করেছে—কিন্তু পারেনি। যে কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করত—আপনি সুব্রত মুখার্জী? সে বলত—না। মুখোপাধ্যায়।

সুতপাই জিজ্ঞাসা করেছিল এবং ওই উত্তর পেয়ে বলেছিল—মুখার্জীতে দোষটা কি ?

সুব্রত বলেছিল—যামুন কায়েত বদ্যিদের আদ্ধেক জাত মেরে দিয়ে গেছে ইংরেজ পদবীতে বিলিতী ঢং ঢুকিয়ে। বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় ব্যানার্জী মুখার্জী চ্যাটার্জী করে, বসুকে বোস বাসু তোস করে, গুপ্তকে গুপ্টা করে, রায়কে রে করে। স্বাধীনতার পর ওগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

সুতপা বলেছিল—মানে জাতটা ফিরিয়ে আনতে চান। আপনি তো খুব চীপ স্টাণ্ট-হাণ্টার দেখছি।

—জাত আমি ফিরিয়ে আনতে চাই, কিন্তু স্টাণ্ট-হাণ্টার আমি নই।

—জাত মানেন আপনি ?

—মানি না। ন্যাশানালিটিতে আমি ইণ্ডিয়ান, জাতিতে আমি ভারতীয় এটা ভুলব কি ক'রে ? হিন্দু মুসলমান ক্রশ্চান—এ জাত আমিও ঠিক মানি না, এ জাতের থাক উঠিয়ে দেবার আন্দোলন করলে আমাকে ভলেণ্টিয়ার পাবেন—কিন্তু ভারতীয় জাতিত্ব ওঠাতে গেলে যে স্বাধীনতাকে আবারও জলে ডোবাতে হবে। ন্যাশানাল থেকে ইণ্টারন্যাশানাল হওয়া আমার ধাতে ঠিক সয় না।

সুতপা তার মুখের দিকে একরকম অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল।

সুব্রতর তখনও কথা শেষ হয়নি, সে বলেই চলেছিল—ওই ভারতীয় জাতিত্ব অনুযায়ী আমি মুখোপাধ্যায়, মুখুজ্যেও বটে। কিন্তু মুখার্জী নই।

সুতপা এবার বলেছিল—আপনি হিন্দু মুসলমান ক্রশ্চান জাত ঠিক মানেন না বললেন। মানেন না ? ঠিক মানেন না কেন বললেন ?

সুব্রত বলেছিল—আমার মা আছেন। তিনি মানেন তো। তাই বলছি—ঠিক মানি না। তবে পৈতে আমি রাখিনে এবং ঠাকুর দেবতা সংস্কার এসব মানিনে—তা আমার মা জানেন।

সুতপা বলেছিল—আপনার মায়ের খুব প্রশংসা করেছিল আমার বাবা। আপনার থেকেও বেশী।

—মিস্টার দাশগুপ্ত ? আপনি তো সুজিত দাশগুপ্তের বোন ? ব্যারিস্টার বি. বি. দাশগুপ্তের মেয়ে ?

—হ্যাঁ। আপনি, আপনার মা আমার বাবার খুব যত্ন করেছিলেন। বাবা বলছিলেন—বাংলাদেশের এইটি আমি ঠিক জানতাম না। আমার অজানা ছিল। হয়তো না জেনে এ দেশ সম্পর্কে যা লিখেছি তাতে মনে হচ্ছে আমার রিমার্কসের মধ্যে আমি ভুল করেছি। বেশ কিছু ভুল করেছি।

সুব্রত বলেছিল—আমরা অবশ্য এমন কিছু করেছি বলে মনে করিনে। ওঁর উপযুক্ত যত্ন আমরা করি এমন সাধ্যও আমাদের ছিল না। কিন্তু উনি আমাদের সেই অকিঞ্চিৎকর যত্ন যে পরিতোষের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে আমরা আশ্চর্য হয়ে গিছলাম। কিন্তু

আমাকে খুঁজছিলেন কেন? আমাদের কথা বলতে দেখে কলেজের ছেলেরা বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

সুতপা জানিয়েছিল—বাবা আপনাকে দেখা করতে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন—আমি ভেবেছিলাম সে নিজেই আসবে। যাই হোক, তুই তাকে বলিস আমি দেখা করতে বলেছি—এলে আমি খুব খুশী হব।

বি. বি. দাশগুপ্ত একরাত্রি এবং একদিনের একবেলা—সুব্রতদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এবং খুবই খুশী হয়ে এসেছিলেন।

বর্ধমানের কাটোয়া সাবডিভিশানে গঙ্গার ধারে সর্বানন্দপুর একখানি প্রাচীন গ্রাম। বিখ্যাত বৈদ্যবাসভূমি শ্রীখণ্ডের কাছেই। বড় গ্রাম নয়, ছোট গ্রাম। এই গ্রামেরই ওরা অধিবাসী ছিলেন একদা। মানে দাশগুপ্তরা। মুখুজ্যেরাও এই গ্রামের বাসিন্দে। এখান থেকে বিজয় দাশগুপ্ত মশায়ের পিতামহ ডাক্তারী পাস করে রেলের ডাক্তারী চাকরি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। রিটায়ার করে বাড়ি করেছিলেন কলকাতায়। দেশে ফেরেননি। দেশে তখন ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণ চলছে। বিজয়বাবুর বাবাই প্রথম কুলবিদ্যা চিকিৎসা-বিদ্যা ছেড়ে আইন-ব্যবসায় গ্রহণ করেন। বিজয়বাবুর বাবা এখানে সম্পত্তি করেননি, তবে এখানকার বাড়িখানি মেরামত করিয়েছিলেন এবং বাড়িতে যে পূজা ছিল, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। জীবনের একটা সময়—সেটা তাঁর খুব চলতির সময়—সে-সময় বছর বছর পূজো উপলক্ষে গ্রামে আসতেন। সে সময় বিজয়বাবু ক'বছর এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স আট-নয়। তের-চৌদ্দ বছর পর্যন্ত এসেছিলেন। তারপরই বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর আর বিজয়বাবু দেশে আসেননি।

যাক সে-সব কথা। সে-সব অনেক ইতিহাস। বিজয়বাবু খ্যাতিলাভ করেছেন, নিজের জীবনকে নিজের উপলব্ধ সত্যপথে ও মতে চালিত করেছেন। পূজো উঠিয়ে দিয়েছেন, এখানকার জমি-জেরাত জ্ঞাতিদের দান করে দিয়েছেন। সে অনেক অনেক কথা।

বহুকাল পরে হঠাৎ ১৯৬১ সালে বর্ধমানে আইনজীবী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে এসে বর্ধমান-কাটোয়া লাইনের ট্যারা-বেঁকা নড়বড়ে ঝরঝরে ছোট লাইনের গতি দেখে দেশের কথা মনে পড়ে গেল।

বুড়ো বয়সে বোধ করি মানুষের মায়া বাড়ে।

ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর একবার সর্বানন্দপুর গিয়ে বাপ-পিতামহের জন্মস্থান পুরুষ-পুরুষান্তরের বাস ভিটেখানি দেখে আসেন।

কনফারেন্স-শেষে তাঁর চাকরকে সঙ্গে নিয়ে টিকিট কেটে চেপে বসেছিলেন ছোট লাইনের গাড়িতে।

অসুবিধে ছিল অনেক এবং সে-সবের অনেক কথাই তাঁর মনেও এসেছিল। কিন্তু সে-সবকেই প্রায় ভিনি, কড়া গৃহস্বামী যেমন ক'রে জোর ক'রে ঢুকে পড়া অবাঞ্ছিত জনকে ঘাড় ধরে বের করে দেয় বাড়ি থেকে, তেমনি ক'রেই জোর ক'রেই হটিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু গ্রামে পৌঁছে মনে হল ভুল করেছেন। যে ভাবনা-চিন্তাগুলোকে অবাঞ্ছিতজনের মত দূর করে দিয়েছিলেন, তারা সদর দরজা থেকে হটে গিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে একেবারে বাড়ির ভেতর ঢুকে চেপে বসে আছে। বিজয়বাবুর পৈতৃক বাড়িতে একজন দারোয়ান থাকত—আর জমি-জেরাত দেখাশুনো করত তাঁর জ্ঞাতিরা—তাদের খবর তিনি পাঠিয়েছিলেন। দারোয়ানটি ঘরদোর পরিষ্কার করিয়েও রেখেছিল, বালতিতে জলও তুলিয়ে রেখেছিল, তার বেশী কিছু তার অনুমান বা কল্পনার মধ্যে আসেনি। প্রথমেই বিজয়বাবুর অসুবিধে হয়েছিল চা নিয়ে। তাঁর জ্ঞাতিটির বাড়ি থেকে যে চা এসেছিল সে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল জিভ থেকেই ফেলে দেন; কিন্তু জ্ঞাতিটির সামনে তা পারেননি। মনকে প্রাণপণে শক্ত করে গলাধঃকরণ করেছিলেন এবং একটা বমির ভাবকে চেপে ধরেছিলেন। এমনই ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছিল সুব্রত। কলেজে পড়ে। তখনও আই-এ, বি-এ, এম-এর কাল, বি-এ পড়ছিল সুব্রত। সর্বানন্দপুরের সুরেশ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে। সুরেশ মুখোপাধ্যায় প্রথম যৌবনে একটা কনস্পিরেসি কেসে জড়িয়ে পড়ে বছর দশেকের জন্যে আন্দামানে গিয়েছিল; ফিরে এসে পৈতৃক পঁচিশ-ত্রিশ বিঘে জমি নিয়ে চাষ অবলম্বন করেছিল। তার সঙ্গে করত কংগ্রেস কর্ম। বিয়াল্লিশ সালেও জেলে গিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে বেশী দিন বাঁচেনি। তারই ছেলে এই সুব্রত। গান্ধীজীর নির্দেশে বিনোবাজী যেদিন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে পদযাত্রা শুরু করেন, সেইদিন সুব্রতর জন্ম। তাই তার বাবা সেইদিন, প্রায় বলতে গেলে জন্ম-মুহূর্তে নাম রেখেছিল সুব্রত।

সুব্রতর মা প্রভাময়ী শহরের মেয়ে এবং প্রথম যৌবনে স্বামী যখন কনস্পিরেসি কেসের আসামী হয়ে জেলে যান, তখন তিনিও দেশের কাজে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তবে তাঁর কাজ ছিল সমাজসেবা, চরকা আর গান্ধীজীর বাণীপ্রচার। সুব্রত তাঁর হাতে মানুষ। ভাল ছেলে বলে নাম ছিল সুব্রতর। সুব্রতকে তার মা প্রভাময়ীই পাঠিয়েছিলেন খোঁজ করতে। এখানে তাঁর অসুবিধে কি হচ্ছে দেখতে।

প্রায়-ভর্তি চায়ের কাপটাকে নামিয়ে রেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন বিজয়বাবু। কেউ বিশেষ লক্ষ্য করলে না। শুধু বিজয়বাবুর খাস খানসামা শিবু বেয়ারা চঞ্চল হয়ে উঠল। এবং বিজয়বাবুর কাছে এসে মৃদুস্বরে কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বিজয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন—না। সমস্তটা অনুমানে বুঝলে সুব্রত। এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই একটি ট্রের উপর একটি ভর্তি টি-পট একখানা প্লেটে ঘরের তৈরী ক্ষীর-নারকেলের কয়েকটি মিষ্টি, আর খানকয়েক ক্রীমক্র্যাকার বিস্কুট সাজিয়ে উপরে একখানি ধবধবে ঢাকনা ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসে নামিয়ে দিল বিজয়বাবুর সামনে একখানা চেয়ারের উপর।

বিজয়বাবু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এ কি? এ কেন?

একটু হেসে সুব্রত বলেছিল—আমার মা পাঠিয়ে দিলেন তৈরি করে। চা নয়—কফি।

—কফি? বিস্মিত হয়েছিলেন বিজয়বাবু।

—হ্যাঁ।

উপস্থিত যারা ছিল তাদেরই একজন বললে—ওর মা প্রভাময়ী দেবী আমাদের সারা গ্রামের মা-ঠাকরুণ।

—অ। তা উনি কফি খান নাকি?

সুব্রত বলেছিল—না। মা চা-ও খান না। তবে গ্রামে তো মাঝে-মধ্যে প্রায়ই ইনি-উনি আসেন—আজ এটা কাল ওটা—তাই চা-কফিটফি রাখতে হয়।

—কিন্তু আমার তো আর দরকার নেই—

—একটু মুখে দিন। মা সমাদর ক'রে পাঠিয়েছেন আপনাকে—

হেসে বিজয়বাবু বলেছিলেন—মিষ্টিগুলো কি কেনা না বাড়ির তৈরী—ক্ষীর-নারকেলের তৈরী ক্ষীরপুলি মনে হচ্ছে—

—মায়ের নিজের হাতের তৈরী।

—তা হ'লে একটা খাব। অনেকদিন ক্ষীরপুলি খাইনি।

একটা নয় চারটে ক্ষীরপুলির সাড়ে তিনটে খেয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে বলছিলেন—বাঃ। তারপর কফিটা শেষ করে—আবার আধকাপ টি-পট থেকে ঢেলে নিয়েছিলেন।

এরপর দ্বিতীয় দফা—সন্ধ্যেবেলা আলো নিয়ে।

আলো একটা ছিল। আলো-অন্ধকার একটা হ্যারিকেন। সেইটের দিকে ভুরু কুঁচকে তিনি তাকিয়ে আছেন—হাতের বইখানার পাতা বাতাসে ওল্টাচ্ছে—এমন সময় একটা হ্যাজাক লণ্ঠন হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে সুব্রত এসে হাজির হয়েছিল। হ্যাজাক লণ্ঠনটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে লালচে চিমনী হ্যারিকেনটা সরিয়ে দিয়েছিল।

বিজয়বাবু পরম স্নেহভরে কথঞ্চিৎ আবেগের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন—You are an angel from Heaven, my boy. তুমি দীর্ঘজীবী হও—ভগবানের আশীর্বাদ তোমার উপর ঝরে পড়ুক।

সুব্রত তাঁকে প্রণাম করেছিল। তিনি বলেছিলেন—তুমি আমাকে প্রণাম করছ কি হে? তোমরা যে ব্রাহ্মণ, আমরা বৈদ্য—

সুব্রত বলেছিল—আপনি এ যুগে সত্যিকারের একজন ঋষি, আপনাকে প্রণাম করব না?

এর উত্তরে হয়তো বিজয়বাবু তর্ক এবং যুক্তি দিয়ে অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগবিস্তার করতে পারতেন—ইদানীং এটা তাঁর একটা স্বভাবের মধ্যে না হোক অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—আজ কিন্তু তিনি চুপ করে গিয়েছিলেন—কতটা অভিভূত হয়ে গিছলেন এবং মিষ্ট লেগেছিল ছেলেটির এই প্রণামটি।

এরপর পরদিন ভোরবেলা সুব্রত আবার ট্রেতে সাজিয়ে বিস্কুট-চা এনে হাজির করেছিল—তখনও বিজয়বাবু বিছানায়। শীতকাল, দরজা বন্ধ—সুব্রত টেবিলের উপর ট্রে নামিয়ে ভাবছিল—এমন সময়ে বাইরে এসেছিলেন বিজয়বাবু। ট্রের উপরের পেয়ালা পিরিচ টি-পটের টুংটাং শব্দ তাঁর কানে গিয়েছে। শিবু বেয়ারাকে সুব্রত বলছিল—তুমি যে

বললে সাহেব খুব ভোরে ওঠেন। পাঁচটায়—

শিবু বললে—হাঁ তো। সে তো উঠেন। কিন্তু কাল রাত্রে সারারাত সাহেব ঘুমালেন না।

—দু'তিনটে বেড়ে ইঁদুর বড় জ্বালিয়েছে হে—বলে বেরিয়ে এসেছিলেন বিজয়বাবু।—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম শেষরাতে। কিন্তু এই ভোরে তুমি চা নিয়ে এসেছ। তোমাদের ঋণ শোধ হবার নয়। তা হোক—ঋণী হয়েই থাকব। বস, চা খাওয়া যাক। ঢালো।

চা ঢালতে ঢালতে সুব্রত বলেছিল—আমি চা খাইনে।

—কি মুশকিল! আমার জন্যে খাও অন্তত। আমার যে ভারী সঙ্কোচ লাগছে সুব্রত। দেখ তো, তোমরা চা খাও না অথচ এই ভোরবেলা উনোন ধরিয়ে আমার জন্যে চা করেছ। খাও—এক কাপ চা খাও—for my sake!

এরপর দুপুরবেলা তাঁকে সুব্রতদের বাড়িতে খেতে হয়েছিল। প্রভাময়ী দেবী নিজে এসে তাঁকে নেমন্তন্ন ক'রে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—খেয়ে যাবেন। নাহলে সারাদিন ভারী কষ্ট পাবেন। এখানে আটটায় চড়ে বর্ধমান—সেখান থেকে হাওড়া যেতে সেই বিকেল-বেলা হবে। তার থেকে সাড়ে দশটায় খেয়ে যাবেন—আমি রান্না চড়িয়ে দিয়ে এসেছি—ওরই মধ্যে মাছের ঝোল ভাত ক'রে দেব আমি।

প্রত্যাখ্যান করেননি বিজয়বাবু। তবে বলেছিলেন—আপনার হাতে যখন খাব তখন কিন্তু নিরামিষ খাব। আমার মা অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন—নিরামিষ খেতাম ছেলেবেলা তাঁর পাতে। বেশ একটু সুক্তোর ঝোল খাব। মাষকলাই বাটা ফেটিয়ে তারই পোরের ভাজা।

প্রভাময়ী হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন—তাই হবে। তবে তার সঙ্গে মাছের ঝোল করে দেব। মাছ রাঁধার কথা বলছেন—তা সে তো আমি রাঁধি। সুব্রত তো মাছ খায়!

* * *

সুতপা পড়ছিল সুব্রত লিখেছে—

'তোমার বাবা সত্যিই ঋষিতুল্য মানুষ। তুমি আমাকে জানালে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমাকে বলেছিলেন—আমি ভেবেছিলাম তুমি কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। স্টেশনে তো আমি তোমাকে বলেছিলাম আসবার জন্যে। কিন্তু এলে না কেন?

আমি চুপ করে ছিলাম—সত্যি উত্তরটা মুখে আটকেছিল।

উনি বলেছিলেন—বড়লোক কম্‌প্লেক্স? কিন্তু আমি তো বড়লোক নই। আর বড়লোক তো নেই এযুগে! দু-দশটা আছে জীর্ণ বৃদ্ধ অথর্ব অতিকায় জন্তুর মত পড়ে, তারা যাবার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তা হলে? বিলেতফেরত বলে—জাতটাত—! না, তাও তো না—তুমি আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছ। তবে? তারপর বলেছিলেন—তুমি

স্কটিশে পড়—আমার মেয়েও স্কটিশে আই-এ পড়ে। আমি তাকে বলব, সে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।'

সুব্রতকে বিজয়বাবু কলকাতায় এসে তাঁর বাড়ি আসতে বলেছিলেন। কিন্তু সুব্রত আসেনি। বিজয়বাবু কিন্তু তার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন। শুধু সৌজন্যের খাতিরেই বলেননি; তিনি ওকে জানতেও চেয়েছিলেন।

ছেলেদের বলেননি। দুই ছেলেই রাজনীতিতে একেবারে পাঁকাল মাছের মত পাঁকের ভেতরের জীব হয়ে পড়েছে।

বড়ছেলে ব্যারিস্টার এবং পলিটিকাল ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টারি-রাজনীতির আসরে ঘোরেন—ছোটছেলে বিলেতে থেকে ফোক আর্ট ফোক সংএ বিশেষ শিক্ষা নিয়ে এসেছে। নিজে স্বাধীনভাবে কাজও করে—আবার পার্টির কালচারাল ফ্রণ্টেও কাজ করে। এখন তার সঙ্গে লক্ষ্য—সিনেমার মিউজিক ডিরেক্টরিতে। ছোটবউ পার্টির মেয়ে, গাইতে পারে, আর্টিস্ট হিসাবে নাম ছিল, পার্টির প্রচার-নাট্য করে বেড়াত। এ বাড়ির ছোটছেলের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে আর একজনের সঙ্গে বিয়েও হয়েছিল, কিন্তু বিজয়বাবুর ছোটছেলের সঙ্গে আলাপ হবার পর, সে বিয়ে ডাইভোর্স হয়ে বাতিল হয়ে গেছে। বড়বউ গিন্নীবান্নী মানুষ এবং স্বামীর টানে তিনিও পার্টি করেন।

তিনি অর্থাৎ বিজয়বাবু তাতে আপত্তির কিছু দেখেন না, তবে এক্ষেত্রে মুশকিল হয়েছে এই যে, এই খদ্দর-পরা ছেলেটি মোটামুটি তাঁর ছেলেমেয়েদের পার্টির লোক নয়। ছেলে-বউয়েরা অন্য পার্টির লোককে তো বরদাস্ত করতে পারবে না। এটা কেমন ওদের স্বভাব—হয় তুমি আমার সঙ্গে আছ, আমার মিত্র, নয়তো তুমি শুধু পরই নও, তুমি শত্রু। মাঝখানে কিছু নেই। কেবল মেয়ে সুতপা তখনও পর্যন্ত পার্টি-সাপোর্টার—পার্টি-মেম্বার তখনও হয়নি; নিজে বিজয়বাবু বাধা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—আরো কিছুদিন যাক না রে। মনটা আর একটু শক্ত হোক।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—দেখ, পার্টি-মেম্বার হলেই তো আমাকে ভুলে যাবি।

দু-তিনটে ঘটনা ঘটেছিল যার জন্য একথা তিনি বলেছিলেন। সে-সব ঘটনাগুলো তার অবিদিত ছিল না।

দুটো ছোটবউদিকে নিয়ে। একটা বড়দাকে নিয়ে।

এর মধ্যে একটার কথা এ বাড়ির সকলের মনেই যেন দুরারোগ্য ক্ষতের মত জীবনের সঙ্গী হয়ে আছে। ছোটবউ মাধুরীর সেদিন একটা নাটকের ফাইনাল রিহার্সাল। বিজয়বাবু বিকেলবেলা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বুকে অস্বস্তি, তার সঙ্গে ব্যথা। এ্যানজাইনা আছে ওঁর। ওষুধপত্রও সঙ্গে থাকে তাঁর। সেদিন বাড়িতে কেউ নেই তখন। সুতপা বড়ভাই বড়বউদির সঙ্গে বড়বউদির বাপের বাড়ি গেছে হালিশহর; ছোটভাই সুজিত, ওই যে-

নাটকের রিহার্সালে যাবার জন্য তখন ছোটবউ তৈরি হচ্ছিল—সেই নাটকের ব্যবস্থার জন্য তখন স্টেজে চলে গেছে। এই সময় ঘটল ব্যাপারটা।

বিজয়বাবু সেদিন অসুখ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শিবু খানসামাকে বলেছিলেন—ছোটবউমাকে গিয়ে বল—আমার মনে হচ্ছে অসুখটা এবার সম্ভবত শক্ত। ডাক্তার যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ যেন উনি না যান। বাড়িতে কেউ নেই—

ছোটবউ কথা শোনেনি। তার ড্রেস রিহার্সালে খানিকটা দেরি করতেও সে পারেনি—চলে গিছল। বলেছিল—ওরে বাপ্‌রে! আর আমার এক মিনিট দেরি করবার উপায় নেই।

শিবু বলেছিল—আজ্ঞে না। সাহেব বলছেন—ছোটবউমা যেন না যান।

—না যান! না যান কি? দেখছ না আমি বেরিয়েছি! বাবু কি যত বয়স হচ্ছে তত ছেলেমানুষ হচ্ছেন! আমি বরং ডাক্তারবাবুকে বলে দিচ্ছি ফোনে—তিনি যেন একজন নার্স সঙ্গে নিয়ে আসেন।

বড়ছেলে অজিতের সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটেছিল—সেটা অন্য ধরনের। বিজয়বাবুর কাছে একটি পলিটিক্যাল পার্টির নেতা আসা-যাওয়া করছিলেন কিছুদিন ধরে এবং চাঁদা হিসেবে টাকাকড়িও নিয়ে যাচ্ছিলেন। বড়ছেলের পলিটিক্যাল পার্টির বিরোধী পার্টি। শুধু ভোটের ক্ষেত্রেই বিরোধটা সীমাবদ্ধ নয়, আদর্শের ক্ষেত্রে সে বিরোধ সম্ভবতঃ অধিকতর তীব্র। এই নেতাটি একদিন বিজয়বাবুর বাড়িতে এসে তাঁর দেখা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। ফেরার পথে গেটের মুখে দেখা হয়েছিল অজিতের সঙ্গে। অজিত বাইরে থেকে বাড়ি ফিরছিল। পরস্পরের পরিচিত ব্যক্তি। অজিত দাশগুপ্ত তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিল। যে ব্যঙ্গটা করেছিল সেটা শুধু মর্মান্তিকই নয়, তারও চেয়ে অধিকতর লজ্জাজনক।

কথাটা বিজয়বাবুর কানে উঠেছিল। কানে উঠেছিল ঠিক না; তিনি খোঁজখবর করে জেনেছিলেন। এই বৃদ্ধ মাননীয় ব্যক্তিটি কয়েকদিন না আসার জন্য খোঁজ করেছিলেন। ওদিকে দুই ছেলেই তখন এই চাঁদা দেওয়া নিয়ে আপত্তি তুলেছে। বিচক্ষণ লোকেরা মন্দ বলছে। বিচক্ষণ লোক অবশ্য তারাই, যাদের বিচক্ষণ বলে গণ্য করে তাদের পার্টি। তারা অজিত-সুজিতকে ঠাট্টাও করে। সে ঠাট্টা, তাদের চামড়া শক্ত হলেও, জ্বালাকর রসায়ন মাখানো লোহার ফলাযুক্ত তীরের মত বিদ্ধ করত। সুতরাং তারা পুত্রের অধিকারকে বড় ক'রে যতখানি জোরালো করা যায় জোরালো ক'রে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল—এভাবে আপনি চাঁদা দিতে পাবেন না। ওই লোকটাকে ভিক্ষে দিতে চান দিতে পারেন; একজন ভিক্ষুককে ভিক্ষা হিসেবে—

বিজয়বাবু মধ্যপথেই বলেছিলেন—না।

বড়ছেলে চমকে উঠেছিল—কি না?

বিজয়বাবু বলেছিলেন—তোমাকে কথা বলতে নিষেধ করছি। এ সব কোন কথাই বলবার অধিকার তোমাদের নেই। আমি বাপ, তোমরা ছেলে—তবুও নেই। তুমি অজিত,

সেদিন ওঁকে কতকগুলি অপ্রিয় কথা তোমার অধিকারের বাইরে অবাঞ্ছিত উপহাসের ভঙ্গীতে বলেছ—সেও আমি শুনেছি। আশা করি অতঃপর আর এরকম ঘটনা ঘটবে না।

এর ফলে সংসারটাই তিনটুকরো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বড়ছেলে বড়বউ, ছোটছেলে ছোটবউ এবং বিজয়বাবু ও মেয়ে সুতপা। পুরনো ঠাকুরদার তৈরি বাড়িখানাকে অদলবদল ক'রে নিয়ে তিনটে আলাদা দরজাও ক'রে নিয়েছিলেন।

এই সব কারণেই বিজয়বাবু মেয়েকে বলেছিলেন—পার্টি-মেম্বার হলেই তো আমাকে ভুলে যাবি। আর পার্টি-মেম্বার হয়েই বা করবি কি?

সুতপা বাপের কথা মেনেছিল। পার্টি-মেম্বার হতে চেষ্টা করেনি। চায় নি। ছোটবউদি মাধুরী বার বার বলা সত্ত্বেও চেষ্টা করেনি। বড়বউদি অমিতা মেমসাহেব মেজাজের লোক এবং বড়লোকের কন্যা। স্বামীর প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আগ্রহের আর শেষ নেই। তাঁর ভাইয়েরাও তাঁর স্বামীর পলিটিক্যাল পার্টির সমর্থক। বউদিদিরাও। অমিতা পার্টি-মেম্বার ছিলেন না—এখন হয়েছেন; স্বামীর তাগিদে হয়েছেন। তিনি সুতপাকে পার্টি-মেম্বার হতে বারণও করেননি, হতেও বলেননি। বরং বাবার কথাই শুনতে বলেছিলেন। বলেছিলেন—বাবা যা বলেন তাই তুমি কর সুতপা। ছেলেরা পার্টি করতে গিয়ে ওঁকে মধ্যে মধ্যে দুঃখ দেয়, তুমি ওঁর একটি মেয়ে—তুমি আর ওদের সঙ্গে যোগ দিও না।

সুতপা পার্টি-মেম্বার হয়নি, কিন্তু ওদেরই ভাবনায় ভাবান্বিত ছিল। এবং এদেরই সঙ্গে ছিল ওর সকল প্রীতির বন্ধন।

* * *

নিজের গ্রাম সর্বানন্দপুর থেকে ফিরে এসে বিজয়বাবু সেই কারণেই সুতপাকে বললেন—হ্যাঁরে, তোদের কলেজে বি-এ ক্লাসের সুব্রত মুখার্জী বলে কোন ছেলেকে চিনিস? ইকনমিকসের ছাত্র। বেশ ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে। আর খদ্দর পরে। তোদের অপোজিট ক্যাম্পের ছেলে। তবে কংগ্রেস নয়।

এক ডাকেই চিনেছিল সুতপা। সুব্রত মুখার্জীর নাম সে শুনেছে—দু'চারবার দেখেছেও। তবে আলাপ নেই। কিন্তু কেন? জিজ্ঞাসা করেছিল—তাকে কি করে চিনলে তুমি বাবা?

বিজয়বাবু বলেছিলেন—ভারি ভালো ছেলে রে, ভারি ভাল ছেলে। সর্বানন্দপুরে গিয়ে যেসব অসুবিধেয় পড়েছিলাম—ওঃ। কবিরা গ্রামের ছবি আঁকেন—কিন্তু আসল গ্রাম যা—, ওরে বাপরে। চায়ে চুমুক দিয়ে না পারি গিলতে না পারি ফেলতে—সে আমার মারাত্মক অবস্থা। অথচ চায়ের জন্যে প্রবল তৃষ্ণা। এই সময় ছেলেটি এল, গরম কফি-ভর্তি টি-পট দুধ চিনি কাপ নিয়ে।

সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করেছিলেন বিজয়বাবু সুতপার কাছে। সব বলে বলেছিলেন—ছেলেটির মা যেমন, ছেলেটিও তেমনি। ওকে আমি বলেছিলাম—বড়দিনের বন্ধের পর এখানে এসে যেন আমাদের সঙ্গে দেখা করে। আমার মেয়ে সুতপা—সে আই-এ ক্লাসে

পড়ে ফটিশে। তাকে আমি বলব—সে তোমাকে নিয়ে আসবে। ও অবশ্য কথা দেয়নি—তবে I expected him. এলে আমি খুব খুশী হই। তুই তার খোঁজ ক'রে বলবি—আমি তাকে ডেকেছি। সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবি।

* * *

'সুতপা, আমি তোমাকে চিনতাম। কিন্তু বিখ্যাত বি বি ডি-র কন্যা বলে চিনতাম না। তোমার মডার্নিজমের মধ্যে এমন একটা বিশেষ কিছু ছিল—যার জন্যে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে হত প্রত্যেকটি ছেলেকে।

ছেলেদের থেকে মেয়েরা বোধ করি বেশী দেখত তোমাকে।

তোমরা জোরদার পার্টির ছাত্রফণ্টের সভ্য সব। তোমাদের চলার সঙ্গে ঊর্ধ্বগগনে মাদল বাজত, পায়ের তলায় ধরণীতল উতলা হত, তোমাদের দাপাদাপি—এসব আমাদের ভাল লাগত না। বিশেষ করে আমার নিজের। তবুও তোমার প্রতি আমার একটা আকর্ষণ ছিল। শুধু আমার কেন—সব ছেলেরাই তোমাকে দেখত। সেটাই ওই মডার্নিজমের মধ্যে বিশেষ কিছু। একটি শালীনতা—একটি—কি বলব—রাজহংসীর মত ভাব! বুঝেছ? প্রথম দিন তোমাকে দেখে—আমায় ডেকে কথা বলছ বলে একটু আবোল-তাবোল বকেছিলাম। ওই যে মুখার্জী-মুখোপাধ্যায় সংবাদ; ওইটে। বোধহয় নিজেকে একটু স্মার্ট, নিজের একটুখানি পৌরুষ দেখাবার হাস্যকর চেষ্টা করেছিলাম আপনার অজ্ঞাতসারে।

থাক্।

তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ি গেলাম।

তোমার বাবা খুব খুশী হলেন—আমিও হলাম। এমন একটি মানুষ—জ্ঞানের একটা সমুদ্র। বিশেষ ক'রে রাজনীতি-বিজ্ঞানের মধ্যেও কোথায় একটি আশ্চর্য জ্ঞাতুমীপ্সা আছে, জিজ্ঞাসা আছে তাঁর—যার সন্ধান পেয়ে অভিভূত হয়ে যেতাম। ওটা আমার মধ্যেও ছিল কিনা। ছিল বলেই তো তোমার দাদাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারিনি। ওই পার্টির স্রোতে গা ভাসাতে পারলে তো সকল সংশয় সকল সমস্যা মিটে যেত। এমন বিয়োগান্ত পরিণতিতে এসে পৌঁছতে হত না।

ওই দেখ অকারণ বেশী বকছি। অকারণ হয়, তোমার আর আমার কথা—সে যে যে-কাহিনীর শেষ নেই—সেই কাহিনী।

তোমাকে আমি জয় করলাম।

তোমার রাজনৈতিক মতামত তোমার দাদাদের বউদিদিদের সঙ্গে এক—সে না হও তুমি পার্টি-মেম্বার। এটা আমি তো জানতাম। আর আমি তোমার দাদাদের পার্টির সব থেকে বড় শত্রু যে পার্টি সেই পার্টির মেম্বার না হলেও—ওই পার্টির মতই ছিল আমার জীবনসত্য এবং ওই পার্টির গতির ধারাই ছিল আমার চলার ছন্দগতি। এদিক দিয়ে তুমি উত্তর মেরু, আমি দক্ষিণ মেরু, তোমার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই—দিন আর রাত্রির

মত আমরা পরস্পরের বিপরীত—তোমার সঙ্গে আমার মিলন হয় না—হতে পারে না—এ কল্পনা অবাস্তব—অসম্ভব—এর ফল বিষময়—বিষময় হতে বাধ্য, তবুও তোমাকে জয় করবার জন্ত ব্যাকুল হলাম আমি। ওটা জীবধর্ম। জীবন জীবনের সঙ্গে মেলে, কিন্তু নারী-পুরুষের দেহ ধরে মিলতে হয়।

তোমার বাবা একদিন বলেছিলেন—এক থেকে দুই হয়েই তো সব হল না। বিরহ-মিলন মান-অভিমান চাই, দেহে দেহে এক হওয়া চাই। তাই পুরুষকে দেখলেই নারীদেহে নারীবুকে দোলা লাগে—নারীকে দেখলে পুরুষ চমকে জেগে ওঠে।

আমি তেমনি ক'রে জেগেছিলাম এবং মনে মনে জয় করবার সঙ্কল্প করেছিলাম তোমার মনকে; আর হাত বাড়িয়েছিলাম—'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামন'—: তোমার হাতখানি ধরবার জন্ত। কিন্তু হাত বাড়িয়ে কোন নারীর হাত টেনে নিয়ে নিজের মুঠোতে চেপে ধরা—করায়ত্ত করা তো সহজ নয়। তুমি বিখ্যাত বি বি ডি-র কন্যা, ব্যারিস্টার অজিত দাশগুপ্ত এম্ এম এল এ-র বোন, একটা এত বড় পলিটিক্যাল পার্টির স্টুডেণ্ট ফ্রণ্টের একজন উৎসাহী অতি-আধুনিকা সমর্থনকারী; তার হাত চেপে ধরে 'তুমি আমার' বলা তো সহজ নয়। এ এক পুরাকালে পারতেন কৃষ্ণ-অর্জুনের মত বীরেরা—আর একালে পারে যারা মস্তান তারা। সুতরাং তোমার দিকে আমার হাত বার বার প্রসারিত হতে চাইলেও প্রসারিত হতে দিইনি। মন মনের পথে এগিয়েছিল—তোমার মনকে জয় করতে চেষ্টা করেছিলাম। একটা সস্তা পথ ছিল ইউনিয়নের পথ, কিন্তু তুমি যে ছাত্রফ্রণ্টে কাজ কর—তার বিরোধী ফ্রণ্ট আমার ফ্রণ্ট। আমি ছিলাম আমার ছাত্রফ্রণ্টের লীডার। কিন্তু আমার ফ্রণ্টটা ছিল দুর্বল। ফ্রণ্ট দুর্বল হলেও আমি দুর্বল ছিলাম না। আমি বক্তৃতা করতে উঠলে হাততালি পড়ত। তুমি শুনতে খুব মন দিয়ে—কারণ তোমার সঙ্গে আলাপের পর যখন থেকেই আমাদের মধ্যে চুম্বক-লোহার খেলা শুরু হয়েছে—তখন থেকেই আমি ছাত্রসভায় বলতে উঠে সর্বাগ্রে তোমাকে খুঁজতাম এবং তোমাকে প্রথম সারিতেই পেতাম।

কলেজে তোমার সঙ্গে কথা কওয়া সহজ ছিল—তুমিও সে সম্পর্কে সজাগ ছিলে, আমিও ছিলাম।

আর একটা পথ তোমার বাবা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা হল—আমার পরীক্ষা জীবনে কৃতকার্যতার পথ। বলেছিলেন—সর্বাগ্রে তুমি ভাল ক'রে পড়াশুনাটা শেষ কর। তুমি ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে, কিন্তু ম্যাট্রিক আই-এতে খুব ভাল রেজাল্ট কেন হয়নি তা ঠিক ধরতে পারিনে। মনে হয়, পড়াশুনো তুমি মন দিয়ে করনি। পলিটিক্স করেছ বেশী। এ অত্যন্ত সস্তা পথ সুব্রত।

ওঁর কথার মধ্যে তোমাকে জয় করার পথের যেন নির্দেশ পেয়েছিলাম। বি-এ পরীক্ষায় ইকনমিকসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলাম। খবর বের হলে—আমি ইউনিভারসিটি থেকে ছুটে গেলাম তোমাদের বাড়ি তোমার বাবাকে প্রণাম করতে—তোমার সামনে উজ্জ্বল মুখে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে। তোমার চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি প্রদীপের মত জ্বলবে—আমি জানতাম। আমার

রং কালো হলেও তুমি আমার সবল সুস্থ দেহলাবণ্যে মুগ্ধ ছিলে আমার অজানা ছিল না। মনে মনে তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসখানার সেই একটা লাইন তুমি মধ্যে মধ্যে আওড়াতে: "কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে।" ওটা তুমি লেখকের প্রশংসা করতে না, নায়িকারও না, আমি জানি—তুমি আমার প্রশংসা করতে। ভেবেছিলাম তোমাকে বলব কথাটা সেদিন। 'তোমায় ভালবাসি' কথাটা বলব—তার ভূমিকা রচনার জন্ত বলব। কিন্তু আমি গেলাম তোমাদের বাড়ি—তুমি তখন বেরিয়ে এসেছ ইউনিভারসিটি আমার খবরের জন্তে। তোমার বাবাকে প্রণাম করলাম, তিনি বললেন—Congratulations! কিন্তু এখানে শেষ করলে হবে না। সামনে এম-এ। ভেবেছিলাম বলে ফেলি তোমার কথাটা। কিন্তু তোমার মত জানিনি বলে বলতে পারিনি। দেখা হয়েছিল পথে। আমি ফিরছিলাম তোমাদের বাড়ি থেকে। তুমি ইউনিভারসিটিতে আমায় না পেয়ে ঠিক ধরেছিলে আমি তোমাদের বাড়ি এসেছি এবং যথাসম্ভব দ্রুত বাড়ি ফিরছিলে। আসছিলে ট্যাক্সিতে। আমাকে বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—গাড়ি থামিয়ে আমাকে ডেকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিলে।

ট্যাক্সিতেই আমি তোমাকে বলেছিলাম—তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।

তুমি বলেছিলে—কি কথা?

কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ না ক'রে সটান বলেছিলাম—ভালবাসি।

বোধ করি এইভাবে না বললে বলতে পারতাম না।

তুমি বলেছিলে—আমারও কিন্তু কথা আছে। সেইটেই আগে—

বলেছিলাম—বল। বুকটা ধক্ ধক্ করে উঠেছিল।

তুমি বলেছিলে—ভালবাসি। আমি আগে।

আমি বলেছিলাম—আমি আগে।

* * * *

এরপর দু'বছরের পূর্বরাগ—সে তো তোমারও মনে আছে, আমারও মনে আছে। কফি হাউস—ইউনিভারসিটি ক্যান্টিন—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—স্ট্র্যাণ্ড—চৌরঙ্গীর পশ্চিম দিকের ফুটপাত ধরে হাঁটা, এসব থাক্।

ওসব ছাড়িয়ে মনে পড়ছে বাধার কথা, বিঘ্নের কথা। তোমার দাদা—তোমার বউদি—তোমার ছোড়দা—ছোটবউদি—তোমাদের পার্টিফ্রণ্ট—বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে, তোমার আমার মেলা হয় না।

তোমার বড়দা আমাকে ডেকে বলেছিলেন—দেখ হে, তুমি যেন একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছ। সুতপার সঙ্গে মেলামেশায় তুমি মাত্রা টাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। তোমাকে একটু সাবধান করে দিচ্ছি।

তোমার ছোটবউদি বলেছিল—সুব্রতবাবু, আপনি বেশ ভাল বক্তৃতা করেন। আমাদের ড্রামা-পার্টিতে আসুন না। আমরা আপনাকে অর্জুনের পার্ট দেব—মাবাবেও খুব

ভাল ; আমি সুভদ্রা-হরণ নাটক লিখেছি ; সুভদ্রার রোলে আপনি যদি বলেন তো সুতপাকে নামাতে পারি।

তারপর বলেছিল তোমার ছোটবউদি—সোজাসুজি বলা যাকে বলে তাই—পারবেন ? যদি না পারেন—তা হলে সরে দাঁড়ান। বুঝেছেন ?

তোমার বাবাও আমাকে ডেকে বলেছিলেন—দেখ, তোমাকে আমি সত্যই স্নেহ করি, কোনরকম অপ্রিয় কথা বলতে অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করি। অনেকদিন আগেই এটা বলা আমার উচিত ছিল। সেটা হল সুতপাকে নিয়ে। তোমরা দুজনে দুজনের দিকে একটু বেশি এগিয়ে গেছ। এতে অবশ্য বাধা থাকা উচিত নয়। তুমি ব্রাহ্মণ আমরা বৈদ্য এ বলেও থাকা উচিত নয়—সেটা নেই সেও আমি অনুমান করতে পারি। তোমার মাকে আমি দেখে এসেছি। তোমাকে দেখছি। কিন্তু একালে আর একটা জাতই বল আর থাকই বল—সেটা তৈরি হয়ে গেছে। সেকালে রায়বাহাদুর শ্বশুরের কংগ্রেসী জামাই হলে ব্যাপারটা ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করত। কংগ্রেসী বাপের সুন্দরী মেয়ে রায়বাহাদুরদের বাড়ি এসে কষ্ট পেয়েছে, বাপের সঙ্গে দেখা করতে পায়নি—এমন সব ঘটনা ঘটে গেছে। বড়লোক গরীবলোকের কুটুম্বিতের ট্র্যাজেডির মতই। কিন্তু এখন সেগুলো আরও নানান্ চেহারা নিয়েছে। পার্টির ব্যাপার। দেখ, আমি কোন পার্টির লোক নই ; তবু কিছুটা পরোক্ষ সমর্থন অজিত-সুজিতদের পার্টির উপর আছে এ মানতেই হবে। সুতপাকে আমিই পার্টি-মেম্বার হতে দিইনি ; নাহলে ও ওই পার্টিরই মেম্বার হয়ে যেত এবং হয়তো বা সেক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে তার কোন দ্বন্দ্বতাই হত না। জানি না সুতপা ঠিক কতটা বদলেছে, কিন্তু সবটা বদলেছে কিনা সেইটেই কথা। এবং সেটা—মানে সবটা বদলানো—বোধহয় অসম্ভব। সুতরাং—

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন তোমার বাবা। তারপর বলেছিলেন—দোষ সম্ভবতঃ আমারই। আমারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

আরও অনেকক্ষণ পর বলেছিলেন—তুমি এদের পার্টিতে আসতে পার না বলে শুনেছি।—তা হলে আমার মনে হয়—তোমাদের দুজনের তোমাদের আলাদা আলাদা পথে চলে যাওয়াই ভাল।

* * * *

কথাগুলো খুব বিচক্ষণতার কথা। কিন্তু তুমিও শোননি—আমিও শুনিনি।

আজ গোপন করব না। আপত্তি মা-ও কম করেননি। অনেক অনেক অনেক আপত্তি। মাকে সেদিন নতুন ক'রে নতুন চেহারায় দেখলাম। আমার মা—আমাদের বাড়িতে মুসলমান ক্রশ্চান হরিজন নেতারা যাঁরা এসেছেন—তাঁদের এঁটো কাপ দিব্যি হাতে করে তুলে নিয়েছেন। আমি সকলের সঙ্গে বসে খেয়েছি—আপত্তি করেননি। গরীব-দুঃখী—সে আচণ্ডাল পর্যন্ত—অসুখে পড়লে তাদের শিয়রে গিয়ে বসেছেন। সেই মা আমার তোমাকে বিয়ে করবার কথা বলতে বলেছিলেন—সে কি রে !

এতে আমিও কম আশ্চর্য হইনি। এ কি ? মা এ-সুরে কথা বলেন কেন ? এত

বিস্ময়ের এতে কি আছে ?

অনেক তর্ক, অনেক তর্কের গণ্ডীর বাইরে যাকে সোজা কথায় বলে ঝগড়া-বিবাদ—তাই। শেষ পর্যন্ত মা না খেয়ে পড়ে রইলেন—আমিও রইলাম। বেলা তখন তিনপ্রহর—তিনটে বেজে গেছে ; ঠাকুরের ভোগ হয়নি তখনও ; পূজুরী পূজা ক'রে চলে গেছে। মা তখন উঠে বললেন—আমার ঠাকুরের কি হবে ?

বলেছিলাম—কেন ? যেমন আছে তেমনি থাকবেন ঠাকুর।

বলেছিলেন—তোর বউ ? থাকতে দেবে ঠাকুরকে ?

আমি তোমার কথা ভেবেছিলাম সুতপা। ভেবেচিন্তেই বলেছিলাম—বেশ তো মা, ঠাকুরের পুজোর ব্যবস্থার জন্তে আমি সব সম্পত্তিটাই লিখে দিচ্ছি।

মা বলেছিলেন—তা দিলি। ঠাকুরের পুজো হল—কিন্তু আমার বংশের কে করবে ? যাদের মেয়ে তারা যে মতে বিশ্বাস করে, তাতে তো ঠাকুর-দেবতা নেই, ঈশ্বর নেই।

আমি বলেছিলাম—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মা, তোমার পর ঠাকুরের পুজো আমি করব। আমি যেদিন না থাকব—সেদিন পূজুরী করবে।

আমি তোমাকে এসব কথা একটি একটি ক'রে খুলে বলেছিলাম। আমার বিশ্বাস, তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। কারণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কথা শুনেছিলে। আমি তোমাকে সব কথা বলে বলেছিলাম—তোমার রাজনৈতিক মত তোমার জীবন-বিশ্বাস, মানে আস্তিক্যবাদ নাস্তিক্যবাদ যাই হোক, আমার নিজের সে-সব যাই হোক, যত পৃথক হোক—সে তোমার তোমার, আমার আমার। আমরা জীবনে মিলতে চলেছি—ভালোবাসাকে সম্বল করে—ভালবাসাতে বিশ্বাস রেখে—তা নিয়ে কখনও আমরা সংশয় প্রকাশ করব না।

যদি পরস্পরকে সহ্য করতে না পারি—তাহলে আমরা পৃথক হয়ে যাব।

তুমি সেদিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তোমার দীর্ঘক্ষণের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলেছিলে—থাক্ সুব্রত ; এ বোধহয় না হওয়াই ভাল। আমি চললাম। উঠে চলে গিছলে তুমি।

পরের দিন তুমিই এসেছিলে আগে। এসে বলেছিলে—তোমার সব শর্তই ঠিক আছে সুব্রত ; শেষটা, অর্থাৎ পরস্পরকে সহ্য করতে না পারলে পৃথক হয়ে যাব—এ কথাটা বাদ।

বলেছিলাম—মানে আছে ? বাদের কোন মানে হয় ?

—আইনের কথা বলছ ?

—হ্যাঁ।

তুমি বলেছিলে—মানে আছে, মানে হয়।

—কি হয় ?

—তোমার যদি দরকার হয় ডাইভোর্স চেয়ো আদালতে, আমি কোন জবাব দেব না, আপত্তি তুলব না। আমি কখনও ডাইভোর্স চাইব না।

আমি বলেছিলাম—শুনতে খুব ভাল লাগছে। কিন্তু এটা সেন্টিমেণ্ট।

এরপর আমরা বিয়ে ক'রে তোমার বাবার কাছে গিয়েছিলাম। তোমার বাবা বিস্মিত হননি। বিচক্ষণ মানুষ—আশ্চর্য মানুষ—বলেছিলেন—এইটেই আমি প্রত্যাশা করছিলাম। বিয়ে করে দুজনে এসে আমার সামনে দাঁড়াবে। কিন্তু এরপর আমি একটা সেরিমনি করতে চাই।

মনে আছে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—এ মানায়নি রে তপু। একদম মানায়নি। মাথায় মৌর নেই সিঁথি নেই কনেচন্দন নেই লাল বেনারসী নেই—এই ডগডগে একসিঁথি সিন্দূর নেই—। না—না—না। সেরিমনি চাই। তা না হলে বিয়ে কি ক'রে হল।

তোমার বাবা রোশনচৌকি বাজনা বসিয়ে—ছাদনাতলা তৈরী করিয়ে—পুরুত এনে কন্যাদান করেছিলেন—রীতিমত দান-সামগ্রী সাজিয়ে দিয়েছিলেন। দশজনকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে তবে শেষ করেছিলেন।

তোমার দাদারা দুজনেই বাইরে চলে গেছলেন। মাধুরী বউদি ঘরে খিল দিয়ে অসুখের ভান ক'রে শুয়ে ছিলেন—কেবল বড়বউদি ছিলেন সারাক্ষণ। আমাদের যাবার সময় বড়বউদিই সব করেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন—সুব্রত, ভাই একটা কথা বলি।

বলেছিলেন—সুতপাকে ভালবেসে যখন বিয়েই করলে, তখন পুরোপুরি আমাদেরই হয়ে যাও না। আমরা বড় অস্বস্তি বোধ করছি।

সুতপা, তুমিই বলেছিলে—না বউদি, ওসব কথা থাক্।

সর্বানন্দপুরে এসে তুমি খুব খুশী হয়েছিলে।

মা-ও প্রথম দিন প্রসন্ন হাসিমুখে আমাদের ঘরে তুলবার জন্ত এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সে হাসিমুখ আমারও মনে পড়ে, তোমারও হয়তো মনে পড়ে।

প্রথম দিনই কিন্তু যেখানে সংঘাত বাধার সেইখানেই সংঘাত বাধল।

মা নিয়ে গেলেন আমাদের শালগ্রাম শিলার আসন যে ঘরে সেই ঘরের বারান্দায়, বললেন—প্রণাম করো।

তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলে। আমি ভেবেছিলাম—তুমি প্রশ্ন করছ আমাকে। প্রশ্ন করছ—প্রণাম করতে হবে শালগ্রাম শিলাকে—নুড়িকে? কিন্তু একথা তো ছিল না।

আমার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। তুমিই বলেছিলে। সেটা অবশ্য রাত্রে শোবার ঘরে, তোমার বাবার দেওয়া সোফা-সেটে বসে। কিন্তু সেই সঙ্কটমুহূর্তে তুমি মাটিতে হাত ঠেকিয়ে কপালে ঠেকিয়ে মায়ের কথা মেনে নিয়েছিলে।

আমার বুক থেকে পাষাণের ভার নেমে গিছল।

কিন্তু সঙ্কট যেটা, সেটা যেখানকার সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকেছিল।

* * * *

একটি পুরুষ আর একটি নারী। সুতপা, এরা রাত্রে যে মিলনে মিলিত হয়—সেটি মেলে দুটি দেহের সেতুবন্ধের উপর দাঁড়িয়ে। দিনের মিলন মনে মনে। মত বিরোধ তখনই প্রমাদ ঘটায়। মানুষ ছাড়া প্রাণীজগতে দেহ-মিলনের পরেই একরকম পালা শেষ। মানুষ ঘর বাঁধে দিনরাত্রি একসঙ্গে বাস করবে বলে।

আমাদের মতের বিরোধ সেইখানেই সুযোগ পেলে মাথা তুলে দাঁড়াবার। আমরা ঠিক করেছিলাম—আমার মত আমার, তোমার মত তোমার। তৎসত্ত্বেও আমি তোমার, তুমি আমার।

ভুল বোধহয় হল সেখানেই।

আমি যখন তোমার হব—তখন আমার মতটাই বা তোমার হবে না কেন্? আর তুমি যখন আমার হবে তখন তোমার মতটাই বা আমার হবে না কেন?

এটা তো আছে চিরকাল।

কত মহাকাব্য নাটক উপন্যাসই না তৈরী হয়েছে এ নিয়ে।

সূত্রপাত হল তোমাদের বাড়িতে তোমার ছোড়দার খোকার অন্নপ্রাশনে যে পার্টি হয়েছিল সেই পার্টিতে। কুটুম্ববাড়ির প্রথম কাজ; মা একখানি রূপোর রেকাবীতে একমুঠো সুগন্ধি চাল, একটি রূপোর বাটি-ঝিনুক পাঠিয়েছিলেন, তার সঙ্গে আরও দিয়েছিলেন একটি ব্রোঞ্জের নাড়ুগোপাল মূর্তি। ওটা আমাদের বাড়ির প্রথা ছিল। তিন পুরুষের প্রথা। অন্নপ্রাশনে নাড়ুগোপাল দেওয়া হত।

ওই নিয়েই পার্টিতে নানান্ কথা উঠল। তোমার দাদাদের বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় হল—তাঁরা তোমাকেই বললেন—তোমার বরকে নিয়ে এস আমাদের বাড়ি। কথা বলব। তোমার মত মেয়েকে জয় করেছেন উনি—নিশ্চয়ই একজন হিরো। কিন্তু আমরা তো expect করব তুমি ওঁকে নিয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসবে—

তোমার ছোটবউদি ওই গোপাল-মূর্তি দেখিয়ে কি বলেছিল মনে আছে? বলেছিল—ওঁকে জয় করা সহজ হবে না। উনি আমাদেরকে জয় করবার জন্যে কোমর বেঁধেছেন। এই দেখুন আমার খোকার জন্যে নাড়ুগোপাল দিয়েছেন—ছেলে আমার আপাল নেপাল ভুপাল টুপাল মানে নাড়ুগোপালের রাখাল সখা কেউ একজন হবে।

উত্তরে আমিই বোধ করি আমার কথার হাতিয়ারকে বেশ ক'রে শানিয়ে নিয়ে কথার কোপ মেরেছিলেন। বলেছিলাম—ছোটবউদিদিদের বোধহয় ব্যাসদেবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল—একেবারে ভাগবতকে নতুন ক'রে তৈরী করে দিলেন। সুবল শ্রীদাম দাম বসুদামকে একেবারে আপাল নেপাল ভুপাল ক'রে ছেড়ে দিলেন।

তুমি আমার হাতে ধরে চাপ দিয়েছিলে।

আমি রাগটাকে সংযত করতে ঠিক পারিনি—চেপে গিছলাম; এরপর মাথা ধরেছে বলে বসেছিলাম একধারে।

আমাদের বাড়িতে আমার মা তোমাকে ভালবাসতে চেষ্টা করলেন প্রাণপণে—কিন্তু

আশ্চর্য, পারলেন না। দোষ কার—সে নিয়ে প্রশ্ন বড় নেই, সেটা আমার মায়ের; কিন্তু তোমার কতখানি আমার কতখানি—তা বলতে আজও পারছিনে।

মা সংসারের সব থেকে ভাল খাদ্যটুকু বাড়ির ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে তোমাকে খেতে দিতেন, আমাকে দিতেন না।

তুমি এই প্রসাদটুকু খেতে চাইতে না। ওই তুলসীর পাতা—ওই হাতে নাড়াছোঁয়া খাদ্য—তা ছাড়া আমি যতটা বুঝেছি এই প্রসাদ নামক বস্তুর প্রতি তোমার একটা বিতৃষ্ণা ছিল। চরণোদক আমাদের বাড়িতে আমরা ছেলেবেলা থেকে খাই। তুমি প্রথম দিনই বলেছিলে—আমার মাথায় দিন। আমার এক মামাতো দাদা তীর্থে গিয়ে চরণোদক খেয়ে ব্যাসিলারি ডিসেণ্ট্রিতে পড়েন—তাতেই মারাও যান। ও খেতে আমার কেমন ভয় করে। মা আমার শহরের মেয়ে—তাঁর কালের প্রগতিশীল মেয়ে; ইনফেকশন বোঝেন। কলেরায় আমাদের অঞ্চলে এককালে কাজ করতেন, আমরা তাঁর অধীনে কাজ করতাম; আমাদের ইনফেকশন বোঝাতেন। বলতেন—সাবধান হতে পারলে এসব বিষকে ঝাঁটা মেরে দূর করা যায়। তিনি তোমার এই ইনফেকশনের ভয়ের কথাটা তুচ্ছ করতে পারতেন না, কিন্তু ক্রুদ্ধ হতেন খুব। বলতেন—সুব্রতর বয়স হল চব্বিশ বছর, চব্বিশ বছরই ওর মুখে চরণোদক দিচ্ছি—সে কিন্তু কোন ক্ষতি করেনি, বিষ হয়ে ওঠেনি কোন দিন।

মধ্যে মধ্যে বলতেন—আসল কথা ভগবানকে বিশ্বাস। তাঁকে মানা। যারা ভগবান মানে না, নাস্তিক—তাদের চারিপাশে রক্ষা করবার তো কেউ নেই—তারা মৃত্যুকেই দেখে আর মৃত্যুভয়েই তারা অধীর।

বিরোধ বাড়তে লাগল।

বিচিত্র পথে বাড়ল—পথরোধ করবার শক্তি আমাদের কারুরই হল না।

আধুনিক সাজসজ্জা মা পছন্দ করতেন না—তুমি সেইটেই যেন জোর ক'রে শুরু করলে।

তোমার বাবাকে প্রণাম করছি। তিনি না থাকলে অনেক আগেই আমরা পরস্পরের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতাম। তাঁরই ব্যবস্থায় তাঁর বাড়িতেই সপ্তাহের পাঁচটা দিন থাকতাম, শনিবার আসতাম সর্বানন্দপুর। রবি সোম দুদিন থেকে মঙ্গলবার ভোরে কলকাতা আসতাম। শনিবার দিন মা হ্যারিকেন তুলে ধরে তোমার মুখের ওপর আলো ফেলে গভীর আক্ষেপের একটি ছোট্ট 'হুঃ' শব্দ উচ্চারণ ক'রে কয়েকটা কঠিন কণ্ঠের—'ছি ছি ছি ছি' শব্দের ধিক্কার দিতে দিতে চলে যেতেন।

আমরা জানতাম এর অর্থ। তুমিও জানতে—আমিও জানতাম। আমরা দুজনে দুজনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিতাম।

নিজেদের ঘরে এসে বলতাম—কেন এমন ভাবে ওই ধরনের সাজ ক'রে এখানে আস বল তো? কেন?

প্রথম কিছুদিন চুপ করে থাকতে।

তারপর মুখের উপরই বলতে—রুচি আমার নিজের। আর আমি তো ভালগার সাজসজ্জা করিনি। আজকাল আবার চুলে তেল মাখে কে?

আমার মা আমাদের কথা শুনবার জন্ত তাঁর ঘরের জানালা খুলে অন্ধকারের মধ্যে কান পেতে বসে থাকতেন।

তোমার বাবা তাঁর দেশের পৈতৃক বাড়িখানা সংস্কার করিয়ে তোমাকে দান করেছিলেন। সেই বাড়িতে আমরা থাকতাম। তোমার বাবা তেতলায় একখানা ঘর তুলে দিছলেন, ঠাকুরের জন্ত। মোজেকের মেঝে, সুন্দর বেদী। মা সে-ঘরে ঠাকুরকে আসতে দেননি।

আমাকে বলেছিলেন—বেশ মিষ্টি ক'রে বলেছিলেন—দেখ, তোরা ও-বাড়িতে থাকবি—নির্ঝঞ্ঝাটে থাকবি—যা ইচ্ছে খাবি, ঠাকুর ও-বাড়িতে যাবেন না। এ বাড়ির ঠাকুর, মাটির ঘরে খড়ের চালে আজ পাঁচপুরুষ আছেন। উনি এমনি থাকবেন।

তুমি পরের দিন থেকে সকালে কফির সঙ্গে মুর্গীর ডিম টোস্টের ব্যবস্থা করেছিলে। ভোরবেলা উঠে কোমর বেঁধে কাজে লাগতে। কাজ মানে কফি টোস্ট পোচ তৈরি করা।

* * *

ঘরের মধ্যে যখন আমরা পরস্পর থেকে দূরে চলে যাচ্ছি—তখনই, আমাদের দুর্ভাগ্য, বাইরে ঘনিয়ে উঠল প্রচণ্ড দুর্যোগ।

বিচিত্রভাবে আমি একটা সত্যকে এর মধ্যে অনুভব করেছিলাম।

বাইরের দুর্যোগ ঘরের দুর্যোগকে কখনও কমায়, কখনও বাড়ায়।

দুর্যোগ বলতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলছিনে। প্রাকৃতিক নয়—রাজনৈতিক।

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ বাধল।

গোটা ভারতবর্ষে যেন আশ্চর্য আবেগের কম্পন বয়ে গেল। একটা যেন জাদুর খেলা ঘটে গেল।

অসংখ্য রাজনৈতিক দলে বিভক্ত, নানান্ প্রশ্নে—ভাষার প্রশ্নে ধর্মের প্রশ্নে প্রাদেশিক সীমান্তের প্রশ্নে জর্জরিত দেশটা যেন একমুহূর্তে সকল বিবাদ পাশে ঠেলে সকল প্রশ্নে ধামা চাপা দিয়ে এক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

পার্লামেণ্টে একটা আইন পাস হয়ে গেল বিশেষ ক্ষমতাবলে। এদেশের অধিবাসী যারা তাদের পক্ষে ভারতের বর্তমান সীমান্ত-রেখায় সংশয় প্রকাশ করা দেশদ্রোহিতার অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে।

সংশয় প্রকাশ করার অর্থটার মধ্যে কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ছিল না। ছিল চীন অথবা ভারতবর্ষকে সমর্থনের প্রশ্ন।

আইনের বলে কাগজে কাগজে এই ধরনের ভারতকে অসমর্থন করার মত আলোচনা বন্ধ হল। চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে মন্তব্য প্রকাশও বন্ধ হল। কিন্তু মুখের আলোচনা বন্ধ হল না, দৈব-দুর্বিপাকে আমাদের জীবনে এ দুর্যোগের এই প্রভাব আমাদের ঘরের দুর্যোগের

উপর এসে পড়ল।

কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে একদিন তোমার বাবার কাছে এসেছিলেন জনকয়েক তোমার দাদার পার্টির লোক। আইনের পরামর্শ নিতে এসেছিলেন। তার জের এসে আছড়ে পড়েছিল চায়ের টেবিল পর্যন্ত। সেখানে, চায়ের সঙ্গে আলোচনাটা আইনের সীমানা ডিঙিয়ে চলে এসেছিল স্বাভাবিক ভাবেই।

তুমি প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করনি। কিন্তু অত্যন্ত উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিলে—চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্নের ঐতিহাসিক সত্যটা কি? সেটা সত্যসন্ধানীর জিজ্ঞাসা বা ঔৎসুক্য নয়—একথা বললে তুমি যেন রাগ করো না সুতপা। তুমি যে পার্টিকে একদিন বিশ্বাস করতে—যার সঙ্গে তোমার দাদাদের সম্পর্ক রয়েছে—বাবারও কিছুটা রয়েছে—সেই পার্টির হয়ে কথা বলবার খানিকটা জোর খুঁজছিলে। তুমি তো আমার বুকের হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পাচ্ছিলে। তুমি তো জানতে আমার বুকের মধ্যে এদের বিরুদ্ধ মনোভাব কালবৈশাখী মেঘের মত পুঞ্জীভূত হয়ে আছে! হ্যাঁ সুতপা, কালবৈশাখী মেঘের মত বজ্রবিদ্যুৎ ভরা ছিল আমার সেদিনের আবেগ।

আমি তারই বেগে তারই ঠেলায় আচমকা উঠে চলে গিছলাম চায়ের আসর থেকে। অনেকটা ছিটকে চলে আসার মত যেন দেখতে হয়েছিল।

রাত্রে তুমি বলেছিলে—ওইভাবে চলে আসা তোমার খুব অশালীন হয়েছে।

আমি বলেছিলাম—হ্যাঁ, এই কথাটাই আজ তোমার কাছে শুনব এইটেই আমি অনুমান করেছিলাম। আমার ভুল হয়নি।

সর্বানন্দপুরে এসে দেখলাম, তার ঢেউ সেখানেও এসেছে। দেখলাম কংগ্রেস আপিসে পতাকা উঠেছে। নতুন পতাকা এবং ফ্ল্যাগ-স্টাফটা প্রায় বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচু।

আমাদের সঙ্গে—মানে মা এবং আমার সঙ্গে—কোন সম্পর্ক ছিল না কংগ্রেসের। তবে চীনের সঙ্গে বিরোধে আমাদের পার্টি কংগ্রেস এবং ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। আমার খুব ভাল লাগল।

যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন আমার মা আমাদের বাড়িতেই ওখানকার ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথা হচ্ছিল একটা বড় মিটিং করবার। দেশকে সজাগ করতে হবে।

তুমি আমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ও-বাড়ি চলে গিয়েছিলে।

সেদিন সমস্ত রাত্রি তুমি বিচিত্র বিষণ্ণতার মধ্যে নিজেকে অসুস্থ অনুভব করেছিলে। আমি মায়ের ওখান থেকে যখন এ-বাড়ি এলাম, তখন তুমি শুয়েছ। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কণ্ঠস্বরে আমার ব্যঙ্গের সুর ছিল—জিজ্ঞাসা করেছিলাম—শুলে যে! কি হল?

বলেছিল—শরীর আমার বড্ড খারাপ করছে।

ব্যঙ্গভরেই বলেছিলাম—জ্বর এল নাকি?

তুমি বলেছিলে—Please, Please!

জ্বরটা সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত। পরদিন রবিবারেই তুমি কলকাতা আসবার জন্যে প্রায় জেদ ধরেছিলে।

মা সেদিন কিন্তু সত্যসত্যই তোমার জন্যে চিন্তিত হয়ে তোমার শিয়রে বসেছিলেন। আমার চিন্তার শেষ ছিল না। তুমি কিন্তু কোনটাকেই সহজভাবে নাওনি। রবিবার জ্বরের জন্য আসা হয়নি—সোমবার জ্বর কমতেই কলকাতা এসেছিলাম তোমায় নিয়ে। রবিবার দিন একটা মিটিং ছিল গ্রামে, তুমি বলেছিলে ঐ কারণে তোমায় নিয়ে কলকাতা আসবার সময় হয়নি আমার। আমি মিটিংয়ে গিছলাম একথা ঠিক, কিন্তু যা তুমি ধারণা করেছিলে—হয়তো বা আজও যে ধারণাকে সত্য মনে ক'রে রেখেছ—তা সত্য নয়—সত্য নয়—সত্য নয়। মা সভানেত্রীত্ব করেছিলেন—কিন্তু তিনিও বার বার বলেছিলেন - আমার বড্ড খারাপ লাগছে। তবে এটা ঠিক যে সেদিন কংগ্রেসের ওরা মাকে বলেছিলেন—আবার আপনি আমাদের মধ্যে আসুন। মা বলেছিলেন—না। আমি আর পলিটিক্সের মধ্যে নেই।

মায়ের কাছে একটা কথা শিখেছিলাম সেদিন। বলেছিলেন—দেশ আমার মা, ভগবান পিতা, বিশ্বপিতা। এবার তাঁর সেবার সময় হয়েছে।

ভাল লেগেছিল খুব। কিন্তু ওঁরা বলেছিলেন—তাহলে সুব্রতকে দিন। ও এবার হাল ধরুক। এবার ভাল করে শক্ত ক'রে হাল না ধরলে বিপদ হবে।

মা বলেছিলেন—ও তো একটা পার্টিতে যোগ দিয়েছে। ওকে বলুন আপনারা।

ওঁরা আমাকে বলেছিলেন, আমি দৃঢ়স্বরে বলেছিলাম—না। তবে মনে মনে আমাদের পার্টির হয়ে আমাদের ওখানে কাজ করবার সংকল্প করেছিলাম।

সোমবার কলকাতায় এসে তুমি পাঁচ-সাতদিন বিছানায় শুয়ে ছিলে। জ্বর ঠিক ছিল না। কিন্তু অসুস্থ তুমি ছিলে। অসুখ ছিল কিনা ঠিক জানি না—তবে তুমি অসুস্থ ছিলে তাতে সন্দেহ নেই। আমি জানি তোমার মনের সংকট এবং সংঘর্ষের কথা। কারণ সেটা তো আমারও ছিল।

তুমি কি এ সময়ের মধ্যে ডাইভোর্সের কথা ভেবেছিলে? আমি জানি না। তবে আমি এটা ভাবতাম—ভাবতাম—তোমরা আলট্রা-মডার্ন—তোমরা এদেশের সমাজ-সংস্কারকে মানো না—তুমি হয়তো কোন্ দিন ডাইভোর্স চাইবে।

বিচার ক'রে দেখতে গেলে সেইটেই পথ। কিন্তু আমার হৃদয় যে মানত না। কি করব?

পরের দু-সপ্তাহ তুমি সর্বানন্দপুর যাওনি। আমিও যেতে অনুরোধ করি নি। আমি গেলাম। এর মধ্যে গ্রামে যুদ্ধে সাহায্য-সংগ্রহের জন্য মিটিং হল, মা দুখানা গয়না দিলেন। তাঁর গয়না থেকে দুখানা গয়না। দুগাছা চুড়ি আর সিঁথি-টিকলি। সিঁথি-টিকলিটা তোমার নামে দিয়েছিলেন।

কাগজে বেরিয়েছিল। তুমি প্রতিবাদ করেছিলে—আমার নামে উনি কেন দেবেন? উনি নিজের নামে দিলেই পারতেন।

বহু ভাগ্য সুতপা যে, সেদিনও তোমার দেহ তোমার রূপ—তোমার গায়ের গন্ধ তোমার চোখের দৃষ্টি—এবং তোমার কাছেও আমার এই কালো ওথেলোর মত দেহের রুক্ষতা এবং সবলতার আকর্ষণ হারিয়ে যায়নি। গভীর রাত্রে মিটমাট হয়েছিল—আমার জানুর উপর মাথা রেখে তোমার কোমল হাত দুখানি দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে বলেছিলে—চুপ। চুপ। মিটে গেল। আর না।

তোমার শ্যাম্পু-করা চুল আমার মুখে বুলিয়ে বুলিয়ে প্রমত্ত হয়ে খেলা করেছিলাম। মনে আছে তোমার?

* * *

পণ্ডিতজী মারা গেলেন। লোকে বলে পার্লামেণ্টের স্পেশাল সেশনে চীন-ভারত সংঘর্ষ সঙ্কট সম্বন্ধে তাঁর যে একটি স্টেটমেণ্ট দেবার কথা ছিল—সেই স্টেটমেণ্ট নিয়ে চিন্তা করতে করতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি সহ্য করতে পারেননি।

সারা ভারতবর্ষ হায় হায় করে উঠেছিল। আমি তো কল্পনা করেছি কতদিন যে, ভারতবর্ষ, এই মাটির ভারতবর্ষের আত্মা কেঁদেছিল।

যার যা হল তা হল, কিন্তু আমার যা হল তা বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। আমার মা খবরটা শুনে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। রেডিয়োতে খবরটা শোনবামাত্র তাঁর নাকি মুখখানা সাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই সাদা ফ্যাকাশে মুখে—বাক্যহারা নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বুক চেপে ধরেছিলেন এবং একটি আর্তনাদ ক'রে ঢলে পড়ে গিয়েছিলেন।

আমি বাড়ি ছিলাম না—পাড়ায় গিয়েছিলাম।

খবর পেয়ে বাড়ি ফিরলাম। তুমি কলকাতায় ছিলে। ভাগ্যে তাই ছিলে, না হলে হয়তো দুঃখ সেদিন আমরা সকলেই পেতাম। মা—আমি—তুমি—তিনজনেই। কারণ কলকাতায় এসে যখন তোমাকে সব বিবরণ বলেছিলাম—তখন তুমি কি বলেছিলে মনে আছে? কথাটা বলেছিল ব-হু ব-হু জন।

—বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

তুমি বলেছিলে—ওই কথাটা বোল না। জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুসংবাদ শুনে বুকে ব্যথা ধরে অজ্ঞান হয়ে গেছেন—ওটা বোল না। লোকে ঠাট্টা করবে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষে এইভাবে বুকে ব্যথা ধরে কতজন অজ্ঞান হয়ে গেছে তা আমি জানি না—তবে বেশ কিছু লোক যে গেছে তাতে আমার সন্দেহ নেই। তারা সকলেই কংগ্রেসের লোক তা আমি বলব না, তবে কংগ্রেসের লোকই বেশী এবং তারা পণ্ডিতজীর স্নেহভাজন কংগ্রেসী। যারা ঠাট্টা করেছিল—তারা যে বিরোধী মানুষ এবং তাদের অধিকাংশই যে বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোক—তাতেও আমার সন্দেহ নেই।

আমি তোমাকে বলেছিলাম—লোকে যা বলে বলুক, তুমি সেটা বোল না।

তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলে কয়েক সেকেণ্ড, তারপর বলেছিলে—

কিন্তু লোকের মুখ চাপা দেবে কি ক'রে বল ?

আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিলাম—মুখ চাপা দেবার দরকার নেই। পরে যে যা বলে বলুক, আমি শুধু তোমাকে বলছি—তুমি ওটা বোল না।

তোমাকে আমি সঙ্গে না নিয়েই চলে এসেছিলাম।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে—আমাকে যেতে হবে না বলছ ? আমি যাব না ? মায়ের অসুখ—। আমি তো দাদা-বউদির কাছে কারণটা চেপে যেতে পারি। কি দরকার বলবার যে নেহেরুজীর মৃত্যু-সংবাদ শুনেই বুকে ব্যথা ধরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম —না। এখন তো সুস্থ হয়ে গেছেন আবার। তা ছাড়া মায়ের ভক্তের তো অভাব নেই গ্রামে। তারা সব খুব উৎসাহ ক'রে শুরু-সেবা করেছে। এবং তোমার নিজের শরীরটার কথাও ভাব। তোমার এখন না যাওয়াই ভাল।

তুমি বলেছিলে—হ্যাঁ। না যাওয়াই ভাল। মা যদি বলেন—বউমা তুমি ঠাকুরের কাজকর্ম কর, কি বলেন ভোগ রাঁধ—তা অবিশ্যি বলবেন না—আমার হাতে জল খান—আমার রান্না তরকারী খান—কিন্তু ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে বলবেন না। তবে কি জানি, বললে বিপদে পড়ব। বিশ্বাস অবিশ্বাস ছেড়ে দিচ্ছি, ওই ছুঁচিবাইয়ের মত—এটা নাড়া পড়ল ওটার ছোঁয়া লাগল—এ আমি কোনমতেই পারব না।

তোমাকে বলিনি সুতপা—কথাটা চেপে রেখেছি আজও। মা-ও ঠিক তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন—ভালই করেছিস সুব্রত, বউমাকে আনিসনি। আমি অসুখে পড়ে থাকতাম—বাধ্য হয়ে বউকেই দিতে হত সংসারের সব কিছু ভার। কিন্তু বউমার কোন আচার নেই, কোন ভক্তি নেই,—ভার দিয়ে আমার স্বস্তি হত না সুব্রত। তা ছাড়া—

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তুই হয়তো দুঃখিত হবি সুব্রত—এই এত বড় ঘটনাটা—বউমা এটাকে আমাদের মত ক'রে দেখত না।

* * *

এরপর ঘটনাগুলো মনে করতে গিয়ে নিজেই যেন বিস্ময়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। সারা দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো আষাঢ় থেকে আশ্বিনের ঝড়-জল-মেঘের মত ঝাপটা মেরে মেরে একের পর এক আসতে লাগল। অনাবৃষ্টির আষাঢ় থেকে আশ্বিন নয়—অতিবৃষ্টি বৎসরের আষাঢ়-আশ্বিনের ঝড়-জল-মেঘ। ছোট থেকে বড়—সব থেকে বড় সাইক্লোনের মত।

স্বাভাবিক ভাবেই এটা হয়েছিল।

জওহরলাল নেহেরু চলে গেছেন—বাংলাদেশে তার দু'বছর আগে চলে গেছেন ডাঃ রায়। কেন্দ্রে এসেছেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী, সৎ লোক, শান্ত লোক—কিন্তু মৃদু মানুষ। জলে উঠে জ্বালিয়ে দিতে জানেন না। বাংলাদেশে বিধান রায়ের বিরাট ব্যক্তিত্বের শূন্য স্থান সেন পূর্ণ করতে পারেননি। তার উপর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের আসরে রাজ্যহীন রাজা-

রাজপুত্র, জমিদারীহীন জমিদার-জমিদারনন্দনদের সমাবেশের মাঝখানে বসে কংগ্রেস-সভাপতি হাস্যে পরিহাসে আস্ফালনে—সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনয়ে—দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা-কর্মের আয়োজনের মধ্যেও লুকানো অহঙ্কারে ও মমতাহীনতায়—সাধারণ মানুষের যে বিরূপতা এবং বিদ্বেষ অর্জন করেছিলেন, সে ঘটনা ঐতিহাসিক এবং তার ফলে যে বিস্ফোরণ আসন্ন তাও ঐতিহাসিক এবং তা সব দলই বুঝেছিল।

সামনে নির্বাচনও এগিয়ে আসছিল।

বিশ্ব-রাজনীতির উত্তপ্ত বাতাস এসেও আমাদের দেশের উত্তপ্ত বাতাস খানিকটা ভারী করে তুলেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের ঘরের হাওয়া তাতে বেশি ভারী হয়েছিল—এ তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি।

ভিয়েৎনাম নিয়ে এদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষ সজাগ ছিল না, ক্যাস্ট্রো সম্পর্কেও সচেতনতা তাদের ছিল না। আমার পার্টি যেটা—তার পিছনে সমর্থন খুব ব্যাপক ছিল না এটা আমি অস্বীকার করব না। তোমার দাদাদের কয়েকটি দল তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। তরুণদের সমর্থনে শক্তি তাদের প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। তারা মিছিল নিয়ে কলকাতার পথ-ঘাট-আকাশ-বাতাসে আলোড়ন তুলছে।

পার্লামেণ্ট থেকে বাজারের রাজপথ পর্যন্ত।

ভিয়েৎনাম নিয়ে তোমার আমার অশান্তি নিশ্চয় তুমি ভোলনি। ভোলা উচিত নয়। বল তো সুতপা, আমি কি ভিয়েৎনামের শত্রু, না তাদের বিরোধী ছিলাম?

ছিলাম না—এটা তুমি খুব ভাল ক'রে জান। আমিও ছিলাম না—আমার পার্টিও না। তবে যারা খুব বেশী উচ্চ-চীৎকারে সমর্থন করছিল—তাদের সঙ্গে গলা মেলাইনি কেন এটা প্রশ্ন করলে সেদিনও যেটা বলিনি তোমাকে, আজ সেটা বলি। যারা চেঁচাচ্ছিল তাদের চীৎকারে ভিয়েৎনামের শক্তিবৃদ্ধি যতটা হয়েছিল—তার থেকে তাদের নিজেদের শক্তি অনেক বেশী বাড়ছিল বলে তাদের পিছনে পিছনে দুর্বল একটি দল নিয়ে যাইনি। আমার আপত্তি ছিল—তুমি ভিয়েৎনামের পক্ষ সমর্থনের জন্যে নতুন করে মিছিলে যোগ দিতে শুরু করলে।

আমার আপত্তিকে তুমি তুচ্ছ করতে শুরু করলে। বললে—প্রতি মানুষের কর্তব্য এটা। তোমারও আমার সঙ্গে বের হওয়া উচিত। এই তো, দাদা-বড়বউদি, ছোড়দা-ছোটবউদি সকলেই যান। আরও অসংখ্য লোক যায়।

তবু আমি যাইনি। যেতে পারিনি। মন বলেছিল—ওদের সঙ্গে যাব না। না। সে হয় না।

ছোটবউদি আমাকে ডাকতে শুরু করলেন জামাইবাবু বলে।

তার অর্থ—আমি পোষ্য ঘর-জামাইবাবুতে পরিণত হয়েছি। এবং সেই কারণেই মিছিলে বের হইনে। জামাইয়ের অপমান হবে যে। তোমার সঙ্গে তোমার বাবার কাছে থেকে পড়ছিলাম। এম-এ পরীক্ষা এক বছর দিইনি—ফলে তিন বছর থাকা হয়েছে। হ্যাঁ, বেশ আরামে ছিলাম এতে নিশ্চয় সন্দেহ নেই। সকালে উঠেই চা-টোস্ট-মিষ্টি—আগে চা

খেতাম না, তোমাদের বাড়িতে এসে চা খেতে ধরেছি তখন—তারপর দশটায় র‍্যাশনের বাজারেও খুব মিহি চালের ভাত, তার সঙ্গে বেশ খানিকটা গাওয়া ঘি—ভাজা-ভুজি-মাছ-দই-মিষ্টির ব্যবস্থা ; তোমার বাবার সংসারে উপাদেয় ব্যবস্থা ছিল। আমি ডিম মাছ মাংস আমিষ খেতাম না বলে বেশী ঘি খেতাম—দই-মিষ্টিও বেশী খেতে হত। এবং আমি খেতে পারি। খাইয়ে লোক। বি-এ যখন পড়ি তখন হোস্টেলের ঠাকুরকে জব্দ করবার জন্তে বত্রিশ-চৌত্রিশখানা রুটি খেয়েছি। বিয়ের বরযাত্রী গিয়ে পঞ্চাশটা পান্তুয়া একখোলা দই খেয়েছি।

ছোটবউদি বলতেন—আপনার বউ-ভাগ্যি ভাল, বিয়ে করে কায়েমী স্বার্থে জামাই হয়ে গেড়ে বসেছেন।

বাইরে বন্ধুরা ব্যঙ্গ করত। বলত—বউ করছে ভিয়েৎনাম—তুমি করছ রাজারাম। আছ বেশ।

তোমার বন্ধুরাও করত এবং অনেক ধারালো জিভে করত—তা আমি জানি। ছোটবউদির থেকে ধারালোতর জিহ্বা নিশ্চয় আছে।

এই কারণেই এম-এ পরীক্ষা দিয়েই বললাম—এবার আমি বাড়ি গিয়ে থাকব।

তোমার বাবা বললেন—যাও। আমি সব অনুমান করতে পারি। এখানে থাকা তোমার উচিত হয়নি। তোমার দোষ নেই, দোষ আমার। মেয়ের জন্তেই চেয়েছিলাম এটা। তবে যাবে যখন—তখন সুতপা তোমার সঙ্গে যাবে এবং পারমানেণ্টলি ওখানে থাকবে। আমি সুতপাকে বলব। ল'টা তুমি শেষ কর। তোমাদের একটা টাকা আমি দিয়েছি উইলে। সেটা এখনই দিতে পারি। কিন্তু তুমি প্র্যাক্‌টিসে বসবে—তখন এইটে হবে তোমার মূলধন। বাসা ভাড়া করতে হবে—অন্ত খরচ আছে—

সেদিন উনি বলেছিলেন—কথার মধ্যখানে বলেছিলেন—মেয়েটাকে সুখী দেখতে চাই আমি। ওর মা মরে যাবার পর আমি ওকে নিজে হাতে মানুষ করেছি। আমার আদর্শে ওকে গড়তে চেয়েছি। কিন্তু—

আমি বলেছিলাম—অপরাধ আমার। সুতপাকে আমি না বুঝে আকর্ষণ করেছিলাম। অথচ আমার তো ওকে সুখী করবার মত শক্তি নেই। এ ভুল কি সংশোধন করা যায় না ?

তোমার বাবা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—ভুল হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। মানুষের বিবাহ শুধু দেহে দেহে নয়—তার সঙ্গে মনে মনেও। এবং বিবাহের সার্থকতা তার বংশরক্ষায়, তার কোনমতে প্রাণধারণেই শেষ নয়—প্রেমে তাদের পৌঁছতে হয়। এ ভুল সংশোধনের কথা বলছ—বিবাহ তোমরা করেছ রেজেস্ট্রি করে—একালের বিধানকেই বড় করেছ। সেদিক থেকে ভুল-সংশোধনের যে পথ, তারই ইঙ্গিত বোধ হয় দিচ্ছ তুমি ?

আমি বলেছিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁ হওয়া উচিত তাই। কিন্তু, মাই বয়, এ কথা তুমি আর

কাউকে বোল না। বললে ওইটেই একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়াবে।

আমি বলেছিলাম—কিন্তু আর কোন্ পথই বা আছে বলুন?

তিনি বলেছিলেন—আছে। ভালবাসার পথ। ভালবাসাকে বড় করে তোল সুব্রত, তোমার হাত ধরে আমি মিনতি করছি। এ কথা তুমি ভেবো না।

তোমাকেও তিনি একথা বলেছিলেন।

আমি জানি। তুমি আমাকে বলনি—কিন্তু তবু আমি জানি।

তুমি কিছুদিনের জন্য অন্তরকম হয়ে গেলে। আমি তোমায় ফিরে পেয়েছিলাম—কিছুদিনের জন্যে। বাবা তোমায় এই কথাগুলিই বলেছিলেন, দুপুরবেলা বলেছিলেন- তখন থেকে সারা সন্ধ্যে তুমি কেঁদেছিলে—আমি না ফেবা পর্যন্ত।

আমি মাস-কয়েকের জন্যে দেশে যাব বলে দুপুর থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত এখানে ওখানে ঘুরেছিলাম।

তোমায় কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কাঁদছ কেন? তুমি আরও কেঁদেছিলে। মনে আছে—সারারাত্রি পরস্পরের বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম?

মনে আছে—আবার ভালবাসার জন্যে সংকল্প নিয়েছিলাম? তুমি হঠাৎ আমার আলিঙ্গন ছাড়িয়ে সিঁদুরের কৌটো এনে ধরে বলেছিল আমায়—সিঁথিতে পরিয়ে দাও তো।

মনে আছে?

দেশে তখন যুদ্ধের শিবির বসে গেছে।

কলকাতাতেও যা, এখানেও তাই। তিন-তিনটে পলিটিক্যাল পার্টির সাইনবোর্ড টাঙানো আপিস হয়েছে। কংগ্রেসের আপিস একটা ছিল। নতুন বসেছে আমাদের পার্টির আপিস—আর তোমার ছোড়দার পার্টির আপিস।

আমার মা এবার তোমার সিঁথিতে সিঁদুরের স্পষ্টতা দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন। বলেছিলেন—বাঃ, কত সুন্দর লাগছে বল তো!

বাড়িতে তখন আমার এক বিধবা দিদি এসেছেন। মায়ের হার্টে সামান্য স্থায়ী ক্ষতি হয়েছে। ডাক্তারের নিষেধ হয়েছে কাজকর্ম করতে, মা নিজেও যেন পারেন না ঠিক। সুতরাং ওই বিধবা কন্যাটি মায়ের সেবা এবং ঠাকুরের সেবা করেন। মা তাঁকে বলেছেন—তোকে আমি কিছু দিয়ে যাব শিবানী, তুই আমার ঠাকুরের সেবা কর—আর আমায় একটু-আধটু দেখ। রাত্রে ঘরে শুয়ে মরে পড়ে না থাকি! ছেলের বউ তো—

কথাটা নাকি শেষ করেননি মা। কিন্তু তা না করলেও ওর বাকীটা যে কি তা বোধ করি বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবে না কারুর। এবং দু'রকম কেউ বুঝবেন না।

সেদিন তোমার সিঁথিতে সিন্দূর দেখে সারা চিত্তটাই ওঁর বোধ করি দোলা খেয়ে দুলে উঠেছিল।

তোমার মুখখানি তুলে ধরে দেখেছিলেন।

তোমাকে মৃদুস্বরে যে কথাটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তাতে তুমি লজ্জিত হয়েছিলে।

পনেরো-বিশ দিন আমাদের খুব সুন্দর কেটেছিল।

এর মধ্যেই লোক-যাতায়াত শুরু হয়েছিল—কিন্তু আমরা আমল দিইনি।

তোমার ছোড়দার পার্টির ছেলেরা তোমার কাছে চাঁদা চাইতে এসেছিল—তুমি দিয়েছিলে, তারা চলে গিছল এই পর্যন্ত।

হঠাৎ গ্রামের প্রান্তে হাড়িপাড়ায় কলেরা লাগল।

কাটোয়ায় অম্বুবাচীতে গঙ্গাস্নানে গিয়ে আম-কাঁঠাল খেয়ে কলেরা ধরিয়ে মর-মর অবস্থায় একজন সমর্থ জোয়ান বাড়ি এসে মরল—সেটা কেউ জানতে পারেনি; কিন্তু এরপর তিন-তিনজনের একসঙ্গে কলেরা হওয়ার সংবাদে গ্রামখানা চঞ্চল হল।

কলেরা আমাদের গ্রামে অনেকদিন—বোধ হয় দশ বছর হয়নি। লোকেরা এল মায়ের কাছে।

আবার বাবা দেশের কাজ করতেন যখন, তখন কংগ্রেস কমিটি করে তার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন—তার সঙ্গে আর একটা সমিতি স্থাপন করেছিলেন—সমাজ-সেবক সমিতি। কলেরা তখন এ অঞ্চলে লেগেই থাকত। কাছেই কাটোয়া উদ্ধারণপুরে গঙ্গার ঘাট। পর্বে-পার্বণে বছরে পাঁচ-সাতটা মেলা বসে, সেই মেলায় হয় কলেরার উৎপত্তি। এবং সেটাই যেত চারিপাশে। তারই জন্য স্থাপন করেছিলেন সমাজ-সেবক সমিতি। কলেরা ছাড়া ছিল ম্যালেরিয়া। আরও কাজ ছিল—নাইট-স্কুল ছিল। আগুন নিবারণী বাহিনী ছিল।

এককালে এ অঞ্চলে এই সমিতির খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা ছিল অনেক। বাবার পর এ সোসাইটি চালিয়েছিলেন আমার মা। আমার বাল্যকালে এসব কাজ ভলেন্টিয়ার হয়ে আমিও করেছি। কিন্তু স্বাধীনতার পর কলেরা আর ম্যালেরিয়া এ দুটো ব্যাধি বিচিত্রভাবে দেশ-ছাড়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সমিতির কাজকর্মের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তা ছাড়া স্বাধীনতার পর কংগ্রেস নাইট-স্কুল, আগুন-নিবারণী বাহিনী চালাবার মত কাজকর্ম পাশে ঠেলে সরিয়ে সভাসমিতি ইলেকশনের কাজ নিয়েই উঠে পড়ে লেগেছিল বলে সমিতিগুলি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়েছিল। মা ধরে রেখেছিলেন বলেই ছিল—না হলে হয়তো মরে পচে ধুলো-মাটির সঙ্গে মিশে যেত।

মা আমার কংগ্রেস ছেড়েছিলেন এরই জন্য।

আমিও ছেড়েছিলাম মায়ের সঙ্গে। অবশ্য আমার আরও কারণ ছিল। যাক সে-সব কারণের কথা। ওসবের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ঘুচিয়ে দেব বলে বদ্ধপরিকর ছিলাম আমি। কিন্তু কলেরার তাড়া খেয়ে দরিদ্র মানুষগুলো সেদিন যখন ছুটে এসে আমাদের উঠোনে দাঁড়িয়ে 'ঠাকরুণ, মা ঠাকরুণ! বাঁচাও মা—এ বিপদ থেকে তুমি বাঁচাও' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল, তখন তো তুমি আমি আমাদের—মানে তোমাদের পাকা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তখন তো 'কি হল কি হল' বলে আমরা দুজনেই ছুটে এসেছিলাম বাড়িতে। মায়ের শরীর ভাল ছিল না। মা তবুও খাট থেকে নেমে দেওয়াল ধরে বাইরে এসেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন—ওরে, আমার তো যাবার শক্তি নেই, তো তুই যা। কাজ তো

এককালে করেছিস। ভয় তো করবে না। যা—দেখেশুনে ওদের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আয়।

তুমি আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলে। বলেছিলে—আমি যাব।

মা হেসে বলেছিলেন—যাবে বইকি মা। যাওয়া তো উচিত। তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আমিও যেতাম ওদের মধ্যে। তাঁর কাছেই শিখেছিলাম এই সব সেবার কাজ। কিন্তু তুমি যাবে—তোমার ভয় করবে না তো? তোমার কি অ্যান্টি-কলেরা ভ্যাকসিন নেওয়া আছে?

ভ্যাকসিন তোমার নেওয়া ছিল না। ভয়ও তুমি পেয়েছিলে। তবু আমি চেয়েছিলাম তুমি আমার সঙ্গে যাও। হয়তো আমার এই গৌরবের কাজ তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম। পুরুষ দেখাতে চায়।

তুমি দেখেছিলে—খুশী হয়েছিলে।

তারপর আরও কত খুশী হয়েছিলে- যখন কাজ বাড়ল। তখন কলেরাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; টেলিগ্রাম গেল হেলথ ডিপার্টমেণ্টে—মিনিস্টারের কাছে। তারা এল দলে দলে জীপে চেপে। তাদের অভ্যর্থনার সব ভার মা দিলেন তোমার উপর। আমি আমার চ্যালাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম—এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া, এ-গাঁ থেকে সে-গাঁ। একদিন তুমি আমার সঙ্গে ঘুরেছিলে। সে কি মুগ্ধ-বিস্ময় তোমার মুখে, তোমার চোখে।

আমাকে জাপটে ধরে তুমি বলেছিলে—তুমি অত্যন্ত শঠ—তুমি প্রবঞ্চক।

চমকে উঠে বলেছিলাম—কেন?

তুমি বলেছিলে—তুমি শঠ—তোমার এই রূপ আমাকে দেখাওনি আজও।

আশ্চর্য! এই সমাজ-সেবক সমিতিরই কোন এক ফাটল দিয়ে আমাদের জীবনে ঢুকল সেই সাপটা—যে সাপটা লোহার বাসরঘরে লখীন্দরকে কামড়েছিল; না, সে সাপটা নয়। এ সাপটা রাজনীতির সেই সর্বনাশা সাপটা—যেটা আজ মানুষের সমাজের মাথায় ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বের সমস্ত মানুষকেই সে কামড়াবে, বিষে জর্জরিত করে দেবে।

মনে পড়ছে? কলেরা থেমে গেল। গোটা গ্রামঅঞ্চলে সমাজ-সেবক সমিতির প্রশংসা হল। প্রচুর প্রশংসা। মা পূজনীয়াই ছিলেন। পরম পূজনীয়া হয়ে উঠলেন। আমার তোমার প্রশংসারও শেষ ছিল না।

আমার পার্টির গৌরব বাড়ল। তারা বেশী বেশী মিটিং করতে লাগল। তোমাকে আমাকে অভিনন্দন দিল তারা। লোকে বলতে লাগল—তুমি এবার ইলেকশনে দাঁড়াও।

ওদিকে কংগ্রেস এবং তোমার ছোড়দার পার্টির লোকেরা অভিযোগ তুললে—আমরা সেবা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

যে ডাক্তার এখানে কলেরা-ডিউটিতে এসেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে দরখাস্ত গেল উপরে যে, ডাক্তার বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানের সেবা-কার্যেই সহযোগিতা করেছেন, সাহায্য করেছেন

এবং অন্ত অন্ত প্রতিষ্ঠান যারা সাহায্য চেয়েছে, তাদের কোন সাহায্য দেননি। এ ছাড়াও গ্রামময় দেওয়ালে লেখা হল, মুখে মুখে আলোচনা হতে লাগল—এই প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন হবে না কেন?

সুব্রতর বাবা স্থাপন করেছিলেন—তাঁর মৃত্যুর পর থেকে প্রভাময়ী দেবী প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের খাস তালুক ক'রে রেখেছেন।

এর নির্বাচন হোক।

মা আমার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

—না। না। না। না। বুকের রক্ত দিয়ে একে বাঁচিয়ে রেখেছি। আমার স্বামীর কীর্তির স্মৃতি। আজ পঁয়ত্রিশ বছরে—কত ছেলে এল, কত ছেলে গেল—কেউ আজ মাস্টার কেউ দোকানদার কেউ চাষী কেউ কংগ্রেসী কেউ কিছু সম্পর্ক রাখেনি। আমি বুক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি—এর আবার ইলেকশন কিসের?

এটা আমার গায়েও লেগেছিল। আমিও তো ছেলেবেলা থেকে মায়ের নির্দেশমত সমিতির কাজ করে এসেছি।

সমিতির কাজ ঠিক নয়, মা আমাকে শেখাতেন তাঁর পছন্দমত কাজ। পাড়ায় ইঁদুর-বেড়াল মরে রাস্তার ধারে ধারে পড়ে থাকলে বলতেন, সুবু যাও, ব্রতপালন কর। মরা বেড়ালটাকে পায়ে দড়ি বেঁধে গ্রামের বাইরে ফেলে দিয়ে এস।

কোন অন্ধ কি খঞ্জকে রাস্তায় দেখলে—তাকে কিছুটা সাহায্য করার উপদেশ তাঁর দেওয়া ছিল।

আমাদের বাড়ির খিড়কির পুকুরটার পূবপাড়ে যে বসতিটা এখন দেখ, ওটার মধ্যে ঘরতিনেক বাউড়ির বাস আজও আছে। শম্ভুর বউ তার ছেলে জিতেনকে চেন। জিতেনের টি-বি হয়েছে—তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে সেবা-সমিতি থেকে—আজও মা বাড়ি থেকে তাদের সাহায্য করেন। তুমিও তাকে টাকা দিয়েছ। আজও গ্রামে থাকলে পুকুরের এপাড়ে আমাদের ঘাটে দাঁড়িয়ে হেঁকে জিজ্ঞেস করি—ওরে শম্ভুর বউ, জিতেন কেমন আছে? মতিলালের বউকেও চেন; তার বেটা, বেটার বউকে চেন। বেটার বউটাকে যেদিন ডোমনা চিতিতে কামড়াল—সেদিন রাত্রে ছুটে এসে পড়ল আমাদের বাড়ি। আমিই তার হাতে বাঁধন দিয়ে, গাড়িতে ক'রে পাশের গ্রামের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অ্যান্টি-ভেনম ইনজেকশন দিইয়েছিলাম। তুমি চোখে দেখেছ এসব এবং এসব একালের কথা।

সেকালে ওদের কারুর জ্বর-জ্বালা কি অসুখ-বিসুখ করলে আমি সকালবেলা উঠে ওদের খবর করতে যেতাম। বাড়িতে মা রোগীর খাদ্য সাগু-বার্লি তৈরি ক'রে রাখতেন—ওরা নিয়ে যেত। সেটা বিকেলবেলা। সকালবেলার খাদ্যটা আমাকে নিয়ে যেতে হত।

বারো-তেরো বছর বয়সে আমার বন্ধুরা আমার সঙ্গে এসে জুটে সমাজসেবক সমিতির সেবক হয়েছিল। আমাদের ওই বাউড়ীদের পাড়ায় একবার আগুন লেগেছিল যখন তখনই পত্তন হয়েছিল আগুন-নিবারণী বাহিনীর।

তখন আমরা সেবক ছিলাম আটজন। মা ঘর থেকে পাঁচটি টাকা দিয়ে সাতটি বালতি কিনে পত্তন করে দিয়েছিলেন। তাঁর দেখাদেখি গোটা গ্রাম থেকে চাঁদা উঠেছিল পনেরো টাকা। সেবক আটজন থেকে ক'দিনের মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাইশজন। বালতি কেনা হয়েছিল আরও তেরোটি।

এসব তুমি দেখনি। এসব তুমি জান না। তাই তোমার ভাল লাগেনি আমাদের কথা এবং আমাদের অ্যাটিচুড। তুমি আমাকে দিব্যি বলে উঠলে—এটা কিন্তু অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে।

আমি তোমাকে কটু কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম—হ্যাঁ, আইন তুমি ভাল বোঝ বটে। তোমাদের ঘর ব্যারিস্টারের ঘর। ব্যারিস্টারের মেয়ে, ব্যারিস্টারের বোন। আইন তোমার নখাগ্রে। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়টা ঠিক এত সহজ নয়। নাই বা তুললে ন্যায়-অন্যায়ের কথা।

মুহূর্তে বিস্ফোরণ হয়ে গেল। তুমি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—তুমি আমার বাবা তুললে?

যে আঘাতটা আমি তোমাকে করেছিলাম সেটা শতগুণ হয়ে ফিরে এসে আমাকে আঘাত করলে। আমি স্তম্ভিত হয়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। কিন্তু তোমার কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে পারলাম না।

স্বীকার করলে হয়তো—

না। পরিণাম এই-ই হত। হতে বাধ্য। কারণ সমগ্র পৃথিবীর সকল দেশে সকল সমাজের সকল ঘরেই বোধ করি এই সংঘর্ষ চলছে।

সুতপা, দোষ তোমারও নেই, দোষ আমারও নেই। একালের পৃথিবীর বাতাসে ভালবাসা নেই—একালের অন্নে নেই, একালের জলে নেই; বোধ করি আকাশে সূর্যের আলোতেও নেই। একালের বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে একালের অন্নে বেঁচে থেকে বোধহয় কেউ আর কাউকে ভালবাসতে পারবে না।

হিসেবটা যেন উল্টে গেছে। আগের কালে ভালবাসার হিসেবের ছকটা ছিল বিচিত্র। জমার দিকটায় লেখা হত কতটা দিলাম তার কথা। আর আজকাল জমার দিকে লেখা হয় নিজের পাওনার কথা। একালে সব হিসেব পাওনার হিসেব—আমি কতটা পেয়েছি, আরও কতটা পাইনি, পাওনা আছে - তার হিসেব। কতটা কে পাবে, কতটা কাকে দিলাম—তার কথা নয়।

থাক্। ওই কথাটা কিন্তু মায়ের কানে গিয়েছিল এবং মা আমাকে ডেকে খুব একটা কটু কথা বলেছিলেন। তোমাকে বলেছিলেন—সর্বনাশা অগ্নিশিখা। আমায় বলেছিলেন পাখা-পোড়া পতঙ্গ।

তুমি যদি তাই পারতে সুতপা।

তুমি যদি আমাকে পাবার তপস্যা করতে। আদর্শের চেয়েও যদি আমাকে বেশী ভালবাসতে।

যাক্।

না, যাবে না। তোমাকে আমি অত্যন্ত ভাল বেসেছিলাম।

না, তাতেও যেন সংশয় জাগছে। তা না হলে সেবা-সমিতির থেকে তুমি বড় হলে না কেন?

* * *

সেবা-সমিতির নির্বাচন তোমার কথার পর ইচ্ছে করেই করলাম। আমি করিয়েছিলাম। মা হার্টের রোগী হয়েও সমিতির আপিসে এসেছিলেন। বিচিত্র সংসার, বিচিত্র কাল, নির্বাচনে তোমার দাদাদের পার্টি এবং কংগ্রেস—দু'পক্ষই হাত মিলিয়েছিল আমাদের বিরুদ্ধে।

সারা গ্রামে চাঞ্চল্যের কথা তোমার মনে আছে।

চঞ্চল বোধ করি আমিই হয়েছিলাম সব থেকে বেশী। তুমি গম্ভীর হয়ে বসেই ছিলে। তোমার কাছে বারকয়েকই এসেছিল তোমার দাদার পার্টির ছেলেরা। তারা তোমার দাদার পার্টির ছেলে হলে হবে কি, তারা তো আমার গ্রামের ছেলে। তাদের আমি 'সুব্রতদা'। আমাকে ভাল তারা তখনও বাসত। তারা তোমাকে একটা মিটমাট ক'রে দিতে বলেছিল। তুমি বলেও ছিলে। কিন্তু আমার পার্টির ছেলেরা মিটমাট করতে দেয়নি।

নির্বাচন হয়ে গেল। আমরা জিতলাম এবং সে জয় এমন-তেমন নয়। পনেরো জনের মধ্যে বারো জন। মা হলেন প্রেসিডেণ্ট, আমি সেক্রেটারী। আমি তোমায় বলেছিলাম—দেখলে তো! মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়।

তুমি হেসেছিলে।

এরপরই এসেছিল গ্রামপঞ্চায়েৎ এবং অঞ্চলপঞ্চায়েৎ নির্বাচন। আমার পার্টি কোমর বেঁধে নামল। তোমার দাদার পার্টির লোকেরা কৃষি-শ্রমিক-সমিতি নামে সমিতি খুললে।

আমাকে তুমি বলেছিলে—তুমি অন্ততঃ এই ব্যাপারটায় এসে এদের সঙ্গে দাঁড়াও। ওরা তোমাকে চায়। আমাকে অনেক ক'রে বলে গেছে—সুতপাদি আপনি বুঝিয়ে বলুন ওঁকে।

আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল, খপ করে বলেছিলাম—সম্বন্ধটা পর্যন্ত দেখছি উল্টে দিয়েছে এরা—তুমি দিদি হয়ে গেছ বউদি থেকে।

তুমি হেসে বলেছিলে—সীতাংশু যে দাশগুপ্ত-বাড়ির ছেলে। এ বাড়িটাই যে দাশগুপ্তদের বাড়ি।

এত বড় আঘাত আমি ওই কথাটায় পেয়েছিলাম সুতপা যে, আমার মনে হয়েছিল আমি নিজের মাথায় একটা লোহার ডাণ্ডা মেরে নিজেকে রক্তাক্ত করে ফেলি। তোমার মনে আছে, বারান্দার দেওয়ালের গায়ে পুরনো আমলের দেওয়াল-গিরি টাঙাবার একটা ব্র্যাকেট ছিল, সেটাকে অকারণে চেপে ধরে টেনে ভেঙে ফেলেছিলাম।

তুমি লক্ষ্য করনি। সম্ভবতঃ তুমি তোমার আদর্শের প্রেরণায় সেই মুহূর্তে আর আমার প্রিয়তমা ছিলে না।

তুমি আমাকে বলেছিলে—রোগ হলে মানুষের সেবা কর। পুণ্য নিশ্চয় হয়। কিন্তু সুস্থ মানুষেরা বুক দিয়ে খেটে চাষ করে যে সারা বছরের তিনমাস উপোস করে তিনমাস একবেলা খায়, তিনমাস হয়তো দুবেলা খায় কি খায় না—তাদের কথা একবার ভাববে না? তাদের পাশে দাঁড়াবে না? অন্ততঃ সরকারী আইনে এদের যে ভাগ পাওয়ার কথা তাও তো এরা পায় না। তুমি আমার থেকে অনেক বেশী জান। এদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নিবিড়। এই তো, তোমাদের বাড়িতেই বোধহয় পায় না।

কথাগুলো যা বলেছিলে তা তুমি এই-ই বলেছিলে, কিন্তু বাগ্‌বিন্যাস বোধহয় এমনটি নয়। বড় শুকনো শুকনো ছিল। হয়তো বা জ্বালা ধরানোর মতও কিছু ছিল।

আমি নীরবেই নীচে নেমে আসছিলাম, হঠাৎ কি মতি হল ফিরলাম; সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এসে বলেছিলাম—শোন, দাশগুপ্তদের এ বাড়িতে আমি আর আসব না।

কথাগুলি মা শুনেছিলেন।

বলে দিয়েছিল শিবানীদি। কিন্তু স্থূল কথাটাই সে ধরতে পেরেছিল—জমির ভাগ-সংক্রান্ত কথা যেগুলি সেইগুলি। বাড়ি নিয়ে কথাটা সে ধরতে পারেনি। ওর দোষ কি, তুমিও জানতে না।

মা আমাকে ডেকে বললেন—ওই ভাগ জোতদারদের নিয়ে হাঙ্গামার মধ্যে তুই নামছিস নাকি?

রাগ আমার মায়ের কথাতেও হয়েছিল।

আমি বলেছিলাম—ঠিক কিছু করিনি।

মা বলেছিলেন—বউমা নামবেন বলে নাকি গাছকোমর বাঁধছেন?

আমি বলেছিলাম—যদি নামে?

—তা হলে বলো আমার সঙ্গেই আগে বোঝাপড়া হবে। আমাদের জমিই কৃষাণী ভাগে বিলি আছে। চাষী পায় একভাগ, আমরা পাই দু'ভাগ। শুধু তাই নয় সুব্রত—তোর বউকে খোঁজ নিয়ে দেখতে বল্ যারা সমিতি খুলছে তাদের মধ্যে যাদের জমি আছে তাদেরও সব ওই একভাগ।

সে-সব কথা আমার মাথায় তখন ঢুকছিল না সুতপা, আমার মাথায় ঘুরছিল তোমার ওই কথা—ওই যে—'সীতাংশু যে দাশগুপ্ত-বাড়ির ছেলে, এ বাড়িটা,—এ ভিটে যে দাশগুপ্তদের ভিটে'।

সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে গিছল। তোমার ছোটবৌদি আমাকে জামাইবাবু বললে যত জ্বালা ধরত গায়ে, তার থেকে বেশী জ্বালা ধরেছিল।

আমি ফিরে এসেছিলাম তোমার কাছে।

তোমাকে আঘাত দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে ফিরে এসেছিলাম।

ফিরে এসে দেখি তুমি বারান্দার মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ।

ছুটে ডাক্তার ডাকলাম।

ডাক্তার দেখলেন। চেতনা পেয়ে তুমি উঠে বসেই বললে—আমি কলকাতায় যাব। আজই তুমি ব্যবস্থা করে দাও। Please.

আমি মনে মনে উত্তর আওড়ালাম—বরাবরের জন্য সুতপা। তুমিও বাঁচ, আমিও বাঁচি।

ডাক্তারের সামনে বলতে পারলাম না। ডাক্তার বললেন—হ্যাঁ। আপনি কলকাতায়ই যান। সুব্রতবাবু, এখানে তো যত্ন করবার লোক নেই, আপনার মা তো হার্টের রোগী। বাড়িতে তো ঐ ঝি-টা। অবশ্য ও কলকাতার ঝি। কিন্তু উনি—

ডাক্তার হেসে বলেছিলেন—উনি মা হতে চলেছেন।

আমি চমকে উঠে মুখ তুলে তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম।

তুমি চোখ বন্ধ করেছিলে। কেন তা জানি নে। লজ্জাতে চোখ আপনিই এমন ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে আসে; নারী পুরুষের চোখে চোখ রাখতে পারে না। ঠোঁটের কোণে যে এতটুকু একটু হাসি থাকে, তাকে খুঁজে বের করতে হয়। চোখ বন্ধ হলেও হাসি আমি দেখতে পাইনি সেদিন।

লিখতে লিখতে থেমে গিয়েছিলাম সুতপা।

মনে প্রশ্ন জেগেছিল, প্রশ্ন জেগেছিল—আমি কি হাসির টুকরোটুকু খুঁজে ছিলাম? বিচার করে মনে হচ্ছে—খুঁজিনি।

অবশ্য এটাও ঠিক যে খুঁজলেও পেতাম না। কারণ আমি যেমন হাসি খুঁজিনি, তুমিও তেমনিই ঠিক হাসোনি।

আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলাম।

আসবার সময় কোন কথাই আমি বলিনি। অথচ এমন ক্ষেত্রে বলা উচিত ছিল যে কথাটা—সেটা বোধহয় জিভের ডগায় এসে বসেছিল। ডাইভোর্স তোমারও চাওয়া উচিত ছিল। আমারও চাওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল দুজনের একসঙ্গে আদালতে গিয়ে ডাইভোর্স পিটিশন দাখিল করে আসা।

পারলাম না। আমিও না—তুমিও না।

বিবাহের বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে পিছিয়ে এলাম—দেখলাম, বাঁধনটার উপর কখন আর একটা বাঁধন পড়ে গেছে, দিয়েছি আমরাই দুজনে—দেবার সময় তুমি ধরেছিলে একদিকে—আমি একদিকে।

বাড়ি ফিরতেই মা বললেন—এ তুই কি করছিস সুব্রত? তোর থেকে কি ক্রিয়া-কাণ্ড সব লোপ পাবে রে?—এরপর শ্রাদ্ধও করবি নে—তর্পণও করবি নে?

মনটা বড় অশান্ত পীড়িতই ছিল, বললাম—কি করব মা উঠে গেলে। শ্রাদ্ধ-তর্পণ বলছ—কোন্ শ্রাদ্ধ করিনি? এখন তো নিজের শ্রাদ্ধই করছি অহরহ। আর শ্রাদ্ধ-তর্পণ—১৯৬৫ সালে—কেউ করে নাকি? করলেও কি নিয়মরক্ষের জন্তেই করে না? ওসব আর কি কেউ সত্য বলে বিশ্বাস করে?

মাকে আমার জান।

মা কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের কাছে ঈশ্বর শাস্ত্র ধর্ম যতখানি মিথ্যে, মায়ের কাছে ততখানি সত্যি।

ও নিয়ে ঝগড়া ক'রে লাভ নেই। মানুষের বিচারের অস্তিও যতখানি মিথ্যে, নাস্তিও ততখানি মিথ্যে।

থাক্। কি লাভ তত্ত্ব নিয়ে তর্ক করে! যা হয়েছিল, তাই বলি। তুমি বোধহয় ভুলেই গেছ। ভোলারই কথা। আমাদের বাড়িতে নাড়ুগোপালের মূর্তি আছে: বাড়ির বধূ-কন্যারা অন্তর্বত্নী হলে ওই মূর্তিটির সেবা তারাই করে। সেবা। মন্ত্র-টন্ত্র নেই। গোপালটিকে ফুলুঙ্গীতে রেখে তার সামনে চারবেলা ভোগ দেওয়া, ফুল-চন্দন দেওয়া—এই। এর ওপরে যে যতখানি পারে খেলতে। মা তোমাকে যাবার আগে সেটি দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—আমাদের বংশের এই নিয়ম। আমাব দিদিশাশুড়ীর সন্তান হয়নি, বড় দুঃখ ছিল মনে। তাঁর বাপেরই এই ভিটে। আমার দাদাশ্বশুর ছিলেন পেশাদার কুলীন। পঁচিশ-ত্রিশটা বিয়ে ছিল। তবু এখানে বেশীর ভাগ থাকতেন, যত্নের জন্তে। আমাব দিদিশাশুড়ী স্বামীর সেবাতে নিজেকে ঢেলেও দিয়েছিলেন। কিন্তু সন্তান হয় নি। একবার নবদ্বীপ গিয়ে দাদাশ্বশুর গোপালটি কিনে দিয়ে বলেছিলেন—এর সেবা কর। আমার দিদিশাশুড়ী গোপালকে কুলুঙ্গীতে প্রতিষ্ঠা ক'রে সেবা ক'রে সন্তান কোলে পেয়েছিলেন। তিনিই এই নিয়ম ক'রে গেছেন যে, বউ মেয়ে যে-ই পোয়াতি হবে, সে গোপাল-সেবা করবে সন্তানের অন্নপ্রাশন পর্যন্ত।

মা তোমাকে বলেছিলেন—এটি তুমি নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে। আমার বংশের নির্দেশ হল, তুমি এঁর সেবা করবে যেমন আমরা করেছি। নাও, ধর।

তুমি নিয়েছিলে। আমার মা সিংহাসন, ভেলভেটের টুকরো, রূপোর রেকাবী—পুতুল খেলার সব সরঞ্জাম সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তুমি আসবার সময় সেটিকে ফেলে গিছলে।

আমি বাড়ি ফিরলেই মা অভিযোগই শুধু করেননি, কপালে কয়েকটা চাপড়ও মেরেছিলেন।

তুমি একখানা চিঠি লিখেছিলে দিনচারেক পর। লিখেছিলে আমাকে না, মাকে। লিখেছিলে—গোপাল-মূর্তিটি আমি ফেলে এসেছি। আপনি নিয়ে গিয়ে যেমন আপনার কাছে ছিল তেমনি করে রাখবেন। 'সুব্রত' লিখে, কেটে তার জায়গায় 'আপনার ছেলে' যখন আসবে তখন তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন—লিখেছিলে।

মা বোধহয় তার উত্তর দেননি।

হঠাৎ দেশে দপ্ ক'রে আগুন জ্বলে ওঠার মত আন্দোলন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল। চালের দর ক'বছর ধরেই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে বেড়ে আসছিল।

ধান-চালের ব্যবসাদারেরা যে-চক্র তৈরী করলে—সে-চক্র পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সরকার ভাঙতে পারলে না বা ভাঙলে না। জোতদারদের সঙ্গে, ধান-চালের মহাজন কলওয়ালাদের সঙ্গে, ওদের আঁতাত যেটা সেটা প্রমাণ কেউ করেনি, কিন্তু না করলেও এটা প্রমাণিত সত্য থেকেও বড় সত্য—বেশী সত্য।

তুমি রইলে কলকাতায়। আমি জানি তুমি মিছিলে বের হওনি—কিন্তু সভা-সমিতিতে গিয়েছ। এখানে এরই মধ্যে পঞ্চায়েৎ ইলেকশনে আমরা জিতলাম। কংগ্রেস হারল, তোমার দাদাদের পার্টি হারল।

আমরা বিজয়োৎসব করলাম। বেশ বড় মিটিং হয়েছিল, মা পর্যন্ত এসেছিলেন সভায়, তিনি পতাকা তুলেছিলেন।

তুমি খবর জান, সীতাংশু তোমাকে জানিয়েছিল। খোঁচা দিয়ে একখানা লেটার-পেপারে একটামাত্র কথা—'অভিনন্দন'—নিচে 'সুতপা' লিখে চিঠি লিখেছিলে আমাকে।

তোমার বাবা আমাকে লিখেছিলেন—শুনলাম তুমি পঞ্চায়েৎ ইলেকশন করে জিতেছ। যা করবে কর—পার্টি করো না। এইটেই আমার একমাত্র অনুরোধ। আমি খুব চিন্তিত হয়েছি তোমাদের জন্য।

তোমার চিঠির ব্যঙ্গ আমার অন্তরে এমন জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল যে, তোমার বাবার পত্রেরও উত্তর আমি দিইনি।

শুধু তাই নয়, এম-এ'র খবর বের হল—খবরটা অনুজ্জ্বল নয়। সেকেণ্ড ক্লাস পেলেও, সেকেণ্ড ক্লাসে সেকেণ্ড হইনি—নামটা প্রথমেই ছিল। তোমার বাবার টেলিগ্রাম এল। তুমি একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখলে; যেতেও লিখলে—কিন্তু যেতে যেন উৎসাহ পেলাম না।

তোমার উপর অভিমান? অভিমান বলব না। রাগ—হ্যাঁ রাগ, বিদ্বেষ যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। সে রাগ কত প্রচণ্ড—সে এই খবর থেকেই বুঝবে। আমাদের পার্টির কনফারেন্স হচ্ছিল পাটনায়। আমি বেঙ্গল গ্রুপের একজন—প্রধান। আমি যাব। কলকাতায় এসে নামলাম বেলা দশটায়। ইচ্ছে করেই দশটায় নেমেছিলাম; তার একদিন বা দু'দিন আগে আসতে বাধা ছিল না, কিন্তু আসিনি, কলকাতায় থাকতে হলে তোমাদের ওখানেই থাকতে হবে বলে আসিনি। দশটায় নেমে তোমাদের বাড়ি গিছলাম সাড়ে বারোটায়, আবার সন্ধ্যাবেলা উঠেছিলাম ট্রেনে। ফেরার সময় বর্ধমান থেকে নেমেই চলে গিছলাম সর্বানন্দপুর।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল দুপুরবেলা। কিন্তু তিনটের সময় তুমি বেরিয়ে চলে গিছলে তোমার ছোটবউদির সঙ্গে।

এ নিয়ে কোন কথা তুমিও বলনি, তবে অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলাম—একটা

পারাবার আমাদের দুজনের মধ্যে এবং সেটা নিরন্তর আয়তনে বেড়েই চলেছে।

যে কথা ক'টা হয়েছিল—তা নিশ্চয় তোমার মনে আছে? তুমি বলেছিলে—এম-এ তো হল—এবার শেষ কর। বাবা বলছেন—সুব্রতর জন্যে এবার ভাবনা হচ্ছে আমার। পার্টি-পার্টি করে শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট না করে। অ্যাসেম্বলী ইলেকশনে দাঁড়াবে নাকি? মনে আছে? বলেছিলাম—পার্টি বললে দাঁড়াতে হবে বইকি!

তুমি বলেছিলে—তোমাদের এ কনফারেন্সে তো তারই আয়োজন?

—হ্যাঁ।

কনফারেন্সে তারই আয়োজনই বটে।

সারা দেশ জুড়ে তারই আয়োজন প্রবল উদ্যমে শুরু হয়েছে। সামনের দুর্গাপূজোর বারোয়ারীর মধ্যে তারই আয়োজন। এখানে ওখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে তারই আয়োজন।

রাজনৈতিক মিছিল আর সভার তো শেষ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে ইস্কুলে ছাত্র-আন্দোলন চলছে।

খাদ্য-আন্দোলন হচ্ছে তীব্র থেকে তীব্রতর। পনেরো-ষোল টাকা মণ থেকে পঞ্চাশ টাকা চালের মণ যখন হল তখন আগুন জ্বলল—তারপর চার টাকা সের ১৬০ টাকা মণ হল চালের। আগুন আর নিভল না। কলকাতা শহরে সপ্তাহে সপ্তাহে ট্রাম-বাস বন্ধ হচ্ছে, ব্যারিকেড দেওয়া হচ্ছে; ট্রামে-বাসে আগুন লাগছে। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে পথের দুধার। বিপ্লব বিপ্লব বিপ্লব। এরই মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে বাধল ভারতবর্ষের সংঘর্ষ। পাকিস্তান আক্রমণ করলে ভারত সীমান্ত, কিন্তু হঠতে হল। ভারতবর্ষের সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতরে প্রবেশ করলে।

সারা দেশে কংগ্রেস স্ফীত হয়ে উঠল।

জানুয়ারী মাসে তাসকেন্দে রাশিয়ার আহ্বানে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের জিত পালাটা আপসে মিটিয়ে নিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীজী মারা গেলেন।

ইন্দিরাজী প্রধানমন্ত্রী হলেন।

সারা ভারতবর্ষে—দিনের পর দিন প্রতিটি দিন—মানুষ অনুভব করতে লাগল—সময় হয়েছে; কংগ্রেসের যাবার সময় হয়েছে; জীর্ণ হয়েছে কংগ্রেস; অন্যায়ে ভরে গেছে কংগ্রেস; ভারতবর্ষের সাধারণ দরিদ্র মানুষকে বঞ্চনা করেছে এরা। এর প্রতিকার করবার জন্য আহ্বান এসেছে—কালের আহ্বান। যেমন আহ্বান এসেছিল পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের পর কুরুক্ষেত্রের পূর্ব সময়টিতে। সেই এক কথা 'ধর্মসংস্থাপনার্থায়—সম্ভবামি যুগে যুগে।'

আজ মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে কেন—স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছি—এর সবটা মিথ্যা, সবটা প্রবঞ্চনা।

আবার মনে হচ্ছে—না। তা নয়। সত্য আছে বইকি—এরই মধ্যে। সব পার্টিই এক-একটি আদর্শের সত্যকে সামনে রেখে এগিয়ে আসছিল এই সঙ্কট-মুহূর্তে। মানুষের সেবা করবে—দেশের সেবা করবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ছে সুতপা। 'আমার জীবনে জীবন লভিয়া জাগ রে সকল দেশ।' এ আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে আশ্চর্য সত্য।

তারই সঙ্গে বিচিত্র বৈষম্যে—ঠিক এরই সঙ্গে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারা দেশের উপর, মানুষের উপর কর্তৃত্বের অধিকার, নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা, অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য, সম্মান। এই মুহূর্তে চোখের উপর ভেসে উঠছে—ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণের সেই বক্তৃতা দেওয়া মুখচ্ছবিখানি।

তারও পিছনে যখন তাকাই, তখন চোখে পড়ে দল। অন্ধ জনতার দল। যখন দলের দিকে তাকাই—তখন মনে হয়—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বলার মধ্যে 'ইতি গজ' শব্দ দুটি উচ্চারণের সময় কণ্ঠস্বর মৃদু করার যে মিথ্যাচারের জন্য যুধিষ্ঠির নরক-দর্শন করেছিলেন, সেই মিথ্যাচারের পাপ জমা হয়ে আছে ওখানে। ওই পাপের জন্য সব পুণ্যব্রত ব্যর্থ হবে, সব সত্য মিথ্যা হবে। মনে হয় ওই অরণ্যের অন্ধকারে গাছের আড়ালে রাবণ দাঁড়িয়ে আছে।

তোমার আমার জীবনের কথাও মনে হয়েছিল সুতপা। কিন্তু তখন আর ভাববার অবকাশ ছিল না। সেখানেও ওই মতবাদের বিবাদ কলির মত আমাদের সব বন্ধন কেটে ফেলবার জন্য ওই অরণ্য থেকেই ছুরি এগিয়ে দিয়েছিল।

* * *

নল-দময়ন্তীর কথা সুতপা। তুমি জান নিশ্চয়। নল আর দময়ন্তী কলির চক্রান্তে সব হারিয়ে বনের মধ্যে যখন একখানা কাপড়ের দুই প্রান্ত দুজনে পরে পরস্পরকে যখন পরস্পরের কাছে বেঁধে রেখেছে, সেই সময় একদিন গাছের ছায়ায় দময়ন্তী ঘুমিয়ে আছেন, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন—বেঁধে তো রেখেছি স্বামীকে, স্বামী মুখের দিকে তাকিয়ে, গভীর মমতার সঙ্গে মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন—আমার জন্যই দময়ন্তীর এই দুর্ভোগ। কলির যত আক্রোশ আমার উপর, দময়ন্তীর উপর তো নয়।

কে যেন বলেছিল—মনের কানে কানে—সুতরাং তুমি ওর সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন কর। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার থেকে একখানা শাণিত ছুরিকা কেউ এগিয়ে দিয়েছিল।

আমাদেরও হল তাই।

খোকা হল।

খোকার নাম তোমার বাবা রাখলেন—আনন্দ। আনন্দময়।

আমার মায়ের আর খুশীর শেষ রইল না। কি সুন্দর নাম। আনন্দময়। খোকার ডাকনাম হয়ে গেল দুটো।

তোমরা—তুমি, তোমার ছোড়দা—নাম রাখলে গব্বী।

আমি নাম রাখব ভেবেছিলাম—শিবা। অর্থাৎ শিবাজী।

ইলেকশনের মুখ তখন। আমার যাবার তো খুব সময় ছিল না। কলকাতায় পার্টি আপিসে গেলেও তোমাদের বাড়ি যাই নে। ওদিকে তোমার ছোড়দা, তোমার ছোটবউদি, তাঁদের গানের দল নিয়ে ওখানকার ওদের দলের ক্যাণ্ডিডেটের প্রপাগাণ্ডা ক'রে এল।

আমিও একবার ডাকলাম না ওদের, ওরাও একবার এল না আমাদের বাড়ি। এ সত্ত্বেও হয়তো মারাত্মক কিছু হত না, যা তোমার আমার জীবনটাকে এমনভাবে, দুদিকের দুই দূরান্তর কোন ঘাটে কি মাঠে ফেলে দেয়। কিন্তু আমি হারলাম। জিতল সীতাংশু, তোমার দাদাদের পার্টির ক্যাণ্ডিডেট এবং তোমার দাদাদের জ্ঞাতিও সে।

যখন খবরটা পাকা হয়ে গেল—অর্থাৎ সদরে ভোট-গণনা শেষ হয়ে যে-মুহূর্তে ডিক্লেয়ার্ড হল—সীতাংশু দাশগুপ্ত নির্বাচিত, সুব্রত হেরেছেন, দু'শো ভোটের ব্যবধানে—সেই মুহূর্তে ফট্ ক'রে আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল তোমার মুখ, আর কানের কাছে তুমি যেন বললে—সীতাংশু যে দাশগুপ্ত। বাড়িটা যে দাশগুপ্তদেরই ছিল।

সীতাংশুরা আমাদের বাড়িটার—

না, আমাদের বাড়ি বলব না। তোমাদের বাড়ি বলাই ভাল। আজ এই মুহূর্তে তোমাকে আমার প্রিয়তমা ভাবতে গিয়েও তা ভাবতে পারছিনে। তার থেকে তুমি আমার বিরোধীদের আত্মীয় অন্তরঙ্গ ভেবে দুঃখ-বেদনা অনুভব করে আনন্দ পাচ্ছি।

সীতাংশুরা তাদের বিজয়-মিছিলটা বের করেছিল তোমার বাড়ির সামনে থেকে। ইলেকশনের সময় তোমার দাদা যখন এসেছিলেন, তখন তুমি চিঠি লিখেছিলে—দাদা যাচ্ছেন—তোমার বিরুদ্ধেই বক্তৃতা করতে, তবুও ওঁর থাকবার ব্যবস্থা তুমি আমাদের বাড়িতেই করো। বাইরের ঘরখানায় থাকতে দিয়ো। ঘরখানার চাবি সীতাংশুর কাছেই ছিল। ফেরত দেয়নি। মধ্যে মধ্যে বাইরের লোক এলে ওরা এখানেই এনে বসাত। ঘরখানার চাবি তোমার দাদাই সীতাংশুকে দিয়েছিলেন। আমাকে বলেছিলেন—তুমি তো বাড়িখানা প্রায় বন্ধই রেখেছ। তোমার নিজের আপিস তো অন্যত্র। এই ঘরখানা সীতাংশু ব্যবহার করলে আপত্তি করবে না নিশ্চয়?

আমি আপত্তি করিনি। মনে মনে অনুমান করেছিলাম, এ কথাটা আমাকে বলতে তুমিই তোমার দাদাকে বলেছ।

থাক্।

সেদিন বিজয়-মিছিল ওরা ওখান থেকেই বের করেছিল। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম আমার বাড়ির দোরে। বোমার পর বোমা ফাটাচ্ছিল—আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি অবশ্য লজ্জাবোধও করিনি—হেরে যাওয়ার মধ্যে যে একটা দুঃখ থাকে—তাও ছিল না। কারণ সীতাংশু আমাকে ঠিক হারায় নি। আমাকে হারিয়েছিল কংগ্রেসের ক্যাণ্ডিডেট প্রমথ ঘোষাল। এককালের জমিদার ওরা। সেই ইংরেজ আমল থেকে ওদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বিরোধিতা করেছেন আমার বাবা, তারপর আমার মা—এঁরাই তখন কংগ্রেস ছিলেন।

সেন-ঘোষদের আমলে এরা এসে ঢুকল কংগ্রেসে এবং প্রমথ যখন বুঝল সে কোনক্রমেই জিতবে না—তখন আমার কাছে হারতে চাইল না, সীতাংশুকে জিতিয়ে তার কাছে আমাকে হারিয়ে নিজে হেরে গিয়েও খুশী হল। তার নিজের কতকগুলো নিশ্চিত ভোট সে সীতাংশুকে দিতে বলেছিল। সেই কারণেই আমার লজ্জা হয়নি সেদিন। রাগ হয়েছিল। প্রচণ্ড রাগ—নিষ্ঠুর ক্রোধ। প্রমথর উপর নয়। সীতাংশুর উপরও নয়। হয়েছিল তোমার উপর, তোমার দাদার উপর।

মা আমার বক্তৃতা-করা মেয়ে। হার্টের রোগী। কখন বুক চেপে ধরতে হবে বলে সাবধানে থাকেন, বেশী কথা বলেন না, চীৎকার করে তো নয়ই। মা আমার আস্তে আস্তে বাছা বাছা কতকগুলি কথা আমাকে বলেছিলেন। সব তোমার প্রসঙ্গ নিয়ে।

আমি কলকাতায় এসেছিলাম অনেকটা বিভ্রান্তের মতো। মতির কোন স্থিরতা ছিল না। প্রথম সংকল্প ছিল, তোমাকে এসে বলব—আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। যদি বল তো আমার সন্তানকে আমায় দাও, আমি নিয়ে যাব—মাকে দেব আমার, তিনি পারেন তো বাঁচাবেন। না বাঁচে তো জানব অদৃষ্টে ও সৌভাগ্যবান। যে দুর্ভাগ্যের মধ্যে ওর মা-বাপ দুজনেই ওকে ছুঁড়ে ফেলবে, তার সত্য স্বরূপটার সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই ও মুক্তি পাবে।

হাওড়ায় নেমে অজয় মুখার্জির কলকাতা-প্রবেশের সেই আশ্চর্য মিছিল দেখে সব ভুলে গিয়েছিলাম। অজয়বাবুর সেদিনের জীপের উপর দাঁড়ানো মূর্তি দেখে মনে হয়েছিল এ মানুষটি হয়তো পারবে। দু-দু জায়গায় অজয়বাবু জিতেছেন। আরামবাগ—তমলুক। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সেন হেরে গেছেন। আরামবাগে—সেনের সমর্থনে কে যেন বলেছিল—অজয়বাবুকে বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

পার্টি-আপিসে গিয়ে সেখানেই বসেছিলাম--রাত্রি দশটা পর্যন্ত। পার্টি-আপিস তখন বেশ জমাট এবং উত্তপ্ত। কংগ্রেসের মেজরিটি হয়নি। সমস্ত ছোট পার্টিরা এক হয়ে যুক্ত-ফ্রণ্ট তৈরী হবে।

পার্টির আপিসেই কে যেন বললে—নিচে রাস্তায় গাড়িতে তোমার শ্বশুর দাঁড়িয়ে আছেন। তোমায় ডাকছেন।

বুকের ভিতরটায় আগুন জলে উঠেছিল। তবু নিচে নেমে এলাম। মানুষটিকে শ্রদ্ধা করি তো। তিনি হাত ধরে বললেন—এস। তুমি এসেছ আমি জানি। এদের এখানেই বলা ছিল আমার। আমি প্রত্যাশা করছিলাম। কিন্তু দেরি দেখে বুঝলাম, তুমি—, এস।

পথে বললেন—এমনি একটা কিছু হবে আমি জানতাম।

একটু পর আবার বললেন—তোমরা দুজনে পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করেছ। যখন প্রথম শুনলাম কানাঘুষো বউমাদের মধ্যে যে তোমাদের মধ্যে ইন্টিমেসি একটা চেহারা নিচ্ছে, তখন সুতপাকে আমি বলেছিলাম—এ বোধহয় ঠিক হবে না সুতপা। তবে তোমার

উপর একটা ভুল ধারণা ছিল, ভেবেছিলাম তুমি যাই হও তুমি ব্রাহ্মণ-বাড়ির ছেলে এবং বিধবা মা রয়েছেন—তুমি বৈদ্যের মেয়ে এবং বিলেত-ফেরত বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসবে না। যখন তোমরা বিয়ে করে আমার কাছে এলে, তখন বোধহয় আমি তোমাদের বলেছিলাম, আমি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি সুব্রত। সুতপা তুমি দুজনের কাছেই সে দুঃখ পেলাম আমি—তোমরা ভালবেসে বিয়ে ক'রেও ভালবাসাকেই সব থেকে ওপরে তুলতে পারলে না।

একটু পর বললেন—সুতপা কিন্তু খুব দুঃখ পেয়েছে। বড়বউমা বলছিলেন—খবরটা শুনে ও কেঁদেছিল।

তারপর বলেছিলেন—তুমি তো একটাও কথা বলছ না সুব্রত।

এবার কথা বলতে হয়েছিল আমাকে। বলেছিলাম—কি বলব বলুন?

আমার কি বলা উচিত বা আমাব কাছে উনি কি শুনবার প্রত্যাশা করেছিলেন তা তোমাব বাবার মত ব্যারিস্টারও বলতে পারেননি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তুমি পলিটিক্স ছেড়ে দাও সুব্রত। আমার অনুরোধ—আমার উপদেশ—যাই বল।

আমি তৎক্ষণাৎ বলেছিলাম—আমাকে ক্ষমা করবেন, তা আমি পাবব না।

কেন বলেছিলাম তা বলতে পারব না।

উনি বলেছিলেন—তা হলে দেশকে সামনে রেখে কর। পার্টিকে মাথার উপর বসিয়ো না।

তুমি আমার সামনে কেঁদেছিলে।

চোখের জল অনেক কঠিন নিষ্ঠুরতাকে গলিয়ে নরম ক'রে দেয়। অনেক অন্যায়-ন্যায়ের হিসেবনিকেশ ধুয়ে-মুছে জীবনেব খাতার পাতা আবার সাদা ক'রে দেয়। নতুন হিসেব পত্তন করবার আশ্চর্য সুযোগ সেদিন যেন এসেছিল।

সেদিনের দুটো কথা আমার মনে আছে। তুমি বলেছিলে—খোকাকে—শিব্বা, তুই কথা কইবিনে। যাবিনে ওর কোলে। তোকে দেখতে এসেছিল সেই কবে। তারপর আর আসেনি।

আমি আশ্চর্য হয়ে গিছলাম। বলেছিলাম—ওর নাম তো তুমি গর্কী রেখেছ।

তুমি বলেছিলে—তুমি তো শিব্বা বেখেছ। বাবা বললেন—তুমি সুতপা ওকে শিব্বা বলবে। ওর মামা-মামীরা গর্কী বলবে।

আর একটা কথা অক্ষয় হয়ে আছে মনে। তুমি বলেছিলে—তুমি হারবে এ আমি ভাবিনি।

বলেছিলাম—কেন?

তুমি বলেছিলে—তোমার হারবার কথা নয়। মানুষের যে-সেবা তুমি কর, ক'রে

আসছ, তাতে তোমার হারার মানে মানুষ অকৃতজ্ঞ, অথবা নির্বোধ।

সারারাত্রি সেদিন দুজনে কল্পনা করেছিলাম—আগামী ইলেকশনে আবার দাঁড়াব। স্থির করে ফেলেছিলাম পলিটিক্সকেই জীবনের পেশা হিসেবে গ্রহণ করব। সর্বানন্দপুরের এলাকাই হবে আমার কর্মভূমি। তবে পার্টি নয়। দেশকে সামনে রেখে স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে দাঁড়াব।

পরদিন সকালে উঠে মনে হয়েছিল আমরা বুঝি নবজীবনে জেগে উঠলাম।

তোমার বাবা বলেছিলেন—দেরি কোর না। তোমরা দুজনেই ফিরে যাও ওখানে। দুজনে মিলে কাজ আরম্ভ কর। United front হচ্ছে বটে, কিন্তু এ থাকবে না। কংগ্রেস একে ভাঙবেই।

ঠিক এই সময়েই এসেছিলেন বামপন্থী নেতারা তোমার বাবার কাছে। উল্লাসের আর শেষ ছিল না তাঁদের।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

কতজন নিয়ে মন্ত্রিসভা তৈরী হবে, কোন্ দল ক'টা মন্ত্রিত্ব পাবেন, তাই নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন ওঁরা।

তুমি জিনিস গুছিয়ে নিচ্ছিলে।

তোমার ছোটবউদি এসেছিলেন ছুটে—এই সুতপা ভাই, তুমি এ সময় কোথায় যাবে। বাঃ—আমি এখন গানের দলে লোক পাব কোথায়? চারিদিকে তো মিটিং হবে এখন—।

আমাকে দেখতেই পেলেন না তিনি।

তুমি বলেছিলে—তোমার লোক তুমি অনেক পাবে। আমাকে যেতেই হবে।

* * *

আমরা ফিরে এসে নতুন করে ঘর পাতলাম।

দুজনে মিলে একটা কর্মসূচী তৈরী করলাম। রাজা-প্রজা নেই—উঠে গেছে, ধনী-দরিদ্রও থাকবে না। হিন্দু মুসলমান কৃশ্চান বিরোধ থাকবে না। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ শূদ্র ভেদ থাকবে না। অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার থাকবে না। দেশে রোগ থাকবে না, অজ্ঞানতা থাকবে না। মা আমার প্রাণ দিয়ে সায় ঠিক দেন নি, তবু তিনি বিবেচনা ক'রে এটাকে গ্রহণ করেছিলেন। খুশী হয়েছিলেন মা। আমরা যখন এসে নেমেছিলাম—খবর না দিয়ে এসে পড়েছিলাম—মা তোমাকে দেখে গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন। সে গম্ভীর মুখ দেখে সে-সময় পর্যন্তও আমি ভয় পেতাম। কিন্তু খোকাকে কোলে টেনে নিয়ে জুড়িয়ে গিয়েছিলেন মুহূর্তে। এর উপর সমস্ত বিবরণ শুনে মা খুশী হয়েছিলেন। তাঁর গম্ভীর মুখ হাসিতে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল।

তোমার কর্মক্ষেত্রের একটা খসড়া ছকে দিয়েছিলেন। মা সংগঠন করতে জানতেন। বয়স্কা মেয়েদের ইস্কুল করে দিয়েছিলেন। মেয়েদের মধ্যে কাজ করবার জন্তে গ্রামের মেয়েদের নিয়ে তোমার একটা দলও ক'রে দিয়েছিলেন। বড় আনন্দে ছিলাম কয়েকটা

দিন। মা খোকাকে নিয়ে খেলায় মাতলেন। আমাদের দুজনকে ওখানে কাজ করবার ভার দিয়ে এগিয়ে দিলেন সকলের মধ্যে। বেশ ছিলাম। পার্টি থেকে তুমিও বাইরে ছিলে, আমিও ছিলাম।

ওদিকে ইউনাইটেড ফ্রন্ট তৈরী হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন অজয়বাবু, সহকারী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু। এ ছাড়া সব অকংগ্রেসী দল থেকে একজন না একজন। আমার পার্টি মন্ত্রীত্ব পায়নি। ডেপুটি মিনিস্টারিত্ব পেয়েছিল। সভ্যও মাত্র দুজন। উল্লাসে উৎসাহে দেশের একটা অংশ যেন ফেটে পড়ল। সে যে কি হৈ-হৈ, কি উৎকট উত্তেজনা, তা আর কি বলব। তোমার তো মনে আছে। আমাদের ওখানে মিটিং হয়েছিল—আমরা ইউ. এফ-কে স্বাগতঃ জানিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এক দুর্যোগ আসন্ন হয়ে উঠল।

ধর্মঘট আরম্ভ হল—তার সঙ্গে ঘেরাও। কল-কারখানা বন্ধ হতে শুরু করল। গ্রামে গ্রামে মিছিল, সে কি মিছিল। খালি গা, খালি পা—কোমরে কারুর ধুতি, কারুর হাফ-প্যাণ্ট—কাঁধে গামছা, কালো রং— হাতে লাঠি-ঝাণ্ডা—গলায় বিকট চীৎকার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কলে গিয়ে ধান আটকাল, রাস্তায় লরী-বোঝাই খাদ্য আটকাল, স্টেশনে স্টেশনে পলিটিকাল স্লোগান দিয়ে এরা যাত্রীদের মাল নিয়েও টানাটানি আরম্ভ করলে। মা আমার সইতে পারেননি। গোটা ভদ্রপাড়ায় একটা সন্ত্রাস যেন থম থম করছিল। সমস্ত কিছুর বিধাতা তখন সীতাংশু। কংগ্রেসের ঘোষাল তখন দেশ ছেড়ে চলে গেছে কলকাতা। আমাদের বাড়ির সামনে মিছিল এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেঁচায়।

কোথা দিয়ে কি যে বেরিয়ে আসে—সেই পরীক্ষিৎকে ব্রাহ্মণের দেওয়া ফলের মধ্য থেকে কীটের আকারের বিষধর তক্ষক—অথবা কি থেকে যে কি হয় তা বলতে মানুষ পারে না—তবে যা হয় বা যা বেরিয়ে আসে—তা আজ না হোক, কাল হোক বা পরশু হোক, বেরিয়ে আসতই। তোমার এবং আমাদের মধ্যে যে বিরোধ যে পার্থক্য, তা আবার মাথা-চাড়া দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে সেদিন।

সীতাংশুরা একটা বিরাট মিছিল বের করেছিল। গ্রামের গ্রামদেবতা কালীতলায় সেদিন জ্যৈষ্ঠমাসে ফলহারিণী কালীপুজো। গ্রামের জগা চৌকিদার হাড়িকাঠ পুঁতবার সময় কাশতে কাশতে সর্দি তুলে থু ক'রে ফেলেছিল মাটিতে, কিন্তু মাটিতে পড়বার সময় খানিকটা পড়েছিল হাড়িকাঠে, খানিকটা পড়েছিল মাটিতে। সেই কারণে হরু চাটুজ্যের ছেলে মণি তার মাথায় মেরেছিল একটা চড়। কিছু জরিমানাও করেছিল তার। একটা টাকা আদায় ক'রে এক ব্রাহ্মণকে দিয়েছিল, সে পুকুরঘাট থেকে জল এনে হাড়িকাঠটি ধুয়ে দিয়েছিল। মিছিল বের হল সেই কারণে, মিছিলের পুরোভাগে সীতাংশু। দাবী—মণি চাটুজ্যেকে ওই চৌকিদারের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এক টাকার বদলে পাঁচ টাকা দিতে হবে।

টাকা শেষ পর্যন্ত কমে দু টাকা হয়েছিল। কিন্তু যে লাঞ্ছনাটা মণির হয়েছিল, সেটা

অত্যন্ত করুণ। ওই কালো ধূলিধূসর দেহ নগ্নগাত্র নগ্নপদ মানুষগুলি—যারা কখনও 'কোন উঁচু কথা কয় না—তারা মণি চাটুজ্যের কান মলে দিলে এবং মাথায় চড় মারলে।

মা বারান্দা থেকে দেখে চীৎকার করে উঠেছিলেন। তাঁর হার্টের ব্যারামটা সেদিন নতুন করে চাগাল। আমি মণিকে আমার নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে শেষ পর্যন্ত বের ক'রে আনলাম। চড়-চাপড় আমিও খেলাম। কিন্তু আমার দল ছিল। হয়তো তার উপর, তুমি আমার স্ত্রী—তাই আরও কিছু ঘটেনি, পিছু হটেছিল দলটা। কিন্তু আমাদের জীবনে মেরামত-করা মেঝের তলায় যে সাপটা লুকিয়েছিল, সেটা বেরিয়ে পড়ল। আমি ফিরে আসতেই তুমি তিরস্কার করলে—তুমি কেন গেলে এর মধ্যে? তোমায় যদি ওরা মারত?

আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম—বল কি তুমি? মণিকে তা হলে কি রাখত ওরা?

—না রাখত—যেতো মণি।

—যেতো মণি? বলছ কি?

—শুনতে ভাল লাগছে না, কিন্তু মনে রেখো এটা বিপ্লবের সময়। ঐরকম হবেই। তুমিও চেয়েছ একদিন বিপ্লব।

আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম—না-না-না। এই ধরনের অনাচার অত্যাচার বিপ্লব নয়—এ আমি চাইনি।

পরদিন সকালে তুমি হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালে—হাতে স্বামীজীর সেন্টিনারী ভল্যুমের একটা ভল্যুম। তোমার হাতে বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলীর একখানা দেখে খুশী হয়েছিলাম। বলেছিলাম—কি কাণ্ড! বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী হাতে।

—তোমাকে একটু শোনাতে এসেছি। মানে বুঝতে চাই।

—কি, পড়?

তুমি পড়েছিলে—'তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি।...ভূত ভারত শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না?'

তুমি পড়ে গেলে, আর আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তোমার মুখের দিকে। তোমার পড়া শব্দগুলির সঙ্গে বুকের ভিতর যেন কে একটা ভারী লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করছিল। তুমি পড়ছিলে—'তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে থেকে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে। ভুজাওয়ালার উনানের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে হাট থেকে বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'

তুমি পড়েই যাচ্ছিলে।

তুমি যে মানেটা বুঝতে চাচ্ছিলে তা ততক্ষণে আমার বোধগম্য হয়েছিল। বুঝতে আমার বাকী ছিল না।

আমি বলেছিলাম—ওর কোন্ মানেটা বুঝতে পারছ না তুমি ?

তুমি বলেছিলে—কাল যে ঘটনা ঘটল তা দেখে এমন করে ভয় পেলে কেন ?

বলেছিলাম—ভয় তো পাইনি। ভয় যদি পাব, তবে মণিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আগলালাম কেন ? তবে হ্যাঁ, সীতাংশুর ঝাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে রণতাণ্ডবে ধেই ধেই ক'রে নাচিনি। আর জগা চৌকিদারের ওই ভাবে বেপরোয়া হাড়িকাঠে থুতু ফেলাটাকে একেবারেই যেন কিছু নয় বলে মনে করছ কেন ? জগা চৌকিদার যে মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় কাজ করতে এসেছিল—এটা তো শুনেছ—তাকে তো টলতে আমি চোখে দেখেছি। গন্ধও এসেছে আমার নাকে। মণিকেই তো শুধু বাঁচাতে যাইনি—দুপুরবেলা জগাকে যখন শাসন করছিল মণি—তখনও আমিই গিয়ে ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেই কারণেই মাত্র পাঁচ টাকা জরিমানা মকুব হয়ে দু টাকা হয়েছিল। টাকাটা নগদও দেয় নি জগা। জগা কালীপুজোর বলির যে দুটো ঠ্যাং পায়—সেই দুটো দু টাকা মূল্যে জগা নিজেই জরিমানা স্বরূপ দিয়েছিল।

তুমি ফট করে বলে উঠেছিলে—পুজো পুজো করে আর কতকাল তোমরা এই ধরনের মাতামাতি করবে ? জগা মদ খায়—ওদের নিচুজাত ছোটলোক বলে চেপে রেখেছি—ও চৌকিদারের কাজ করে, মদ ওরা হয়তো মণিদের হুকুমেই চোলাই করেছে এবং সেই মদ খেয়েছে। হাড়িকাঠ জগাই পুঁতেছে। ওর ওই মদ-খাওয়া হাতেই পুঁতেছে। গঙ্গা নেয়ে বামুনের ছেলে মণি তো পুঁততে আসেনি। তাতে একটু থুতু ফেলতে গিয়ে ছিটকে একটু কাঠটায় লেগেছে—কি হয়েছিল মহাভারত অশুদ্ধ তাতে ? ওই মাটির ঠাকুর পুজোয় তুমিও বিশ্বাস কর না—আমিও করি না—মণিও করে না। আমি হলপ ক'রে বলতে পারি—

কখন যে মা এসে দাঁড়িয়েছিলেন দরজার মুখে—তুমিও দেখনি, আমিও দেখিনি। খোকা তাঁর কোলে ছিল, সে কেঁদে উঠে আমাদের জানিয়ে দিল তাঁর অস্তিত্ব। আমি চমকে উঠে, উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

তুমিও চমকে উঠেছিলে।

মা খোকাকে তোমার কোলে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—'ঘি দিয়ে ভাজো নিমের পাত —নিম না ছাড়ে আপন জাত।' আমার কপাল।

তুমি বোধহয় মর্মান্তিক ভাবে বিদ্ধ হয়েছিল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠেছিলে—কি বললেন আপনি ?

মা বলেছিলেন—যা বলেছি তা তো শুনেছ।

তুমি বলেছিলে—কেন এ কথা বললেন ?

মা বলেছিলেন—স্বামীজীর বাণী পড়ে শোনাচ্ছিলে। স্বামীজী বলেছিলেন—ভারতবাসী আমার ভাই—ভারতবাসী আমার প্রাণ—ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর—

তোমাকে আজ আমি সহস্র ধন্যবাদ দিই। তবে সেদিন তোমার সে তেজস্বিতা আমার অত্যন্ত কটু ঠেকেছিল—নিদারুণ ঔদ্ধত্য বলে মনে হয়েছিল, তুমি মুহূর্তে তোমার স্বরূপের সকল আবরণ টেনে ফেলে দিয়ে বলেছিলে—আমি ঈশ্বর মানি না, দেব-দেবী

দূরের কথা।

মা বলেছিলেন—সুব্রত তো ঈশ্বর মানে বলেই আমি জানি।

আমাকে উত্তর দিতে হয়নি—তুমিই বলেছিলে, হ্যাঁ ও মানে। কিন্তু তা নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়নি এবং হবার কথাও নয়—

মা বলেছিলেন—হলে ?

তুমি বিভ্রান্তের মত উত্তর দিয়েছিলে—হলে।

মা বলেছিলেন—হ্যাঁ, আজ তো এই হল। বল তোমাদের উত্তর ?

তুমি নিরুত্তর হয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিছলে। আমিও হতভম্বের মত দাঁড়িয়েছিলাম।

ঈশ্বর মেনেও যে ফল—ঈশ্বর না মেনেও ফল সেই একই রকম। ঈশ্বর যারা মানে তারাও মরবার সময় 'হে ঈশ্বর বাঁচাও' বলে ডাকে, কিংবা বলে 'হে ঈশ্বর পায়ে ঠাঁই দাও'; আর যারা না মানে, তারা ডাক্তারকে বলে 'ডাক্তার আমাকে বাঁচাও', নইলে ডাক্তারকেই বলে 'আমাকে পীসফুলি মরতে দাও ডাক্তার'।

এই পর্যন্ত।

কিন্তু এই নিয়ে দ্বন্দ্ব যে আজও মেটেনি। কোনকালে হয়তো মিটবে না। তবে 'হে ঈশ্বর পায়ে স্থান দাও' বলে মরার মধ্যে অসীমসমুদ্রে একটা ভাঙা ভেলা পাওয়া যায়। তা নিয়ে তোমার কোন আকর্ষণ তো ছিল না, আমারও যে খুব একটা ছিল, তা ছিল না। সেই কারণেই বোধ করি কোনরকম জোড়াতালি দিয়ে আমাদের জীবন চলেছিল; এবার কিন্তু সে দ্বন্দ্বটা এমনই কঠিনভাবে উগ্র হয়ে উঠল যে, মনে হল আমাদের মিলিত জীবন—যেটা একটা ঘাসে-লতায় গাছের পাতায়-ফুলে সমৃদ্ধ একটি পাহাড়ের মত মাথা তুলে উঠেছিল—সেটা হঠাৎ একটা আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে।

আমার ঈশ্বর আছে এবং তোমার ঈশ্বর নেই—এই নিয়ে যে ঝগড়াটা হল, তার মধ্যে সব থেকে বড় ফাঁকি হল এই যে, আমিও কোন দিন ঈশ্বর খুঁজলাম না, তুমিও কোন দিন ঈশ্বর নেই এ সম্পর্কে কোন গভীর গাঢ় চিন্তা করলে না। সাধারণ জীবন হলে এমনটা ঠিক হত না। ছোটখাটো ঝগড়াঝাঁটি করে সারাজীবনটা কাটিয়ে শেষজীবনে আজকাল যেমন রিটায়ার করা চাকুরেরা বাত নিয়ে পড়ে থাকেন আর তাঁর স্ত্রী পূজোর আসন পাতেন তেমনি ভাবে আমাদেরও কাটত। কিন্তু এর পিছনে তোমার রাজনৈতিক সচেতনতা, আর আমার মধ্যে আমার রাজনৈতিক সচেতনতা দাঁড়িয়েছিল যেন সজাগ প্রহরীর মত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের বিষাদ হয়েছিল রণক্ষেত্রে রথের উপর বসে—আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে—তাদের হত্যা করতে হবে। এত বড় বীরের হৃদয়ে মমতা কেঁদে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন—এ যুদ্ধ করতে আমি পারব না।

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।

গীতায় আবৃত্তি করেছিলেন কৃষ্ণ। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

আমাদের জীবনেও তাই হল।

১৯৬৭ সালে মন্ত্রীত্বের জন্য কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন নতুন করে পাতা হল বাংলাদেশে। ধর্মক্ষেত্রে নয় কারণ ধর্মের স্থানই ছিল না এর মধ্যে। ছিল চুক্তি। তার দুটো দিক—একটা আপন পার্টির মন্ত্রীত্ব, পার্টির লোকের সুযোগ, পার্টির প্রভাব-বিস্তার—অন্যদিকে এরপর দেশের লোকের কল্যাণ যতটা সম্ভব।

তুমি বললে—আমাদের ভুল হয়েছিল, সংশোধন করতে চাই—

আমি বললাম—বল কি চাও? ডাইভোর্স?

—আমি কলকাতা চলে যেতে চাই।

—তারপর?

—তারপর যা হয় হবে। আমার যা ভাল লাগে করব। তোমার যা ভাল লাগে কর।

আমি বলেছিলাম—যেতে পার তুমি, কিন্তু শিবাকে তুমি পাবে না। ওকে নিয়ে যেতে দেব না।

তুমি চমকে উঠে বলেছিলে—কি বললে? গর্ভীকে কেড়ে নেবে?

—নেব। শিবা আমার সন্তান।

তুমি আস্ফালন করেছিলে—সীতাংশুর দলবলের সাহায্য নিয়ে তুমি জোর করে খোকাকে নিয়ে চলে যাবে। আমিও বলেছিলাম—বেশ কথা। তাই তুমি চেষ্টা করে দেখ।

সামনে তোমার বাবার জন্মদিন।

তোমার বাবার জন্মদিন তোমাদের পরিবারের একটি বাৎসরিক উৎসব। আমরা প্রতি বৎসর গিয়েছি। এবার আমি স্থির করেছিলাম—আমি তো যাবই না, তোমাকেও যেতে দেব না। জোর করে বন্ধ করব।

আমি জানতাম এতেই তুমি সব থেকে বেশী দুঃখ পাবে।

তুমি যদি সীতাংশুর সাহায্যে জোর করে যেতে চাও—তুমিই যাবে শুধু, অর্থাৎ আমি না—খোকাও না।

আমি অজুহাতও পেয়েছিলাম—মায়ের অসুখ বেড়েছিল। ডাক্তার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের সতর্ক থাকতেও বলেছিলেন। মা বুঝতে পেরেছিলেন দুটোই। তাঁর নিজের অবস্থার কথাও বুঝেছিলেন—আমাদের দুজনের মধ্যের ঝগড়ার কথাও তাঁর অজানা ছিল না।

তিনি আমাদের দুজনের হাত ধরে বলেছিলেন—না। এ তোমরা কোরো না। আরও বলেছিলেন—তোমরা যেমন প্রতিবার যাও বেয়াইয়ের জন্মদিনে—তেমনি যাবে। আমি একটা দুটো দিন দিব্যি থাকব। শিবানী আছে, ডাক্তার আছে, গ্রামের লোকেরা আছে।

ঠিকও সবই ছিল। মেনে আমি নিয়েছিলাম মায়ের কথা, কিন্তু তুমি ঠিক মেনে নাওনি। কিছু মনে করো না সুতপা, তুমি মেনে ঠিক নাওনি। তোমার নিশ্বাস, তোমার আরক্তমুখ, তোমার চোখের দৃষ্টি, বার বার বলেছিল তুমি মানোনি। পরের দিন সকালে তোমার বাবার জন্মদিন উপলক্ষে আমরা কলকাতা যাব; রাত্রে তুমি বলেছিলে—তুমি আমার কাছ থেকে খোকাকে কেড়ে নেবে বলেছ—একথা আমি কোন দিন ভুলব না। আমি বলেছিলাম—তার আগে তুমি নিজে চলে যাবার যে কথাটা বলেছিলে সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

তুমি বলেছিলে—তা ভুলে যাইনি। আজও চাই চলে যেতে।

আমি বলেছিলাম—তা চাইলেই আমি খোকাকে কেড়ে নেব।

তুমি বলেছিলে—তুমি আবার বিবাহ কর, আমি বাধা দেব না।

আমি বলেছিলাম—কথাটা ঘুরিয়ে আমিও বলছি এবং তাতে তোমার বাধা হবে না সুতপা। এবং একটা কথা তোমাকে বলি—দ্বিতীয়বার বিবাহের যে অধিকার আসুক, আমি সে অধিকার নেব না। সুতরাং আমার খোকাকে আমাকে পেতেই হবে।

ঠিক এই মুহূর্তটিতে—তোমার মনে নিশ্চয় রয়েছে—সেই রাত্রির প্রায় শেষ প্রহরে দূরে কোথাও উঠেছিল আর্ত কলরব। বহু মানুষের ভয়ার্ত কণ্ঠ।

—আগুন—আগুন—আগুন।

আগুন।

বেরিয়ে এসেছিলাম বারান্দায়। বারান্দা থেকে ছাদে। ছাদে উঠে দেখেছিলাম দূরে পশ্চিম আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। অনুমানে মনে হল মুসলমানদের গ্রাম মোমিনপুরে আগুন লেগেছে।

আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। গ্রামে গ্রামে সাড়া উঠেছে। আকাশে খড়পোড়া আগুন উড়ে যাচ্ছে। আমি তোমার মুখের দিকে তাকালাম। তুমি আমার মুখের দিকে তাকালে। নিচে থেকে সেবা-সমিতির ছেলেরা ডাকছিল—সুব্রতদা—সুব্রতদা।

সীতাংশুরাও উঠেছিল। তারাও অপেক্ষা করছিল। কারণ বাটটা বালতি—তার সঙ্গে বাঁধন কাটবার কাস্তে হাঁসুয়া এসব সেবা-সমিতিরই আছে। আমি সেবা-সমিতির স্টোরের চাবি নিয়ে ছুটে নেমে গেলাম।

* * * *

ফিরে এলাম পরের দিন—বেলা তখন বারোটা।

তখন তুমি কলকাতা চলে গেছ। মা হার্টফেল করেছেন, তাঁর শব কাপড়-ঢাকা পড়ে রয়েছে। গ্রামের লোকেরা অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে। আমি তাঁর মুখাগ্নি করব।

আমি তখন শ্রান্ত ক্লান্ত আহত। শরীরের অনেকগুলো স্থানে ক্ষত হয়েছে, অনেকগুলো স্থানে পুড়ে ফোস্কা হয়েছে। কালিতে কালো হয়ে গেছে সর্বাঙ্গ। মায়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনে অজ্ঞান হয়ে গিছলাম।

মোমিনপুরে দুশোর মত ঘর পুড়েছে। কয়েকটা গরু ছাগল পোড়া চাল চাপা পড়েছে। আগুনের সে বর্ণনা আর করব না। কি হবে?

তবে মানুষের কান্না এবং দুঃখ-দুর্দশার শেষ ছিল না।

আশপাশের কয়েকখানা গ্রামের লোকই জড়ো হয়েছিলেন। সীতাংশু এখানকার এম. এল. এ., সে সকাল হতে হতে ছুটল কাটোয়া। এস. ডি. ও-র কাছে গেল সে, ওখান থেকে টেলিগ্রাম করবে বর্ধমানে ডি এম-কে, কলকাতায় চীফ মিনিস্টারকে। আমি ওদের সেই দিনের অন্নের ব্যবস্থা করছিলাম। খড় তালপাতা কেটে পোড়া ঘরগুলিকে ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষা আসন্ন।

দুশোখানা ঘর পুড়েছে—খান-পঞ্চাশ ঘরের চালের খড় টেনে আমরাই ফেলে দিয়েছি। এই আড়াইশোখানা ঘরের পাঁচ-ছশো লোকের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার সে তো সহজ নয়।

এরই মধ্যে খবর এল মা মারা গেছেন। হার্টফেল করেছেন তিনি।

শুনলাম, সকালবেলা হতেই তুমি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলে। বাবার জন্মদিন—কলকাতায় যাবার জন্ত সব গোছগাছ হয়ে আছে; আমারও সঙ্গে যাবার কথা—কিন্তু আমি চলে গেছি আগুন নেভাতে।

মা বলেছিলেন—বেশ তো, যখন ফিরবে সুব্রত তখনই রওনা হবে। সন্ধ্যে পর্যন্ত তো ট্রেন অনেক। কাটোয়ায় গিয়ে ভোর-রাত্রে ট্রেন ধরলেও কাল সকালেই পৌঁছবে।

এই সময়েই ফিরেছিল সীতাংশু। সে খবর দিয়েছিল ফিরতে সুব্রতর দেরি হবে। তার কাজ তো। আর এবার কাজ সত্যিই অনেক বেশী।

তুমি খবর শুনে সীতাংশুকেই বলেছিলে, কাটোয়ায় সঙ্গে গিয়ে ট্রেন ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে।

মায়ের কাছে গিয়ে বলেছিলে—আমি সীতাংশুর সঙ্গে চলে যাচ্ছি।

মা স্বাভাবিক ভাবেই বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন—সে কি! সুব্রত যে যাবে—সে ফিরুক!

তুমি বলেছিলে—এবং খুব নাকি সহজ করে আস্তে আস্তে বলেছিলে—তাকে যেতে বারণ করবেন।

মা বলেছিলেন—বারণ করব?

তুমি বলেছিলে—হ্যাঁ। বলবেন আমি বারণ করেছি। আমাকেও যেন আর আনতে না যায় সে। আমি আর আসব না ফিরে।

চীৎকার করে উঠেছিলেন মা—বউমা!

তুমি পিছন ফিরে বলতে বলতে বেরিয়ে গিয়েছিলে—খোকা কার তার মীমাংসা যদি

একান্তই করতে হয়, তা হলে তা হবে কোর্টে।

মা আবার বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

শিবানীদি ছুটে তোমাকে বারণ করতে যেতে চেয়েছিল—বউ, মায়ের অসুখ বোধহয় বাড়ল—কিন্তু মা তাকে যেতে দেননি। হাত-ইশারায় বারণ করে বলেছিলেন—না। তারপর কোনরকমে বলেছিলেন—ডাক্তার ডাক। ডাক্তারকে—

ওদিকে সীতাংশুর ইলেকশনের জীপখানা তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টা-দেড়েক পর মা মারা গিয়েছিলেন। ডাক্তারও গ্রামে ছিল না। আসতে আসতেই মা মারা গিছলেন।

মায়ের শ্রাদ্ধ করলাম।

না, তোমাকে খবর দিইনি। ইচ্ছে করেই দিইনি। তুমি আঘাত পাবে এই মনে ক'রেই দিইনি।

আমার মাতৃশ্রাদ্ধে তোমাকে অংশগ্রহণ করতে ডাকলাম না—তুমি এতে তোমার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে,—আমি তোমাকে বঞ্চিত করলাম—এ ভাবনা ভেবে একটা কঠিন ধরনের আনন্দ পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি নিজেই এসে দাঁড়াবে। কিন্তু তুমি এলে না।

খবর তুমি পেয়েছিলে। পাবার কথা তো বটেই। সীতাংশু নিশ্চয় জানিয়েছিল। পাঁচদিনের দিন সীতাংশু নিজে এসে আমাকে বলেছিল—তুমি তোমার বাবার সঙ্গে জন্মদিনের পরের দিনই ভুবনেশ্বর পুরী চলে গেছ।

বুঝলাম ইচ্ছে করেই দূরে চলে গেলে এবং আমি তোমাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার আগেই আমার দেওয়া অধিকারটা তোমার পায়ের স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া স্যাণ্ডেলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

আমি অনেক নিষ্ঠুর উপায় ভেবেছিলাম।

খোকাকে কেড়ে নেব। একটা মামলা করব ডাইভোর্সের।

ভেবেছিলাম—তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করব। এদিকে একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণাকর, ভাবনা বল ভাবনা, মানসিক অবস্থা বল তাই, এমনভাবে আমাকে পেড়াতে লাগল যে, ইচ্ছে হল আত্মহত্যা করব।

এর থেকেও ভয়ঙ্কর ইচ্ছে হয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল—আত্মহত্যার আগে খোকাকে কেড়ে নিয়ে এসে—, না সুতপা, কল্পনাটা শেষ করতে পারিনি।

বাড়িতে থাকতে পারিনি—কলকাতায় এসেছিলাম।

কলকাতায় এসে—একটা নতুন পথ পেলাম। ওই যা থেকে আমার জীবনে আগুন লেগেছে—যাতে দেশটা জলছে—সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরার পথ। আমাদের পার্টি আসানসোল অঞ্চলে কলিয়ারী শ্রমিকদের নিয়ে একটা সংগঠন গড়ে তুলেছিল, শক্ত

সংগঠন। সেটাকে ভেঙে দেবার জন্য লড়াই শুরু হয়েছে। লড়াই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নয়; এতকাল পর্যন্ত তাই ছিল বটে, কিন্তু এবার সব বদলে গেছে। এখানে একটা হিন্দী কথা চলন আছে—'পিঢ়ি বদল গয়া'—তা পিঢ়ি বদলে গেছে। পার্টিতে পার্টিতে ঝগড়া। ঝগড়া মানে সত্যিসত্যি লড়াই; হাতিয়ার নিয়ে; টাঙ্গি বল্লম—রিভলবার পর্যন্ত। আমি পার্টির কাছে এই ফ্রন্টে কাজ করবার জন্য এসেছি। কাজ কেন বলছি, কাজ নয়, লড়াই—দাঙ্গা।

দিন সাতেক আগে প্রথম রিভলভার ছুঁড়ে ওদের একটি হিন্দুস্থানী দাঙ্গাবাজকে মেরে ফেললাম। সে যে কি রক্ত ভল ভল করে করে বেরিয়ে এল। তারপর আর নেশা না করে মনে বল পেলাম না। মদ খাচ্ছি সেদিন থেকে। এবং মরবার জন্য ক্ষিপ্ত জন্তুর মত ছুটে যাবার কল্পনায় খুব উল্লাস অনুভব করছি।

আক্ষেপ আর আমার কিছু নেই।

আক্ষেপ আমার, তোমাকে পেলাম না। না—আরও আক্ষেপ আছে—সে আক্ষেপ সেই বিচিত্র বহু ঝাড়লণ্ঠনে আলোকিত সেই যাত্রার আসরের মত বহু বিচিত্র আদর্শের আলোয় উজ্জ্বল—সমাজ ও পৃথিবীর জন্য।

আর আক্ষেপ—আরও প্রদীপ্ত আলোকোজ্জ্বল যে নতুন আসর পাতার জন্য পৃথিবী-জোড়া বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে—সেটা বুঝি সব মিথ্যে হয়ে গেল।

ঐখানেই থাক্। সন্ধ্যা উতরে গেছে। হ্যারিকেনের আলোয় বসে লিখছি। ওদিকে বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন। আজ রাত্রে একটি ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হবে। বোমা তৈরী করেছি। দূরে বোমা ফাটছে। উঠলাম।

* * *

এতবড় পত্রখানা শেষ ক'রে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে মাটির পুতুলের মত বসে রইল সুতপা। তার সে চেহারা দেখে ভয় পেলেন বিজয়বাবু। তিনি ডাকলেন—সুতপা। মা।

সুতপা বললে—বাবা। কিন্তু তাতে শব্দ হল না। শুধু মুখটা তার নড়ল।

ইনস্‌পেক্টর বললেন—আমি উঠছি। সুব্রতবাবুর বডি আমরা আন্দাজ করে আইডেন্টিফাই করেছি একটা, কিন্তু সঠিক আইডেন্টিফিকেশন হওয়া খুব শক্ত। আমরা তো বডিগুলো বের করেছি মাটি খুঁড়ে তার ভিতর থেকে। বডিগুলো ডিকম্পোজড্ হয়েও গেছে। তার আগে, মাটিতে পুঁতবার আগে - কুপিয়ে ডিসফিগারও ক'রে দেওয়া।—তবু যদি চান—

সুতপা থর থর করে কেঁপে উঠে দুই হাতে মুখ ঢাকলে। তারপর কেঁদে উঠল। সুতপার বউদি তাকে জড়িয়ে ধরলেন। বিজয়বাবু উঠে এসে তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—মা। সুতপা। মা—

সুতপা দুই হাতে মুখ ঢেকেই বলে উঠল—আমি চাই—তার দেহখানা আমি চাই বাবা। আমি চাই—

চার বৎসর পর। ১৯৭১ সাল।

এই চার বৎসরে সারা দেশ জুড়ে প্রচণ্ড সংঘাত সংঘর্ষ চলেছেই চলেছেই চলেছেই। একটা আগ্নেয়গিরির মত অগ্ন্যুদগার করছে চার বৎসর ধরে। একটা ঘনশ্যাম নিবিড় বন যেন চার বৎসর ধরে নিরন্তর জ্বলছে।

চার বছরে তিন-তিনটে নির্বাচন গেল। শাসন-শৃঙ্খলা জীর্ণ-মরচেধরা শেকলের মত টুকরো টুকরো খান খান হয়ে গেল। বামপন্থীরা মিলিত হল, দেশ উচ্ছ্বসিত হল প্রত্যাশায়; চারিদিকে নানান্ অভ্যুত্থান হল। অবনত জাতি শ্রেণী যারা তারা উঠতে চাইল; শোষিত বঞ্চিত যারা, দরিদ্র যারা, তারা উঠতে চাইল। এর উপরে হল সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি। এর মধ্যে পার্টিতে পার্টিতে বিরোধ পরিণত হল বিবদমান দুটো হিংস্র প্রাণীর রক্তাক্ত প্রাণঘাতী সংঘর্ষে।

হত্যা—হত্যা আর হত্যা। খুন। খুন। খুন।

মানুষে মানুষে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়। দলে দলে। পার্টিতে পার্টিতে। রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণ মানুষের আনুগত্য দখল করবে সামরিক শক্তির পরিচয় দিয়ে।

অজয়বাবু জ্যোতিবাবুতে বিরোধ হল। মিনিস্ট্রি ভাঙল। ভেঙে দিলেন অজয়বাবু। জ্যোতিবাবুর দল দাবী জানালে—তারা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবে। বিরোধী হল প্রায় অন্য সব দলেরা।

বাংলাদেশ—যে বাংলাদেশ একটি সবুজ পত্রপল্লবসমৃদ্ধ নিবিড় অরণ্যের মত—সে বাংলাদেশ ওই আগুন-লাগা বনের মতই পুড়তে লাগল। পুড়ছে, বাংলাদেশ একটা আগুন-লাগা বনের মত পুড়ছে।

এরই মধ্যে সুতপার দেখা পেলাম সর্বানন্দপুরে। ১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট সেদিন। সুতপা বসেছিল সর্বানন্দপুরে সুব্রতদের মুখুজ্যে-বাড়ির বাহিরের ঘরখানায়। এই ঘরখানাই সুব্রতদের সমাজ-সেবা সমিতির আপিস। সুতপা সমিতির ক'জন কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু এ সুতপা ঠিক সে সুতপা নয়। অন্ততঃ দুজনকে ঠিক এক করে মিলিয়ে নেওয়া যায় না।

সে সুতপাকে আমরা দেখেছি। সুতপার শ্যাম্পু-করা চুল—অত্যাধুনিকা মেয়ে সুতপা। সে সুতপা প্রদীপ্তা, আলোর সঙ্গে তুলনা করলে—বলতে হবে হাজাক লণ্ঠনের মত।

এ সুতপা আশ্চর্য একটি বিষণ্ণ বৈরাগ্য সর্বাঙ্গে মেখে শান্ত হয়ে বসে রয়েছে। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাস। ১লা আগস্ট।

* * *

বিচিত্র মানুষের মন।

এই মানুষের মন অহরহ গড়া-পেটার মধ্য দিয়ে চলেছে কোন এক অজানা দিগন্তের মুখে। সেইটে তার ধর্মের স্বর্গ, শিক্ষার স্বর্গ; এর আর শেষ নেই। মানুষও কোনকালে সেই স্বর্গে পৌঁছয় না। তাই তার খোঁজারও শেষ নেই, আস্ফালনেরও শেষ নেই। চলতে চলতে অনুভব করে এ পথের শেষে যে স্বর্গই থাক্, তাকে যেন সে ঠিক চায়নি।

রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জনের যে স্বর্গে পৌঁছেছিলেন, সে স্বর্গে সীতা ছিলেন না। সীতা

অভিমানভরে প্রস্থান করেছিলেন পাতালে।

কৃষ্ণের ধর্মরাজ্যে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল, যাদব কুলনারীরা অপহৃত হয়েছিল, যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গের দোরে যখন পৌঁছলেন, তখন তিনি একা, চার ভাই, দ্রৌপদী মরে নরকে গেছে।

না, ভুল হল। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছিল একটি কুকুর। কুকুর শেষে ধর্মরূপ পরিগ্রহ ক'রে ধর্মের মুখরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের হৃদয় ভরে ওঠেনি; জুড়িয়ে যায়নি। তবুও মানুষের মন এই পথেই সুখ খোঁজে, সান্ত্বনা খোঁজে। এর থেকেও বিচিত্র পরিণতি হয় সেইখানে যেখানে সব থেকে বড় হয়ে ওঠে যাকে ভালবাসি তার পরম কামনার স্বর্গভূমিখানি।

সুতপার মন সেই বিচিত্র মন।

সুব্রতর যে স্বর্গকে সত্য বলে মানতে পারেনি, যা নিয়ে তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আর শেষ ছিল না, যে সংঘাত-সংঘর্ষে সে নিষ্ঠুরভাবে সকল বন্ধন নিজের হাতে টেনে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল—সুব্রতর মৃত্যু-সংবাদটা এমনি বিচিত্র ভাবে এসে তাকে যখন আঘাত করল, তখন সেই আঘাতের ফলে মুহ্যমান হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তার বউদির কোলে। চেতনা পেয়ে উঠে বউদিকে বলেছিল—এ আমি কি করব বউদি?

কি উত্তর দেবেন বউদি!

উত্তর একটা আছে—সেটা অতি বাস্তব—কিন্তু অতি বর্বর ছাড়া এ উত্তর মানুষের মনে আসে না।

উত্তর না পেয়ে নিরুত্তর সংসারের দিকে তাকিয়ে আবারও কেঁদেছিল সুতপা। অনেক কেঁদেছিল।

বউদি এবার গর্কীকে তার কোলের কাছে এনে দিয়েছিল। বলেছিল—কাঁদিস নে। গর্কীকে কোলে নে। তোর কান্না দেখে ও কত কাঁদছে দেখ।

গর্কীর তখনও বছর পোরেনি। সে কাঁদেনি, হাসছিল। সুতপা তাকে কোলে ক'রে নিয়ে বলেছিল—ওকে গর্কী বলো না, বউদি, শিব্বা বলো। ওর নাম শিব্বাই হল।

বাবাকে গিয়ে বলেছিল—বাবা, আমি ওর শ্রাদ্ধ করব।

বাপ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন কিছুক্ষণ এবং তাকিয়ে থাকতে থাকতে এত বড় দার্শনিক পণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞ মানুষটির দুটি চোখ থেকে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে এসেছিল গাল বেয়ে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে আত্মসংবরণ ক'রে বলেছিলেন করবে বইকি মা। করা তোমার কর্তব্য।

বিজয়বাবু নিজে মেয়েকে নিয়ে সর্বানন্দপুর এসেছিলেন। এবং শ্রাদ্ধ-শেষে এখানকার ব্যবস্থা করে মেয়েকে নিয়ে ফিরে গিছলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই সুতপা আবার এখানে এল। এল একটি বৈরাগ্য প্রতিমার মত। সাদা জমি ফিতেপাড় শাড়ী পরনে, সাদা ব্লাউজ, হাতে দু'গাছি চুড়ি, চুল এলো করা, মুখে একটি বিষণ্ণ করুণ হাসি, সে এখানে থাকবে, সেবা-সমিতি চালাবে, একটি মেয়েদের স্কুল করবে। ছেলেকে মানুষ করবে নিজের মত ক'রে।

আর একটি বিচিত্র কর্ম করলে সে।

মুখুজ্যে-বাড়িতে যে গোপাল-সেবাটি ছিল তার বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন প্রভাময়ী নিজে, তার কিছু বদল করে সেবা সে শাশুড়ীর মতই নিজের হাতে তুলে নিলে।

লোকে অবাক হয়ে গেল।

ভাইয়েরা বউদিরা বিয়ের কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বিজয়বাবু নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন—না।

* * *

সেদিন ১৯৭১ সালের ১লা আগস্ট। ট্রানজিস্টার রেডিওতে বাংলাদেশের প্রোগ্রাম বাজছিল—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, সাতটা বাজছে। সুতপা উঠল সেবা-সমিতির আপিস থেকে। গোপালের আরতি হবে। গোপালের ভোগ হবে। তারপর তাঁর শয়ান হবে। শিব্বা একটি ছেলের কোলে আকাশের চাঁদ দেখছে। সেবা-সমিতির ভলেন্টিয়ার একটি ছেলে। শুক্লপক্ষ, সামনে রাখী পূর্ণিমা। অ্যামেরিকান স্পেসশিপ অ্যাপোলো ১৫ চাঁদের দিকে যাত্রা করেছে। ছেলেটি শিব্বাকে বলছে—শিব্বা আমাদের চাঁদে যাবে। ইণ্ডিয়া থেকে আমাদের পুষ্পক ছাড়বে—পুষ্পক ওয়ান, টু, থ্রি। পুষ্পক ফোর-এ শিব্বা যাবে। সেখানে গিয়ে নেমেই বলবে—চাঁদমামা আমি আসিয়াছি। তোমার সোনায় বাঁধা আগের উপর তোমার ভাগে দাঁড়াইয়া আছি।

বলতে বলতেই সে থেমে গেল। একটু ভয় পেয়েই যেন কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সে বললে—কে?

দীর্ঘাকৃতি একটি লোক, পরনে তার প্যাণ্ট আর হাওয়াই শার্ট, মাথায় একটা ফেল্টহ্যাট, পায়ে স্ট্র্যাপ দেওয়া জুতো, লোকটি বাঁ হাতে একটা হাল-আমলের বড় স্যুটকেস অনায়াসে বয়ে নিয়ে বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটি গ্রাহ্য করলে না ছেলেটির কথা। গম্ভীর গলায় বললে—শিবানীদি!

ঘরের মধ্যে আরতির ওখানেই ছিল শিবানী। শাশুড়ী তাকে এনে রেখে গিছলেন—সুতপা তাকে সেই মর্যাদা এবং অধিকারেই রেখেছে। শিবানী সুতপা দুজনেই চমকে উঠল। কে? কে?

সুতপাই প্রশ্ন করলে ঘরের ভিতর থেকে—কে?

বাইরে থেকে উত্তর এল—আমি সুব্রত।

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে—থমকে দাঁড়াল সুতপা। ফুলপ্যাণ্ট হাওয়াই শার্ট ফেল্টহ্যাট পরে—ও কে—ও-ই সুব্রত?

এক পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল সুব্রত—তুমি? সুতপা?

সুতপা পাথর হয়ে গেল।

কি চেহারা হয়েছে সুব্রতর? জ্যোৎস্না আলোকের মধ্যে মানুষটাকে এই অনভ্যস্ত পোশাকে আশ্চর্যরকম রুক্ষ—বলশালী দেখাচ্ছে। সেই মুখ সেই কণ্ঠস্বর সেই মানুষ—তবু

যেন এ মানুষ সে মানুষ নয়।

সুব্রত তার দিকে তাকিয়ে তাকে ভাল করে দেখে বললে—তুমি বৈধব্য পালন করছ সুতপা? কিন্তু আমি মরিনি। আমি ফিরে এসেছি।"

সুব্রত মরেনি। তার দেহ পাওয়া তো ঠিক যায়নি। ওই চিঠি এবং ওর ব্যাগের জিনিসপত্রের জন্যই পুলিস ভুল ক'রে ওই গলিত দেহগুলোর একটাকে সুব্রতর লাশ বলে মনে করেছিল। সুব্রত গুলিতে আহত হয়েছিল। আহত অবস্থায় কুলীদের আশ্রয় নিয়েছিল—তারাই বাঁচিয়েছিল। বেঁচে উঠে প্রথম সে সন্ন্যাসী হয়েছিল। সংকল্প করেই সে সন্ন্যাস নিয়েছিল। ঈশ্বর-সন্ধানে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

—বদ্রীনারায়ণ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ঘুরেছি সুতপা। শাস্ত্র পড়েছি। চার বছরের দুটো বছর ঘুরেছি ঘুরেছি ঘুরেছি। কিন্তু পাইনি কিছুই। সত্য কথা তোমাকে বলব —মিথ্যা মনে হয়েছে ঈশ্বর ধর্ম শাস্ত্র তীর্থ সব। সব। আবার পৃথিবীর সংসার আমাকে টানলে। অর্থ টানলে, যৌবন টানলে—আবার টানলে—সেই রাজনীতি। ঈশ্বর কাউকে রাজা করে দেন না—রাজা হতে হয়—রাজ্য জয় করতে হয়। সারা ভারতবর্ষের যেখানে গেলাম সেখানেই দেখলাম—মানুষ এতেই পাগল হয়েছে। তার সঙ্গে আমার মনে যোগ দিলে আমার অতীত। তোমাকে পাইনি—তোমাকে পেতে হবে—আর এখানে হেরেছি ইলেকশনে —আমাকে জিততে হবে ইলেকশনে।

একটা দলে পড়ে গেলাম। দুরন্ত দুর্ধর্ষ মানুষের দল। সেও বিচিত্র কথা। পথের ধারে একজন আহত লোককে পেয়েছিলাম। পায়ে গুলি খেয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাব আর ইউ. পি-র বর্ডারে। তাকে কাঁধে করে তুলে আমার আস্তানায় নিয়ে গিয়ে সেবা করেছিলাম। দুদিন পরই কয়েকজন লোক এল তার সন্ধানে। তাকে নিয়ে গেল তাদের গাড়িতে তুলে। দিন-পনেরো পর আহত লোকটি সেরে উঠে আমার কাছে এসে বললে—আমাদের সঙ্গে এস।

তারা দুরন্ত লোক, দুর্ধর্ষ মানুষ। তাদের সঙ্গে কাজ করলাম কিছুদিন।

রাইফেলের গুলিতে অনেক দূরের মানুষকে আমি লক্ষ্যভেদ করেছি।

আর্ত চীৎকার করে উঠল সুতপা। তুমি—তুমি—নরহত্যা করেছ?

সুব্রত বললে—তার মুখের পেশী নড়ল না।

কথা হচ্ছিল ঘরের মধ্যে বসে। আর কেউ ছিল না।

সুব্রত বললে—তা অনেকগুলি মানুষকে আমি হত্যা করেছি। অন্ততঃ পঞ্চাশটা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আমি আর অহিংসায় বিশ্বাস করি না সুতপা। হিংসাই সত্য। প্রকৃতি ওইটেকেই দিয়েছে—দেহের প্রদীপে শক্তির তেলে চুবিয়ে শলতে করে ব্যবহার করতে। ওতেই শিখা জ্বলে। সেই শিখাকে ঘরে লাগাও ঘর জ্বলবে—গ্রাম জ্বলবে —বন জ্বলবে—দেশ জ্বলবে। অহিংসা আজ আমার কাছে ভ্রান্তি। নিছক ভ্রান্তি।

সুব্রত বললে—আমি এখন অনেক অর্থের মালিক। এবং এ অর্থ খুব সৎ উপায়

যাকে বল তাতে উপার্জন করিনি। আমি নতুন করে জীবন আরম্ভ করব। সারা পৃথিবীর পথ আজ আমার পথ। কিন্তু তুমি এসব কি করেছ?

—কি করেছি?

—এই গোপাল-পুজো করছ, এই আমার স্মৃতি-পুজো করছ—

অস্ফুট কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল সুতপা—না—না না—। বলো না। বলো না। কি বলছ তুমি?

—ঠিক বলছি আমি। সেকাল হলে আমি কালাপাহাড় হয়ে সর্বপ্রথম আমার বাড়ির ওই শালগ্রাম শিলা আর গোপাল-মূর্তি দুটোকে জলে ফেলে দিতাম। আমি নতুন ক'রে পলিটিক্যাল পার্টি তৈরী করব। নতুন পৃথিবী। নগ্ন সত্য হবে ভিত্তি। একটা ব্লাড বাথের মধ্যে দিয়ে হবে নতুন দিনের সানরাইজ।

—তুমি মাফ কর আমাকে। আমি আর শুনতে পারছি না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

অট্টহাস্য করে উঠল সুব্রত। সুতপা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ও ঘরে শিব্বা তখন কাঁদছিল।

* * * *

রাত্রি তখন গভীর। আকাশে চাঁদ নেই, অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। শুধু ঝিঁঝিঁর শব্দ শোনা যাচ্ছে। মানুষ ঘুমুচ্ছে। প্রাণীকুল ঘুমুচ্ছে। এরই মধ্যে ঘরের দোর খুলে ছেলেকে বুকে তুলে বেরিয়ে এল সুতপা। কাঁধে একটি ঝোলা। সে পালাচ্ছে। পালাতেই হবে তাকে। ওই যে সুব্রত ফিরে এসেছে—ওই যে নিষ্ঠুর বৃত্রাসুরের মত দুর্দান্ত দুরন্ত নিষ্ঠুর রক্তপিপাসায় অধীর মানুষ—ওর হাত থেকে শিব্বাকে আর তার শ্বশুরকুলের সব পুণ্যের এবং তপস্যার স্পর্শমণির মত এই যে ঠাকুর—একে যে রক্ষা করতেই হবে।

সে পালাচ্ছে। এখান থেকে স্টেশন। সেখানে থেকে অনেক দূরে—অনেক দূরে—অনেক দূরে কোথাও। যেখানে নূতন কালের প্রভাত হবে।